আমার জীবন

প্রথম ভাগ

নবীনচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত
ও
সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা
প্রকাশিত।
১৩১৯।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি আমার অসংখ্য ও অসহনীয়

উৎপীড়ন সহ্য করিয়া,

শৈশবে অতুলনীয় স্নেহে এই জীবন

গড়িয়াছিলেন,

আমার সেই পরমারাধ্যা

পিতামহী

৺অমলাসুন্দরী দেবীর

পবিত্র চরণে

এই জীবনী প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে

উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র

—:০-

বাল্যজীবন—চট্টগ্রাম।

ছাত্রজীবন—কলিকাতা।

পিতৃহীন যুবক—কলিকাতা।

—:০:-

আমার জীবন।

"Life is real, life is earnest"

Longfellow.

উপক্রমণিকা।

আমার জীবন?—আমার মত লোকের জীবন লিখিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? অসংখ্য কুসুমরাশির মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরভ ও শোভাবিহীন ফুল কোথায় অনন্ত অরণ্যের নিভৃত স্থানে ফুটিয়া ঝরিতেছে; অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত আকাশতলে অসংখ্য জোনাকি-রাশির মধ্যে যে একটি জোনাকি কোথায় অনন্ত প্রান্তরের অন্ধকারতম প্রদেশে ফুটিয়া নিবিতেছে; অনন্ত জগতের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার জীবন কে জানিতে চাহে? তথাপি ইহারা এই জ্ঞানাতীত বিস্ময়পূর্ণ বিশ্বের অংশ! অহো কি রহস্য! তাহাদের দ্বারাও এই মহা সৃষ্টি-যন্ত্রের কোনও কার্য্য সাধিত হইতেছে; তাহা না হইলে তাহাদের সৃষ্টি হইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টি নিষ্ফল নহে। সেইরূপ আমার মত ক্ষুদ্র মানবের দ্বারাও অবশ্য কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র মানব-জ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছি না। যখন মনে এরূপ ভাবের উদয় হয়, যখন ভাবি যে, এই মহা রঙ্গভূমে, যেখানে সৌরজগৎ প্রভৃতির অনন্তকাল হইতে অনন্ত অভিনয় হইতেছে, আমিও তাহাতে রূপান্তরে অনন্তকাল হইতে

অভিনয় করিয়া আসিতেছি, তখন হৃদয় কি আত্ম-গরিমায় পূর্ণ হয়! তখন আমাকে আর একটি ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতঙ্গবিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। তখন আমি এই অনন্ত অভিনয়ক্ষেত্রের অনন্ত অভিনয়ের এক জন অনন্ত অভিনেতা। কিন্তু যখন চিন্তারাজ্য হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন আবার আপনার ক্ষুদ্রত্বে আপনি ম্রিয়মাণ হই। কই, এই জীবনের কার্য্যকারিতা ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমার জীবন জানিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেকে পত্র লিখিয়াছেন। এক জন বারংবার অনুরোধ করাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমার জীবন তিনটি মহা ঘটনায় পরিপূর্ণ—জন্ম, বিবাহ, দাসত্ব। আর একটি ঘটনা এখনও বাকি আছে, তাহা—মৃত্যু। তাঁহাকে আরও লিখিয়াছিলাম যে, এ শিরস্ত্রাণ বাঙ্গালার বড়লোক মাত্রকেই খাটিবে।

তবে আজ স্বয়ং আপনার জীবন লিখিতে বসিলাম কেন? ইচ্ছা—ভূত জীবনের দর্পণে একবার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া কিরূপ দেখায়, দেখিব। দেখিয়া তাহার একটি মন্দ রেখাও পরিবর্ত্তন করিতে পারি কি না, চেষ্টা করিব। এই মধ্য-জীবনে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল ঝটিকা-বিলোড়িত অরণ্যানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাহস ও শান্তিলাভ করিতে পারিব; সমাজের ও সংসারের যে সকল বিশ্বাসঘাতক বালুকা-চর ও গহ্বর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া অনেক শিক্ষা, অনেক সতর্কতা, লাভ করিতে পারিব; এবং মেঘান্তরিত প্রাবৃট-চন্দ্রমার ন্যায় কদাচিৎ যে সুখের, শান্তির ও স্নেহের মুখ দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব;—এই সাহস, এই শিক্ষা, এই সান্ত্বনার আশায় আজ আত্ম-জীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম।

জন্ম।

"শুভ জন্মপত্রিকায়" দেখিলাম,—১৭৬৮ শকাব্দীয় "শ্রীমদ্ভানুগত্যোত্তরায়ণে সৌরমাঘস্যৈানত্রিংশদ্দিবসে বুধবাসরে তমিস্রপক্ষে" দশমী তিথিতে তৃতীয় দণ্ড বেলার সময়ে "বহুতর শুভযোগে" আমার "শুভ জন্ম।" পিতা স্বর্গীয় গোপীমোহন রায়। মাতা স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী। চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রায়ের বংশে আমার জন্ম। আমি জাতিতে বৈদ্য।

আমাদের কুলজীর শীর্ষস্থানে লেখা আছে, "রাঢ়ভঙ্গ।" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মহারাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ় হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তাহার আর একটি প্রমাণ, আমাদের স্থানীয় ভাষা। ইহার সঙ্গে রাঢ়দেশীয় ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্ববঙ্গের গন্ধমাত্র নাই। তাঁহারা বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী বকাসাইর পরগণায় প্রথম বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সেখানে এখনও আমাদের বংশীয় একটি শাখা আছে শুনিয়াছি। তাহার পর দ্বিতীয় বাসস্থান হাটহাজারি থানার অন্তঃপাতী "মেখল" বা "মেখলা" নামক গ্রামে স্থাপিত হয়। সেই পূর্ব্ব বাসস্থান এখনও আমাদের প্রজাবর্গের অধিকারে আছে। তাহাও মনোনীত না হওয়াতে, পুণ্যতোয়া কর্ণফুলী নদীর উত্তর তীরের অব্যবহিত দূরে নয়াপাড়া গ্রামে শেষ বাসস্থান স্থিরীকৃত হয়। কুলজীর শীর্ষস্থানীয় নাম—বৌদ্ধ সেন। তাঁহার সপ্তম স্থানে রাজারাম রায়। সম্ভবত ইনিই চট্টগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইনি ঢাকার নবাবের এক জন কার্য্যকারক ছিলেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতার পারিতোষিকস্বরূপ নবাব ইঁহাকে "রায়" উপাধি দিয়া ফেণী নদী হইতে

টেকনাফ অন্তরীপ, এবং পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত,—অর্থাৎ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম জেলার,—করদ অধীশ্বর করিয়া দেন। সনন্দ পত্র সংবলিত তাম্রফলক আমাদের বংশীয়দের হস্তে বহু পুরুষ যাবৎ ছিল। শেষে গৃহদাহে দগ্ধ হইয়া যায়। "রায়" উপাধি এখনও আমাদের বংশীয়েরা ধারণ করিতেছেন। "রায়" সম্মানসূচক উপাধি বলিয়া আমরা কেহ কেহ নিজ পক্ষে তাহা ব্যবহার না করিয়া আপনাদের জাতীয় উপাধি "সেন" ব্যবহার করিতেছি।

রাজারাম রায়ের চারি পুত্র। শ্রীযুক্ত রায়, দুর্গাপ্রসাদ রায়, শ্যাম রায় ও চাঁদ রায়। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় ও শ্যাম রায় বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। শ্যাম রায় সম্বন্ধে একটি গল্প এখনও প্রচলিত আছে। নবাব চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আসিয়া শ্যাম রায়ের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলেন যে, এক রাত্রির মধ্যে তিনি যদি নবাবের বাসস্থানের সম্মুখে একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখাইতে পারেন, তবে তিনি অতীব আনন্দিত হইবেন! রাত্রি প্রভাত হইলে নবাব দেখিলেন, তাঁহার বাসস্থানের সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ সরসী-গর্ভে প্রস্ফুটিত পদ্মরাজি ভাসিতেছে। সেই সরোবর অদ্যাপি বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহরের উত্তরাংশে "কমলদহ" নামে খ্যাত রহিয়াছে। কমলদহের পূর্ব্ব পার্শ্বে তখন কর্ণফুল নদী প্রবাহিতা ছিল। শ্যাম রায় দীর্ঘিকা খনন করিয়া নদী হইতে জল আনিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

নবাবের কৌশলক্রমে শ্যাম রায় জাতিভ্রষ্ট হন। একদিন "রোজা"র সময়ে নবাব পুষ্পের ঘ্রাণ লইতেছেন দেখিয়া শ্যাম রায় তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার "রোজা" ভঙ্গ হইয়াছে; কারণ, "ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন।" নবাব ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য এক দিন তাঁহার আবাসস্থানে অধিকমাত্রায় পেঁয়াজ দিয়া গো-মাংস রন্ধন আরম্ভ করাইয়া শ্যাম রায়কে

ডাকিয়া পাঠান। রায় মহোদয় নাসিকারন্ধ্র আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত হইলে, নবাব তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তিনি বলিলেন, কি এক দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছেন। উহা নিবারণের জন্য নাসিকা আচ্ছাদিত করিয়াছেন। তখন নবাব বলিলেন, তবে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, কারণ "ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন।" শ্যাম রায় আপন অস্ত্রে আপনি আহত হইয়া, তাহা স্বীকার করিলেন। সে দিন হইতে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহার বংশীয়েরা চট্টগ্রামের মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অগ্রগণ্য। ইঁহারা মুসলমান হইলেও আমরা ইঁহাদিগকে কুটুম্বের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করি।

শ্রীযুক্ত রায় আপন রাজ্যে আপনার পিতা অপেক্ষাও অধিক খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ যে, আমরা তাঁহার বংশীয় বলিয়া পরিচিত। তিনি ত্রিবেণীতে তীর্থযাত্রায় গিয়া আত্মজীবনও ত্রিবেণীতে পরিণত করেন। তাঁহার প্রথমা ভার্য্যার সন্তান না হওয়াতে, তিনি সেই তীর্থধামে এক বৈদ্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে বোধ হয় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান হইতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন ; অন্যথা, এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল কোনও তীর্থযাত্রীকে কাহারও কন্যাদান করা সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত রায় একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তদীয় পিতা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া "নরবলি" প্রদান-পূর্ব্বক নদীগর্ভ হইতে যে দশভুজা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, এবং যিনি এখনও আমাদের কুলমাতা বলিয়া চট্টগ্রামে বিখ্যাত, তিনি এই দশভুজা-মন্দিরে "ন দিবা ন রাত্রি" ভেদে পূজায় নিবিষ্ট থাকিতেন। একদা তিনি সেইরূপ পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহার শিশুকন্যা আসিয়া নানা উৎপাত আরম্ভ করিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া বালিকাকে "দূর হও" বলিলেন। বালিকা গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল,—তুমি আমাকে "দূর হও" বলিলে।

আচ্ছা, আমি চলিলাম।" বালিকা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি কেন বালিকাকে তাঁহার পূজার সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে দেন! তাঁহার মাতা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন যে, বালিকা বহুক্ষণ নিদ্রিতা। শ্রীযুক্ত রায় শিরে করাঘাত করিলেন; বুঝিলেন কুলমাতা তাঁহাকে ছলনা করিয়াছেন। তিনি সেই যে ধ্যানস্থভাবে প্রণত হইলেন, আর মস্তক তুলিলেন না। প্রবাদ এইরূপ যে, কুলমাতা তাঁহাকে পূজান্তে দর্শন না দিলে তিনি অহর্নিশ ভূতল-প্রণত-শিরে থাকিতেন। রাত্রি প্রভাত হইল। ভৃত্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রভু ছিন্নশির ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। সে তাঁহার মাতাকে যাইয়া সংবাদ দিল,—

"বড় ঘরে ঠাকুরাণী! কি কর বসিয়া?
শ্রীযুক্ত কাটা গেছে, রক্ত যায় ভাসিয়া।"

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি-কবিতারাশির মধ্যে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ নানা গ্রাম্য কবিতা আছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায় তাঁহার প্রভুত্বে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে রাত্রিতে প্রণত অবস্থায় হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। আদিপুরুষ ইষ্টক-মন্দিরে এইরূপে হত হওয়াতে, আমার বংশে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ। শ্রীযুক্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কনকমঞ্জরী প্রতিজ্ঞা করিলেন,—পিতৃহন্তার মস্তক না দেখিয়া জলগ্রহণ করিবেন না। চারি দিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। জনৈক নাপিত তাঁহাকে কামাইবার ছলনায় তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া কনকমঞ্জরীর ভীষণ ব্রত প্রতিপালন করিল।

শ্রীযুক্ত রায়ের তীর্থ-লব্ধ পত্নীর গর্ভে কনকমঞ্জরী এবং তদীয় কনিষ্ঠ মনোহর রায়ের জন্ম হইবার পরে, তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে জগদীশ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হত্যার সময়ে সন্তানেরা সকলেই অপ্রাপ্ত-

বয়স্ক ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজস্ব বাকী পড়িয়া গেল। ভাঁণ্ডার-ঘরের ব্যয়ের নিমিত্ত যে ২৫০০০ টাকা মুনাফার একটি ভূসম্পত্তি ছিল, তাঁহার সন্তান-দিগের প্রতিপালনার্থ তাহা মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া নবাব সমস্ত রাজ্য "বাজেয়াপ্ত" করিলেন। এই জমীদারির অধিকাংশ এখনও আমাদের বংশীয়দের হস্তগত আছে।

কালে দুই ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইল। এক দিকে "জননী" (দশভুজা), অন্য দিকে "জন্মভূমি" (ভদ্রাসন বাড়ী) তুলাদণ্ডে উঠিল। জ্যেষ্ঠ মনোহর রায় জননীকে লইয়া স্বতন্ত্র বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। উল্লিখিত ভূসম্পত্তিও দুই অংশ হইয়া গেল। এই উভয়ের, বিশেষতঃ মনোহর রায়ের, সন্তানগণ আপন আপন পারিষদ, পুরোহিত ও গোলাম-গণ সহ "কর্ণফুলীর" তীর হইতে তাহার শাখা মগধেশ্বরীর তীর পর্য্যন্ত দুই ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এই স্থানটি কুলপতি রাজারাম রায় হইতে বংশীয় প্রায় প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীর নামীয় বিস্তৃত দীর্ঘিকা-মালায় পরিপূর্ণ। মনোহর রায় হইতে আমি পুরুষানুক্রমে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিত। কুলমাতার কৃপায় এ বিপুল বংশ সচ্ছল অবস্থায় থাকিয়া এই দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম-সমাজের শীর্ষদেশে আপনার স্থান রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার ছায়া অক্ষয় রহুক।

শৈশব

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, "বহুতর" শুভক্ষণে আমার জন্ম হয়। জন্ম-পত্রিকায় রাশিচক্র এইরূপ অঙ্কিত রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—
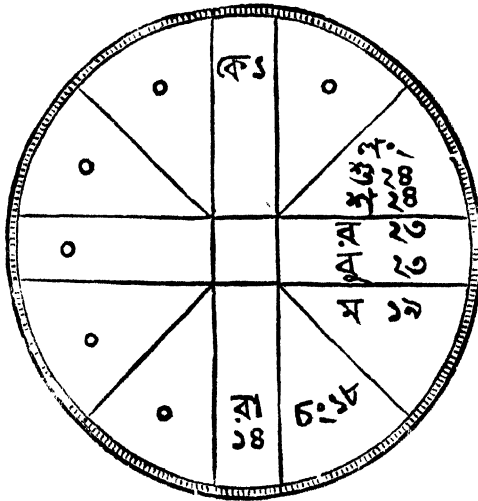
"জীবশ্চ কেন্দ্রী বহুশাস্ত্রপাঠী
নৃপস্য মন্ত্রী বিভবাদিযুক্তঃ।
সুকান্তাকান্তঃ ধনরত্নযুক্তঃ
দয়াবিবেকী বহুপুত্রমিত্রঃ॥"

আবার— "সুখী সুবেশী সুজনানুরাগী
সুদারযুক্তো গুণবান্ ধনাঢ্যঃ।

শাস্ত্রেষু বুদ্ধিঃ স্বকুলপ্রদীপঃ
শুক্রশ্চ কেন্দ্রী চিরকালজীবঃ॥"

আবার— "মিত্রোপকারী বিভবাদিযুক্তো
বিনীতমূর্ত্তিঃ স্মৃতিশাস্ত্রশীলঃ।
প্রাপ্নোতি দেশং সুতকান্তিগেহং
চন্দ্রশ্চ কেন্দ্রী নৃপতিঃ সমানঃ॥"

সেখানে এরূপ "মহাসত্ত্বের" উদয় হইয়াছে, সেখানে আর উৎসবের কথাই বা কি? বিশেষতঃ, কেবল পিতার প্রথম পুত্র নহে, বংশেও আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণের জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। জন্মের তৃতীয় দিবসে উৎসবের আয়োজন উপলক্ষে গৃহে অগ্নি লাগিয়া সমুদায় গ্রামটি ভস্মীভূত হইয়াছিল। সেই ভস্মরাশির মধ্যে বিধাতা পুরুষ পূজা গ্রহণ করিলেন, এবং প্রতিদানে আমার ভবিষ্যৎও জ্বলন্ত ভস্মে পরিপূর্ণ করিয়া গেলেন।

এই অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা সমস্ত গ্রামটি নূতন করিয়াছিলাম বলিয়া, রসিকা নামদাত্রী গুরুপত্নী আমার নাম "নবীন" রাখিয়াছিলেন। রামায়ণ হইতে পৌরাণিক নামটি গ্রহণ করিলে নামের তদপেক্ষা সার্থকতা হইত, এবং পশ্চিম-ভারতে সে নামের পূজা দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম। "নবীনচন্দ্রের" প্রতিভা দেখিতে দেখিতেই বিভাসিত হইতে লাগিল। যখন আড়াই বৎসর মাত্র বয়স, চট্টগ্রামে তখন মহাঝড় প্রবাহিত হয়। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতেছে, এবং অজস্রধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। আমার একবার সাধ হইল, ঘুড়ি উড়াইব। বৃদ্ধ পিতামহ লাঠির মাথায় তার, তারের মাথায় কাগজ বাঁধিয়া দিয়া, আমার

সেই সাধ মিটাইলেন। তখন দ্বিতীয় সাধ হইল, প্রাঙ্গণের জলে বর্ষি খেলিব। পিতামহ সেই মহাঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের মধ্যে পতিত গৃহের প্রান্তভাগে আমাকে লইয়া গিয়া সেই আবদারও পূর্ণ করিলেন। এরূপ শান্ত প্রকৃতির জন্য মাতা কোন্ দিন্ কি বলিয়াছিলেন। বৃদ্ধা পিতামহী দশভুজার সম্মুখে প্রণত হইয়া পূজা মানস করিলেন, যেন আমি মাতার কাছে আর না যাই। দেবী বুড়ীর প্রার্থনা শুনিলেন। মাতার সঙ্গে আমার কোনরূপ সংস্রব রহিল না। কিন্তু বুড়ী প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার ফলভোগ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ মুমূর্ষু শয্যাশায়ী। আমি বুড়ীকে তাঁহার পার্শ্বে মুহূর্ত্তের জন্যও বসিতে দিব না। বুড়া সেই মুমূর্ষু মুখে ঈষৎ হাসিয়া পিতামহীকে বলিলেন,—"তোমার আর আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার প্রতিনিধিকে লইয়া থাক।" আমিও প্রতিনিধিত্ব সংস্থাপন করিতে আর বিলম্ব করিলাম না। পিতামহ তুলসীতলায় মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন, বাড়ী হাহাকারে পরিপূর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, বুড়ী সেখানে যাইতে পারিবে না, কাঁদিতে পারিবে না। পিতামহ চিতারোহণ করিলেন; পিতামহী আমাকে বুকে লইয়া শুইয়া শুইয়া নানা উপকথা বলিতে লাগিলেন। প্রতিনিধির শাসন শেষে এতদূর গুরুতর হইয়া উঠিল যে, বুড়ী প্রতিদিন আপমরা হইয়া থাকিত। কিন্তু তাঁহার রাজভক্তি অটল ছিল। আমার প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার বিশেষ অনুরোধমতে আমি তাঁহার বৈতরণী কার্য্য সম্পন্ন করি। সেই শোকোদ্দীপক মন্ত্রাবলী পাঠ করিতে করিতে অশ্রুর দ্বারা তাঁহার অশেষ যন্ত্রণার ও অতুল স্নেহের প্রতিদান করিয়াছিলাম। কেন অশ্রু এ বিড়ম্বনা? আমি কি বুড়ীর জন্য এ বুড়া বয়সেও কাঁদিব?

যেমন হইয়া থাকে, পঞ্চম বৎসর বয়সে গুরুমহাশয় হাতে খড়ি দিলেন। তখন অত্যাচারের স্রোতের আর দুই শাখা বহির্গত হইয়া, এক ধারা গুরুমহাশয়ের দিকে, এবং অন্য ধারা পাড়া প্রতিবাসীদের দিকে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল। পিতামহীর আবদারের জন্য কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কেবল আমার বড় কাকাকে ভয় করিতাম। আমার পিতার তিন সহোদর। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহার কনিষ্ঠ আনন্দমোহনকে আমার স্মরণ নাই। তৎকনিষ্ঠ মদনমোহন, আমার বড় কাকা, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র আমার ছোট কাকা। বড় কাকা দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন। আমি তেমন সুপুরুষ অতি অল্পই দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবিশেষ ছিলেন। দেশশুদ্ধ তাঁহাকে "গোঁয়ার চৌধুরী" বলিত। তখন চট্টগ্রামে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার তাহা শিক্ষা হইল না। একদিন শিক্ষক কি বলিয়াছিল; তিনি তাহার সঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের নিয়ম-বহির্ভূত ব্যবহার করিয়া যে পৃষ্ঠ দেখাইলেন, আর ফিরিলেন না। পিতা তাঁহাকে কোনও মুনসেফের সেরেস্তায় লেখা পড়া শিখিতে দিলেন। সেকালের ১০০৲ টাকা মূল্যের মুসলমান মুনসেফ; পদব্রজে কাছারী যাইতেন। কিন্তু বড় কাকা বাহকের স্কন্ধে ভিন্ন চলিতেন না। পিতার একদল বেহারা চাকর থাকিত। মুন্সেফ এক দিন তাঁহাকে বলিলেন যে এক জন 'এপ্রেণ্টিস' পাল্কি চড়িয়া গেলে তাঁহার সম্মান থাকে না। বড় কাকা বলিলেন যে, পাল্কি মুন্সেফের পিতা কি প্রপিতামহ ত বহন করে না; অতএব তাহাতে তাঁহার এত ব্যথা লাগে কেন? মুনসেফ বেচারী নাচার হইয়া পিতার কাছে নালিশ করিলেন। পিতা তিরস্কার করিলে বড় কাকা বলিলেন, তিনি অমন ছোটলোকের চাকরি করিবেন না! বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর চাকরি করিতে হইল না।

এক দিকে তিনি ঘোরতর "বাবু" ছিলেন; অন্য দিকে হস্তপদাদি ক্ষিপ্রবেগে অন্যের শরীরের প্রতি চলিত। তাঁহার দুইটি প্রধান সখ ছিল। পাখী মারা ও মানুষ মারা। চট্টগ্রাম সহর হইতে বাড়ী চলিলেন; পথের দুই ধারের পাখী মারিলেন, এবং দুই এক জনের পৃষ্ঠে করচিহ্ন রাখিয়া গেলেন। দেশ শুদ্ধ লোক তাঁহাকে ভয় করিত। কেবল একটি গোলামের কাছে তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। তাহাকে একদিন কি জন্য খুব প্রহার করিলেন। সে বলিল,—"আর কেন, তোমার হাতে ব্যথা হইবে; ছাড়িয়া দাও, আর ৵০ আনা গাঁজার পয়সা দাও।" সে এইরূপে প্রায়ই গায়ে পড়িয়া মার খাইত এবং গাঁজার পয়সার যোগাড় করিত। একদিন পিতামহের শ্রাদ্ধ উপস্থিত। মহাসমারোহ; বাড়ী লোকাকীর্ণ। একটি মুসলমান প্রজাকে তিনি কলাপাত যোগাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। সে কলাপাত অল্প আনিয়াছিল। বড় কাকা সেই পাতের বোঝা শুদ্ধ একটি প্রকাণ্ড শিলা তাহার গলায় বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। বেচারী তাহা পারিল না। আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল না বলিয়া বড় কাকা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহার চীৎকার শুনিয়া বাবা সেখানে আসিয়া বড়কাকাকে তিরস্কার করিয়া লোকটিকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বড় কাকা রাগভরে যাইয়া শয়ন করিলেন। পিতা পীড়িত; শ্রাদ্ধ করিবার জন্য বড়কাকাকে ডাকিতে গেলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সেই আকবর শাহা শ্রাদ্ধ করিবে।" বহু অনুনয়ের পর শেষে বাবা যাইয়া হাত ধরিয়া তুলিলে শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন।

যেমন কুকুর, তেমনই মুগুর না হইলে হয় না। আমি একমাত্র তাঁহাকে ভয় করিতাম, তাহার বিশেষ কারণও ছিল। এক দিন তিনি বর্ষি খেলিতে যাইবেন। ছিপ প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে গিয়াছেন।

আমি এই অবসরে একে একে সব ছিপ ভাঙ্গিয়া রাখিলাম। তিনি আসিয়া একটির আগা আমার পৃষ্ঠে উড়াইলেন। এরূপ শাসনেও "স্কুলপ্রদীপ" নিস্তেজ হইলেন না। দিন দিন জ্যোতিঃ এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, ক্ষুদ্র গ্রামে আর তাহা ধরে না! অষ্টম বৎসর বয়সে বড় কাকা আমাকে চট্টগ্রাম সহরে লইয়া গেলেন।

ঘোরতর বিপ্লব।

সহরে আসিলাম। পিতা প্রত্যেক শনিবার বাড়ী যাইতেন, এবং নানাবিধ মিঠাই লইয়া যাইতেন। আমি জানিতাম যে, আকাশে যেমন ছোট বড় নানাবিধ নক্ষত্র ফলে, সহরেও তেমনই ছোট বড় নানাবিধ মিঠাই ফলে, এবং সাত দিন থাকিলে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়। অতএব নিতান্ত আগ্রহের সহতি সহরে আসিলাম, এবং কেবল মিঠাইর আকর সকল নানাবিধ মিঠাই রত্নে সজ্জিত দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিলাম, তাহা নহে; গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, পাকা বাড়ী, প্রশস্ত রাস্তা ও বিচিত্র বিপণী সারি ও সৌধ-শীর্ষ-গিরিমালা, অবিরলবাহী নির্ঝর, আমার হৃদয়-রাজ্যে এক ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিল। সেই জীবনের নব আনন্দোৎসাহ আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেরূপ আনন্দ, সেরূপ উৎসাহ, এ জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই।

পিতা তখন চট্টগ্রাম জজ আদালতের পেস্কার। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ইংরাজ-মহলে পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃত জজ বলিয়া পরিচিত। একে সুকণ্ঠ; তাহাতে আবার পারস্য ভাষায় তাঁহার এরূপ অধিকার ছিল যে, তিনি পারস্য কাগজ হাতে লইয়া অবিরল বাঙ্গালা পড়িয়া যাইতে পারিতেন, এবং বাঙ্গালা কাগজ হাতে লইয়া অবিরল ফার্শি পড়িয়া যাইতে পারিতেন। গিরিশেখরস্থ ধর্ম্মাধিকরণের দ্বিতল গৃহ কলকণ্ঠে পরিপূর্ণ করিয়া 'মিসিল' পড়িতে লাগিলেন; জজ টানা পাখায় আন্দোলিত শেখরজাত স্নিগ্ধ সমীরণে নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। 'মিসিল' পড়া তাঁহার এত দূর স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল যে, অনেক সময় তাঁহাকে নিদ্রাতেও মিসিল পড়িতে শুনিয়াছি।

মিসিল 'বন্ধ হইলে জজের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; পিতার প্রদত্ত হুকুম-দস্তখত করিলেন; বিচার কার্য্য শেষ হইল। তথাপি সেই সময়ের যাঁহাদের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলাপ হইয়াছে, সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, তখন বিচার এখন অপেক্ষা অনেক স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইত, এবং স্বল্প আয়াসসাধ্য ছিল, এবং অনেক ভাল হইত। তাহার কারণও ছিল। তখন ব্যবহার-নীতি (Law) এত দুর কঠিনতা ও জটিলতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রমাণের আইনের এরূপ কচকচি, উকীলগণের এরূপ গলাবাজি ছিল না। পিতার সদৃশ বিচক্ষণ কর্ম্মচারীগণ দেশীয় লোক। দেশের অবস্থা, লোকের চরিত্র, তাঁহাদের নখ-দর্পণে ছিল। অনেক সামাজিক ও পারিবারিক তত্ত্ব, যাহা অনেক বিবাদের মূলীভূত কারণ থাকে, তাহা তাঁহারা স্বয়ং অবগত থাকিতেন! এমন অবস্থায় তাঁহার দ্বারা যে ভাল বিচার হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এখন ব্যবহার-নীতি সকল একটা বিশাল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। দিন দিন ইহাদের সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, সময়ে ভারতবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা ভারতীয় ব্যবহার-নীতির সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা। এই বিশাল অরণ্যে, এক একটি ধর্ম্মাধিকরণ এক একটি প্রকাণ্ড জাল; ব্যারিষ্টারগণ ব্যাঘ্র; এবং উকীল মোক্তারগণ শৃগালপাল। বিচারক ব্যাধ সহস্র যোজন ব্যবধান হইতে শুভাগমন করিয়া আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া অঙ্গদের সিংহাসনে বসিয়াছেন। "মহামান্য হাইকোর্ট" এই বনভূমি নজীর রাশিতে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিতেছেন। মৃগরূপী অর্থী-প্রত্যর্থী যদি একবার ইহার সান্নিধ্যে আসিল, অমনই শৃগাল ও শার্দ্দূলগণ ঘোরতর কলরব করিয়া উভয়কে জালে ফেলিল। "ফিস"-রূপী নানাবিধ রক্ত-শোষকের দ্বারা হৃত-শোণিত হইয়া যদি শিকার জীবিত-অবস্থায় মুক্ত হইতে পারিল, অমনই আর এক দল তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া

অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকাণ্ড জালে নিপতিত করিল। ইহাদের নাম "আপীল আদালত"। যখন শেষ জাল হইতে ইহারা নিষ্কৃতিলাভ করিয়া অরণ্যের বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইল,—তখন তাহারা কঙ্কালাবশিষ্ট। এইরূপ কঙ্কালরাশিতে ভারত পরিপূর্ণ হইতেছে। এখানে নহে; এই সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। দুই একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইব।

পিতার তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। প্রাতঃকালে তিনি পূজাতে বসিয়াছেন; বৈঠকখানা লোকারণ্য। কাপড়ের বস্তা সম্মুখে হিন্দুস্থানী কাপড়ওয়ালারা; খাতা হস্তে দোকানদারগণ; ক্ষুধিত উমেদার-পাল; অর্থীপ্রত্যর্থী; আত্মীয় কুটুম্ব; যাত্রার দলের অধিকারী ও দীর্ঘকেশধারী বালকগণ; বহুদূর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণ; দুই এক জন মুন্সেফ, সদর-আমীন, আলা সদর আমীন প্রভৃতি দ্বারা বৈঠকখানা পরিপূর্ণ, এবং বহুতর তাম্রকূট-যন্ত্রে শব্দায়িত। আমার আদরের আবদারের সীমা নাই। অঙ্কে অঙ্কে বিরাজ করিতেছি। কাপড়ওয়ালারা নানা কাপড় দিতেছে; দোকানদারেরা নানাবিধ খেলানা ও খাদ্যসামগ্রী আনিয়াছে; মুন্সেফ ও সদর আমীন মহাশয়েরা আমাকে কোলে লইয়া মুষ্টিমধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা "নজর" দিতেছেন; কেহ ময়ূর, কেহ হরিণ, কেহ খরগোস, কেহ পাখী আনিয়াছেন। ৯টার সময় পিতা পূজা শেষ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। আমার রূপের, গুণের ও তেজস্বিতার প্রশংসার ঝটিকা বহিতে লাগিল। পিতা সস্নেহে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমাকে পায় কে?

আবার সন্ধ্যার সময়ে বৈঠকখানার অন্য ছবি। আলোকমালায় ঝলসিত; সঙ্গীত-শব্দে তরঙ্গায়িত; এবং আনন্দ-ধ্বনিতে নিনাদিত। এক এক জন "ওস্তাদের" মুখভঙ্গি ও ঘর্ঘরধ্বনি, এক এক জন সুগায়কের কলকণ্ঠ, আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। বৈঠকখানার কোনও

অংশে তাস, কোনও অংশে দাবা চলিতেছে; কোনও অংশে পিতার একটি বিদূষক বন্ধু নানারূপ অভিনয় করিতেছেন, হাসির তুফান বহিতেছে। যাহারা মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছে, তাহাদের পক্ষ হইতে থালা থালা সন্দেশ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য ও খাসী ইত্যাদি উদরপূজার নানাবিধ সামগ্রী আসিতেছে। সন্দেশের থাল বৈঠকখানায় রাখিবা মাত্র শূন্য হইয়া যাইতেছে। আমার হৃদয় আমোদ উৎসাহে পরিপূর্ণ। চট্টগ্রামস্কুলে পড়িতেছি। এই অবস্থায় বিদ্যুৎবেগে তিন বৎসর চলিয়া গেল। জীবনের অদ্বিতীয় সুখের অঙ্ক শেষ হইল।

প্রথম শোক।

শীতকাল। বাৎসরিক পরীক্ষা বা বিভীষিকা নিকটবর্ত্তী। শেষরাত্রিতে পড়িতে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে প্রদীপ জ্বালিয়া দিবার জন্য ডাকিতে লাগিলাম। বড় কাকা ভগ্নকণ্ঠে বৈঠকখানা হইতে বলিলেন,—"তাহাকে এখানে আসিতে দিও না।" সেই ক্ষীণকণ্ঠে আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"কর্ত্তা তোমাকে তাঁহার বিছানায় যাইয়া শুইতে বলিয়াছেন। তোমার বড় কাকার ওলাউঠা হইয়াছে। আজ পড়িতে পাইবে না।" ওলাউঠা কি, তখন তাহা জানিতাম না। এইমাত্র জানিতাম যে, একটা মারাত্মক রোগের নাম। প্রাণ শুকাইয়া গেল। পুতুলের মত ভৃত্য আমাকে ধরিয়া পিতার বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইল। পিতার শয়ন-কক্ষ বৈঠকখানা হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে ছিল। আমার মনে কি এক অনিশ্চিত ভয়, শোক ও চিন্তার উদয় হইল। আমি উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বোধ হয় ভৃত্য যাইয়া সে কথা বলিয়াছিল। বড় কাকা রোরুদ্যমানকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবা! এস! আমাকে এ জীবনের মত একবার দেখিয়া যাও।" আমি ছুটিয়া গেলাম; বড় কাকা বাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে লইলেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন; আমিও তাঁহার বক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। করুণ-হৃদয় পিতাও শয্যার শীর্ষদেশে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। বৈঠকখানা লোকপূর্ণ, কিন্তু নীরব। মিট মিট করিয়া দুই তিনটি প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র। পাঁচ মিনিট কাল বড় কাকা আমাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে ধরিয়া,—আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার ইচ্ছা আমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দেন,—আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার গলা হইতে সোণার

মালা ছড়া খুলিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাবা! আর কাঁদিও না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হইবে। আর আমার কাছে বসিও না।" পার্শ্বস্থিত ভৃত্যকে বলিলেন,—"ইহাকে লইয়া যা।" আমি তখন তাঁহার বক্ষঃ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছিলাম। বালকের কান্না,—অজস্র, অবারিত, উচ্ছ্বাসপূর্ণ। ভৃত্য সজোরে আমার বাহুবন্ধন খুলিয়া আমাকে ধরিয়া আবার পিতার শয্যায় লইয়া গেল। আমি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছে, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আস্তে আস্তে সেই কক্ষে আসিয়া আমাকে বলিলেন,—"নবীন! তোমার কাকাকে বাড়ী লইয়া যাও। যে ঔষধ আছে, তাহা নিয়মিত খাওয়াইও।" অতি কষ্টে তিনি এই কয়টি কথা বলিলেন। তিনি পিতার ও বড় কাকার বড় বন্ধু ছিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষের পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চীৎকার করিয়া শয্যা হইতে পড়িয়া গেলাম। পিতা সে চীৎকারের অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কয়েক জন লোকে ধরিয়া অন্য গৃহে লইয়া গেল। বড় কাকা তখন মূর্চ্ছাপন্ন। পিতার বেতনভোগী বেহারা ছিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শিবিকায় উঠাইয়া লইয়া বাড়ী চলিলাম। অর্দ্ধপথে শিবনেত্র হইল; বাকশক্তি রহিত হইয়া গেল। পর দিন প্রাতে বাড়ীতে বড় কাকা এই বালকের একটি স্নেহকক্ষ চিরদিনের জন্য অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন। রোদনধ্বনিতে গ্রাম বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু আমি কাঁদিলাম না। আমার হৃদয় মরুভূমির মত হু হু করিতেছিল। বড় কাকা আমাকে ভয়ানক শাসন করিতেন; কিন্তু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় সেই স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। পিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল

না।" আমি বড় কাকার সঙ্গে খাইতাম, শুইতাম, শিকার করিতে যাইতাম, ছায়ার মত অঙ্গে লাগিয়া থাকিতাম। বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় একটিমাত্র ছবিতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই ছায়া আমার বড় কাকার। তিনি নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু সেই অগ্নি-রাশির মধ্যে স্নেহের একটি নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত ছিল। তিনি নিতান্ত সরলহৃদয় ও সৌখীন ছিলেন, এবং যেরূপ তেজস্বী, সেইরূপ উচ্চমনা ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় পিতাকে কেবল একটিমাত্র অনুরোধ করিয়াছিলেন,—"আমাকে ঋণগ্রস্ত রাখিবেন না।" তাঁহার চিতানলে আমার নবাঙ্কুরিত উৎসাহ ভস্মীভূত হইল, এবং হৃদয়ে একপ্রকার বয়োধিক চিন্তাশীলতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল। সেই মগধেশ্বরীর তীরে, সেই বংশীয় শ্মশান সমক্ষে, সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের দিকে চাহিয়া, সদ্যো-বিধবা পিতৃব্যপত্নীর বুকে মাথা রাখিয়া, এবং তাঁহার শিশু পুত্র কোলে লইয়া, একাদশবর্ষীয় বালক প্রতিজ্ঞা করিল, তাঁহা-দিগকে আপনার মাতা ও ভ্রাতার অপেক্ষা অধিক যত্ন করিবে। তাহা-দিগকে সুখী করিতে পারিলে আপনার জীবন সার্থক মনে করিবে। কুলমাতা বালকের প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছিলেন, এবং তাহা রক্ষা করিয়াছেন। এইটি আমার জীবনের একটি প্রধান সান্ত্বনা, প্রধান সুখ।

তাহার কিছুদিন পরে ছোট কাকাও সেই সাংঘাতিক রোগে একই সময়ে, একই বারে, আক্রান্ত হইয়া, একরূপ অবস্থায়, একই সময়ে বড় কাকার অনুসরণ করিলেন। পিতা বলিলেন, তাঁহার—"উভয় বাহু ভগ্ন হইল।" উৎসাহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইল। আমি ঘোরতর পীড়িত হইলাম; এক এক দিন মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতাম। প্লীহাতে উদর এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, আমার ছোট ভ্রাতা ভগ্নীগণও আমাকে "গণেশ" বলিয়া ক্ষেপাইত। স্কুলে যাওয়া একরূপ বৎসর

াবং বন্ধ হইয়াছিল। আমি পঞ্চম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আপন ইচ্ছায় নামিয়া গেলাম। সেই সময়ে আমাদের সহরের বাসাবাড়ী পুড়িয়া গেল। এই স্থানের প্রতি পিতার হতশ্রদ্ধা হওয়াতে আমরা স্থানান্তরে গেলাম। ঈশ্বর মঙ্গলময়। এই অধোগতি ও গৃহদাহ, আমার ভাবী উন্নতির দুইটি প্রধান কারণ হইল।

কৈশোর।

পিতার এক জন বন্ধু বিদেশে চাকরী করিতেন। তাঁহার বাসাবাড়ী খালি পড়িয়াছিল। সেই বাসা সহরের মধ্যস্থানে একটি অনুচ্চ গিরি-শেখরে। আমরা সেই বাসায় গেলাম। তাহার পার্শ্বে চন্দ্রকুমারের বাসা। চন্দ্রকুমারের মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতা আমার ছোট পিসীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব চন্দ্রকুমার আমার একপ্রকার পিস্তুত ভাই, এবং কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া, আমি তাহাকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতাম। আমি নামিয়া গিয়া চন্দ্রকুমারের সমপাঠী হইয়া-ছিলাম। চন্দ্রকুমারের ও আমার চরিত্র ঠিক দুইটি বিপরীত চিত্র। চন্দ্রকুমার শান্ত, সুশীল; আমার অশান্ত চরিত্রের কথা স্মরণ হইলে এখনও লজ্জা হয়। চন্দ্রকুমার নিতান্ত স্থির; আমি একান্ত চঞ্চল। চন্দ্রকুমার জিতেন্দ্রিয়; আমি ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ। চন্দ্রকুমার ভীরু; আমি নির্ভীক। চন্দ্রকুমার নম্র; আমি উদ্ধত। চন্দ্রকুমার লোকের সঙ্গে কথাটি কহে না; আমি যাহাকে পাই, না ক্ষেপাইয়া ছাড়ি না। চন্দ্রকুমার পুস্তকাসক্ত; আমি ক্রীড়াসক্ত। চন্দ্রকুমার তখনও সংসার বুঝে; আমার এখনও সে জ্ঞান হয় নাই। চন্দ্রকুমার বিবেকের প্রতিমূর্ত্তি; আমি কল্পনার ক্রীড়াপুত্তল। চন্দ্রকুমারের চরিত্র "জুডিসিয়াল"; আমার চরিত্র "এক্সিকিউটিভ।" চন্দ্রকুমার মুন্সেফ; আমি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। এইরূপে আমাদের দুই জনের চরিত্র পৃথিবীর দুই অন্তের ন্যায় ব্যবহিত। কিন্তু কি শুভক্ষণে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল! এই দুইটি এতাদৃশ বিপরীত হৃদয় এক হইয়া গেল। আমি অধঃপাতে যাইতে-ছিলাম; কিন্তু চন্দ্রকুমারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাকে আকর্ষণ করিয়া আমার উন্নতির দিকে লইয়া চলিল। চন্দ্রকুমারের বন্ধুতা আমার

ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তিভূমি হইল। আজি আমি যাহা, তাহা চন্দ্রকুমারের সৃষ্টি। আমার যাহা কিছু ভাল, তাহা চন্দ্রকুমারের। যাহা কিছু মন্দ, তাহা আমার নিজের। তাহা দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তির বেগে চন্দ্রকুমারের যত্ন ভাসিয়া যাইবার ফল।

বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি ক্রীড়াতে উন্মত্ত হইয়া গিরি-শৃঙ্গ নিনাদিত করিতাম। চন্দ্রকুমার নীরবে বসিয়া অভিধান খুলিয়া অর্থ লিখিত; অঙ্ক কসিত। সন্ধ্যা হইলে আমি তাহা গোগ্রাসে মুখস্থ করিয়া চম্পট দিতাম। কোনও কোনও দিন চন্দ্রকুমারের কাছে এই কুড়েমির জন্য মার খাইতাম। এক দিকে মার পিঠে দাখিল হইত; অন্য দিকে শব্দার্থ সকল স্মৃতিমন্দিরে যাইয়া দাখিল হইত। একে অন্যের ব্যাঘাত করিত না। এই কার্য্য শেষ হইলে, একেবারে পিতার বৈঠকখানায় যাইয়া দাখিল হইতাম। নানাবিধ সঙ্গীত ও খোসগল্প শুনিয়া, কিংবা পিতা বাসায় না থাকিলে আবার কোনওরূপ খেলায় রত হইয়া, কিংবা কাহাকেও ক্ষেপাইয়া, সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতাম। আমি দীপালোকে পড়িতে পারিতাম না। এখনও কোনও কার্য্য করিতে পারি না। স্মরণ হয়, সন্ধ্যার সময়ে আমাকে পড়িতে বাধ্য করিবার জন্য চন্দ্রকুমার ইচ্ছা করিয়া এক এক দিন অনেক বেশী পড়া লইত। সে দিন ক্রীড়াঙ্গণে প্রবেশ করিতে আমার অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইত মাত্র। আমার স্মৃতিশক্তি কিঞ্চিৎ প্রখর ছিল। শিক্ষক মহাশয় চন্দ্রকুমারকে "চির-চিরা", আমাকে "বেগ-বেগা" বলিতেন। অর্থাৎ, চন্দ্রকুমার চিরকষ্টে যাহা শিখে, তাহা চিরকাল ভুলে না; আমি বেগে শিখি, বেগে ভুলি। শিক্ষক মহাশয় যে জহুরী মন্দ ছিলেন, এমন বলিতে পারি না।

তখনও আমার চরিত্র এত অশান্ত যে, বিদ্যালয়ে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে

আমি Wicked the great—"দুষ্টশিরোমণি"—উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এখন অনেকে টাকা দিয়া উপাধি ক্রয় করেন। কেহ যদি আমার এই উপাধিটি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিবেন। আমি বিনা মূল্যে বিক্রয় করিব। বর্ত্তমান উপাধি সকল অপেক্ষা ইহার একটি গুরুতর মহত্ব আছে। ইহার জন্য ভবিষ্যতে চাঁদার ও চাপরাসীর ভয়ে অনিদ্রায় নিশিযাপন করিতে হইবে না। দেশীয় সম্পাদকগণ এই অংশটি উদ্ধৃত করিবেন।

স্কুলের ছাত্রের দ্বারা যেখানে যাহা গোল হইত, শিক্ষক মহাশয়েরা আমাকে আসিয়া গ্রেপ্তার করিতেন। বলিতেন,—"তোমার সম্প্রদায় দ্বারা হইয়াছে।" বাস্তবিক আমার একটি সম্প্রদায় ছিল, এবং তাহার জন্য সময়ে সময়ে আমাকে কিঞ্চিৎ বিপদগ্রস্ত হইতে হইত। চট্টগ্রামের তদানীন্তন উচ্চতম দেশীয় কর্ম্মচারীর পুত্রমাত্রই এই দলভুক্ত ছিলেন, এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত স্কুলে যাঁহারা প্রধান বলবান ও খেলোয়ার বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, তাঁহারও এই দলভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা আমার Body-guard (শরীররক্ষক) ছিলেন। গিরি-গহ্বরে পর্য্যটন, বলপূর্ব্বক ফলমূল-ভক্ষণ; নির্ঝরিণী-পার্শ্বে বসিয়া মিঠাই-ভোজন; নিশিতে যাত্রা-শ্রবণ; এবং প্রতিরুদ্ধ হইলে ভুজবল-প্রদর্শন, এই সম্প্রদায়ের কার্য্যাবলি ছিল। কিন্তু সকলেই ভাল ছেলে ছিল। বড় সুখের বিষয় যে, আজ সকলেই ভাল অবস্থায় অবস্থিত। কেবল দুই এক জন অকালে তাহাদের স্থান শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সকাল বেলার আহার নিয়মিতরূপে আমার অদৃষ্টে ঘটিত না। কারণ আমি ৮ টার সময় স্কুলে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। বলিতে হইবে না, আমার সম্প্রদায়ও প্রায় সেই সময়ে উপস্থিত হইতেন। দুই ঘণ্টা কাল ক্রিকেট ইত্যাদি নানাবিধ ক্রীড়ায় অতিবাহিত হইত। কেহ যেন

মনে না করেন যে, কেবল স্কুল-গৃহেই আমার সৎকীর্ত্তির শেষ হইত। পিতামহীর প্রতিপালিত বলিয়া মাতার সঙ্গে আমার একেবারে সদ্ভাব ছিল না। তিনি একদিন কি বলিয়াছিলেন,—রাগ করিয়া এক শিশি Smelling salt খাইয়া ফেলিলাম। আর একদিন পিস্তল দিয়া শিকার করিয়া নিজের মস্তকের সচক্ষু বামপার্শ্ব শিকার করিয়া ছয় মাস যাবৎ অর্দ্ধ-অন্ধ ও শয্যাশায়ী ছিলাম। শৈশবে পিসীর সঙ্গে কচু গাছ বলিদান করিতে গিয়া আপনার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ বলিদান করিয়াছিলাম। এবংবিধ কীর্ত্তির ইতিহাস আমার অঙ্গে অঙ্গে লিখিত হইয়াছিল। তবে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে বলিয়া মরি নাই। কোনও কোনও কল্পনাপরায়ণ শিক্ষক আমাকে তজ্জন্য ক্লাইবের সঙ্গে তুলনা করিতেন। তুলনার সার্থকতা হইয়াছে। ক্লাইব পলাশির যুদ্ধের দ্বারা ভারতরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; আর আমি আমার "পলাশির যুদ্ধের" দ্বারা ভারতরাজ্যের ধ্বংসকারী বলিয়া রাজপুরুষদের কাছে পরিচিত। ক্লাইব পলাশির যুদ্ধের দ্বারা খ্যাত্যাপন্ন, আমিও "পলাশির যুদ্ধের" দ্বারা খ্যাত্যাপন্ন। তবে আমি কম কিসে?

—o—

মুন্সী সাহেব ও পণ্ডিত মহাশয়।

তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের একটি মুসলমান শিক্ষক ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ খোঁড়া ছিলেন, এবং শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার তত দূর ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু লোকটি নিতান্ত ভাল মানুষ। অঙ্কের সময় উপস্থিত হইলেই মুন্সী সাহেবের লাইব্রেরির কার্য্য আসিয়া পড়িত। তিনি স্কুলের (Librarian) ছিলেন। অঙ্ক আমরা চন্দ্রকুমারের কাছেই শিক্ষা করিতাম। এমন সুন্দর সুযোগ হারাইবার পাত্র আমি নহি। দুই একদিন অন্তর, ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত খেলিয়া, যেই স্কুল বসিল, অমনই মাথায় এক প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া মুন্সী সাহেবের কাছে হাজির হইলাম। জ্বর। মুন্সী বড় দুঃখিত হইলেন। চন্দ্রকুমারকে পড়া লইতে বলিলেন। চন্দ্রকুমার দুই চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মুন্সী সাহেব সকল বিষয়ে পুরা নম্বর দিলেন। নবীনচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় এক সেলাম দিয়া বহির্গত হইলেন। মুন্সী সাহেব উত্তরাধিকারী সত্ত্বে একটি ইতিহাসের 'নোটবুক' পাইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণকে তিনি তাহাতে নিঃস্বার্থভাবে অংশী করিতেন। এই নোটবুক লইয়া আমরা বড় জ্বালাতন হইতাম। তিনি এই নোটবুক ভিন্ন অন্য কোনও ইতিহাস পড়েন নাই; অতএব তিনি আমাদিগকে পড়াইবেন কেন? তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই নোটবুক ভিন্ন অন্য ইতিহাস সকল অশুদ্ধ। যে দিন নিতান্ত নোটবুক মুখস্ত করিতে না পারিতাম, আমি এক সংখ্যা "প্রভাকর" লইয়া যাইতাম। মুন্সী সাহেব তাহাকে "পর্‌ভাকর" বলিতেন। তিনি কবিতা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। "পর্‌ভাকর" দেখিবামাত্র আমাকে পড়িতে বলিতেন। তাঁহার নিজে পড়া কিছু কষ্টকর ছিল। আমি একখানি টুল টানিয়া

লইয়া মুন্সী সাহেবের কাণের কাছে পড়িতে বসিতাম। মুন্সী সাহেব খঞ্জপাদদ্বয় টেবিলের উপর উঠাইয়া, জ্যামিতির একটি অর্দ্ধ-চক্র-রেখাকৃতি হইয়া, পদ্ম-নেত্রদ্বয় নিমীলিত ও আমাকে পেঁয়াজের গন্ধে মোহিত করিয়া বসিতেন। গুপ্তজার কবিতার কি শক্তি ছিল, জানি না। দুই চারি চরণ পড়িতে পড়িতেই মুন্সী সাহেবের নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইত। নোটবুকের জ্বালা ফুরাইত। কবিতা ভিন্ন মুন্সী সাহেব 'গাজির গান'ও বড় ভালবাসিতেন। ক্লাসে খঞ্জপদে গজেন্দ্র-গমনে পাদচারণ করিতে করিতে তাহা অস্ফুটকণ্ঠে গায়িতেন, এবং ফিরিয়া 'কপিবুক' লিখিবার সময়ে আমাদের পৃষ্ঠে তালরক্ষা করিতেন। "কাফের" ছাত্রদের নাম মুন্সী সাহেবকে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ বিপদগ্রস্ত করিত। তিনি ক্ষীরোদকে দাঁড়াইতে বলিবেন, কিন্তু বলিলেন, Mohesh! stand up! "মহেশ দাঁড়াও।" মহেশ বেচারী দাঁড়াইল, এবং তজ্জন্য "নভূত ন ভবিষ্যতি" মার খাইল। মহেশের নামে কোনও অপরাধের জন্য রিপোর্ট করিতেছেন, লিখিয়া দিলেন, "ক্ষীরোদ।" হেডমাষ্টার তাহাকে দণ্ড দিতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; মুন্সী সাহেব ভুল সংশোধন করিতে ছুটিলেন। স্কুলে হাসির তুফান উঠিল।

বিচ্ছেদ প্রকৃতির একটি অখণ্ডনীয় নিয়ম। এক দিন সকলকে সকল ত্যাগ করিতে হয়। পিতা পুত্রকে; পুত্র পিতাকে; পত্নী পতিকে; পতি পত্নীকে। এক দিন মুন্সী সাহেবকেও তাঁহার মহামূল্য নোটবুক ত্যাগ করিতে হইল। বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষাসনে এক জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। ইতিহাসের পরীক্ষা হইতেছে। মুন্সী সাহেব ছাত্রদের পৃষ্ঠদেশে এক একটা গুপ্ত গুঁতো দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বেটারা, আমার নোটমতে লিখছিস্ না?" ছাত্রেরা এই

অভ্রান্ত ইঙ্গিতমতে একবাক্যে মুখস্থ নোটবুক অনুসারে উত্তর লিখিয়া দিল। পরীক্ষকের নিকট হইতে যখন পরীক্ষার্থীর তালিকা ফিরিয়া আসিল, স্কুলে একটা গোল পড়িয়া গেল। পরীক্ষক সমস্ত পরীক্ষার্থীর নাম ব্যাপিয়া একটি প্রকাণ্ড ব্রেকেট দিয়াছেন, এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে একটি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দিয়াছেন। নীচে মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন,—"ছোট তোতারা বুড়া তোতার কাছে শিখিয়াছে।" সাতাশ পাউণ্ডার কামানের গোলার মত, এই ব্রহ্মাণ্ডে মহামূল্য নোটবুক বিধ্বস্ত করিল, এবং মুন্সী সাহেবের হৃদয়-রাজ্যে একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। অকস্মাৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে তিনি অধিক অপ্রস্তুত হইতেন না। এই পৃথিবীতে মূল্যবান্ জিনিসের আদর কোথায়? অগত্যা মুন্সী সাহেবকে "নোটবুক" কবরস্থ করিতে হইল। আহা! আজ সেই মহা-পুস্তক কোথায়? তাঁহার ছাত্রগণের মানসমন্দিরে প্রতিধ্বনি হইবে,—"কোথায়?" কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার অনেক পৃষ্ঠা এখনও তাঁহাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত আছে। মুন্সী সাহেব উপর্য্যুপরি ঘুসির দ্বারা তাহা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার সকল ছাত্রের স্মৃতি একত্র করিলে তাহার পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বত্রই একটি আমোদের বস্তু। আমাদের পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁহার বাড়ী কুষ্টিয়ার এলেকায় গোঁসাইদুর্গাপুর। আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আমোদ হইত। আমরা কয়েক জন একটু বেশী হাসিতাম। অতএব তাঁহার নির্দ্দেশ ছিল যে, তাঁহার ঘণ্টায় আমরা এক স্থানে বসিব। ব্রাহ্মণ শুধু আমাদিগকে মারিবার জন্য ক্লাসে প্রবেশ করিবামাত্র তিপ্পান্ন রকম মুখভঙ্গি করিতেন। আমরা হাসি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া হাসিয়া উঠিতাম। আর অমনই পণ্ডিত মহাশয় ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ

করিতেন। কিন্তু এই মার খাইতাম, এই হাসিতাম। প্রহারের পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র নানাবিধ মন্ত্রও উচ্চারিত হইত। কখনও—

"অতি হাসায় কান্না;
বলে গেছে দ্বিজ রামশর্ম্মা!"

কখনও—

"ননি ছানা খাইয়া,
মাখন লইয়া,
কদম্বের ডালে বসিয়া,
বাঁশীটি বাজাও হে!"

আমাদের রোদনধ্বনির নাম বংশীধ্বনি! আবার কখনও—

"মস্তকেতে পক্ক কেশ,
দন্ত লড়ে অশেষ,
তুমি ভাল পড় বেশ!"

(তাহার পর বিকট মুখভঙ্গী ও প্রহার, এবং ছাত্র চীৎকার করিতে থাকিলে)—"আহা! মরি! বেশ! বেশ!" এই মন্ত্রে বয়োধিক ছাত্রগণ উৎসর্গিত হইত। কৃষ্ণবর্ণ ফিরিঙ্গী ছাত্রদের জন্য একটি সংস্কৃত ধ্যান ছিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা পাঠ করিতেন। "সাহেবং শুক্লবর্ণং চেয়ারোপরি উপবেশনং" ইত্যাদি। উহা চট্টগ্রামের পণ্ডিতদের সংস্কৃতের বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ। আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে ইহার প্রতিশোধ দিতে ত্রুটি করিতাম না। শীতকালে চট্টগ্রামে তখন বড় বাঘের ভয় হইত। পণ্ডিত মহাশয় নিতান্ত ভীরু ছিলেন। তাঁহার বাসার নিকট আমার সম্প্রদায়ভুক্ত একটি ছাত্র থাকিত। সে রাত্রিতে হাঁড়ির মধ্যে বাঁশের চোঙ্গা দিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরের পার্শ্বে ব্যাঘ্রের ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিত। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে কখনও বা বিছানায়,

কখনও বা গৃহের মধ্যে, অকার্য্য করিয়া ফেলিতেন। পর দিবস তাহা লইয়া বৃদ্ধ ভৃত্যের সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ হইত এবং স্কুলে হাসির তুফান ছুটিত।

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এক জন উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন। আমরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। তাঁহার কাছে যাহা বাঙ্গালা শিখিয়া আসিয়াছিলাম, বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমরা তাহাতেই পার পাইয়া গিয়াছি। তখন স্কুল কলেজে সংস্কৃত প্রচলিত ছিল না। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অতি উত্তমরূপে জানিতেন, এবং কবিত্বশক্তিতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের তিনিও এক জন বড় পক্ষপাতী শিষ্য ছিলেন। আমি যাহা কবিতা লিখিতে শিখিয়াছি, তাহার জন্য তাঁহার নিকট আমি সম্পূর্ণরূপে ঋণী। কবিতা রচনা সম্বন্ধে তিনি আমায় বড় যত্ন করিতেন, এবং এক জন প্রধান উৎসাহী ছিলেন। যদিও তাঁহার ভাল-বাসাটি কিছু "গিরিজায়া-দিগ্বিজয়" ধরণের ছিল, সময়ে সময়ে তিনি আমাকে 'শাপ' দিতেন, এবং আমি তাঁহাকে "বেঙ্গ" দিতাম, তথাপি তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং আমি তাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত শ্রদ্ধা করিতাম। আমার শিক্ষকমাত্রেরই প্রতি আমার অচলা ভক্তি। নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষককে দেখিলেও আমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়, এবং তাঁহার সঙ্গে এখনও সঙ্কোচের সহিত আলাপ করি।

ভগ্নদূত।

চন্দ্রকুমারের বাসার সম্মুখে আমাদের ক্রীড়াভূমি। তাহার অপর পার্শ্বে মজুমদার মহাশয়ের আশ্রম। মজুমদার মহাশয় দেখিতে একটি অর্দ্ধদগ্ধ সরল কাষ্ঠযষ্টি। এক চক্ষু অন্ধ। ক্ষুদ্র মুখখানি বসন্ত-রোগের গিরিগহ্বরে পরিপূর্ণ; তাহাতে ছায়ালোক খেলিতেছে। মস্তকে স্থানে স্থানে কয়েকটি শ্বেতকৃষ্ণ ক্ষুদ্র কেশ আছে; তালুকাদেশ একটি অর্দ্ধপক্ক তালের মত। তিনি একজন ঘোরতর তান্ত্রিক। উভয়ের কি শুভক্ষণে সাক্ষাৎ, বলিতে পারি না। তিনি আমাকে দেখিলেই ক্ষেপিয়া উঠিতেন! আমিও তাঁহাকে দেখিলে না ক্ষেপাইয়া থাকিতে পারিতাম না। তাঁহার নাম শুক্রাচার্য্য রাখিয়াছিলাম, এবং তাঁহাকে দেখিলেই আমার প্রায়ই দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া যাইত,—জড় পদার্থের কি দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ, জানি না। চট্টগ্রামে আমার নিন্দা প্রকাশের জন্য মজুমদার মহাশয় একটি জীবন্ত 'গেজেট'। আমিও এই গেজেটের "আর্টিকেলে"র ও বিজ্ঞাপনের বিষয় যোগাইতে ত্রুটি করিতাম না। মজুমদার মহাশয় তান্ত্রিক। বাম হস্তের অঙ্গুলিত্রয়ের শীর্ষদেশে "পাত্র" (দেশীয় সুরাপূর্ণ আঁচি) লইয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন, আমি বজ্রশব্দে সম্মুখের বাঁশের বেড়ায় "বল" নিক্ষেপ করিলাম। ধ্যানস্থ মজুমদার চমকিয়া উঠিলেন। পাত্র পড়িয়া গেল। বেড়ার ছিদ্রের মধ্যে কাঠি দিয়া কখনও বা ধ্যানমগ্নাবস্থায় তাঁহার করস্থ পাত্রটি, পার্শ্বস্থ খোলা যন্ত্রটি (মদের বোতল), এবং পুষ্প পাত্রস্থ শিবলিঙ্গটি ফেলিয়া দিতাম। তখন তিনি বেতালা বেসুরা চীৎকার করিয়া আমাকে নানারূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন, এবং শিবলিঙ্গকে বিল্বপত্র দিয়া আমার জন্য নানারূপ বর প্রার্থনা করিতেন। কখনও বা বৃহৎ ঠেঙ্গা লইয়া ছুটিয়া আসিতেন। কিন্তু একটি চক্ষু বই নহে; তাহাতে এক মুষ্টি ধূলি

প্রয়োগ করিলে আমার আর পলায়নের বিঘ্ন কে করে? কখন বা তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার ভৃত্যের সঙ্গে পিরীত করিয়া মজুমদার মহাশয়ের যন্ত্রের ধান্যেশ্বরীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্য উদ্ভিজ্জের রস মিশাইয়া রাখিয়া আসিতাম। ধান্যেশ্বরীর মহিমায় তাহার গন্ধ ঢাকিয়া যাইত। মজুমদার মহাশয় তাহা মন্ত্রপুত করিয়া ভক্তিভরে পান করিতেন, এবং উদ্গারশব্দে গিরিশেখর প্রতিধ্বনিত করিতেন। তান্ত্রিকেরা গোপনে সুরাপান করে; কিছু বলিবার যো নাই। এইরূপে মধ্যে মধ্যে মজুমদার মহাশয়ের ও আমার নানারূপ অভিনয় হইত। তিনি এক দিন ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

আমার পিতার এক বন্ধু ছিলেন। এ ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার তুল্য বাঙ্গালা ভূভারতে কেহ জানে না। প্রভাকরের তখন মধ্যাহ্ন-প্রভা, এবং গুপ্তজার গদ্য পদ্য বাঙ্গালার আদর্শ। যিনি যত দীর্ঘ অনুপ্রাসের হার গাঁথিতে পারিতেন, তিনি তত মুন্সী। যখন ইহা এত দূর হইল যে, অর্থগ্রহণ করা কঠিন, তখন মুন্সীয়ানার পরাকাষ্ঠা হইল। আমার পিতৃ-বন্ধুও এরূপ ভাষায় নিতান্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্র হইতে ইতিহাস পর্য্যন্ত অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া ছাপিয়াও ছিলেন; কিন্তু মুন্সী সাহেবের মহামূল্য "নোটবুকে"র মত এই গুণগ্রহণক্ষম জগতে কেহ তাহা পড়িল না। তাহা না হইলে অনুপ্রাসের দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় শাস্ত্র অধীত হইতে পারিত; অঙ্ক পর্য্যন্ত কসা যাইত।

এই বঙ্গভাষা-বিশারদ বিদেশে চাকরী করিতেন। দেশে আসিলে আমাকে আর চন্দ্রকুমারকে বড়ই জ্বালাতন করিতেন। পথে ঘাটে যেখানে আমাদিগকে পাইতেন, পরীক্ষা করিয়া লইতেন। তিনি বিদেশে চাকরী করিতেন, তাই আমাদের রক্ষা। একদিন ঊর্দ্ধশ্বাসে

ক্রীড়াভূমে ছুটিয়াছি ; তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ। যেই সাক্ষাৎ, সেই প্রশ্ন,— সন্ধি কাহাকে বলে ? অমনই বলিলেন,—"যদি উত্তর দিতে না পার, তবে কাণ মলিয়া দিব।" আমি দেখিলাম ইঁহার সঙ্গে আর ভদ্রতা করিলে চলিবে না। বলিলাম,—"তাহারই নাম সন্ধি, কর্ণের সঙ্গে করের সংযোগ।" বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া আমাকে নানা স্বরে বহুবার "বেল্লিক" উপাধি দিয়া বলিলেন,— "আমার সঙ্গে ঠাট্টা ? তোমার বাবার কাছে বলিয়া পাঠাইব, যেন কাণ দুখানি কাটিয়া দেন।" উত্তর,—"একরূপ ভাল। কাণমলা আর থাইতে হইবে না।" এই বলিয়া আমি ছুটিলাম। আমি জানিতাম যে, আমার কাণ দুখানি এত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে যে, পিতা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিবেন। এ যাত্রা এক প্রকার নিষ্কৃতি পাইলাম।

তাহার পরের যাত্রায় আমার টীকা হওয়ায় আমি বাড়ীতে ছিলাম। সহরে আসিয়া চন্দ্রকুমারের কাছে শুনিলাম যে, চট্টগ্রামে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমাদের উপর প্রশ্নমালা ঝাড়িয়াছেন।—

১। সন্তান উৎপাদন করিবার সময় পিতার মনে কি আশা থাকে ?

২। পিতার সে আশা বিফল হইলে মনে কিরূপ কষ্ট হয় ?

৩। পিতার সেই আশা পূরণ করিবার জন্য সন্তানের কি করা কর্ত্তব্য ?

এরূপ আরও দুই একটি ছিল। ছাই ভুলিয়া গিয়াছি। আদেশ,— এই প্রশ্নের উত্তরে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। চন্দ্রকুমার বেচারী ভাবিয়া অস্থির, ইহার উত্তর মাথা মুণ্ড কি লিখিবে ? আমাদের তখন বয়স বড় জোর চৌদ্দ বৎসর। অতএব আমরা সন্তান উৎপাদনের কি ধার ধারি ? তথাপি চন্দ্রকুমার এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছে। আমার তত অবকাশ কোথায় ? বিশেষতঃ এই ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে

হইবে। আমি সংক্ষেপে উত্তর লিখিলাম যে, আমি বালক; পিতা হই নাই। অতএব সন্তান উৎপাদনের কোন খবর রাখি না। উত্তর পাইয়া পিতৃ-বন্ধু একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। মজুমদার মহাশয়কে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শুক্রাচার্য্য আমার উত্তর লইয়া পিতার সমক্ষ উপস্থিত হইলেন, এবং আমার দুষ্টচরিত্র সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা করিয়া উত্তর পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। পিতা উত্তর পড়িয়া একটু হাসিলেন, এবং তাঁহার বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন,—"তিনিও পাগল, বালককে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কেন?" আমার তলব হইল। আমি অতি শান্তভাবে নতশিরে পিতার আদালতে উপস্থিত হইলাম। পিতা কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। মজুমদার মহাশয়ের এক চক্ষু হাসিতে লাগিল। আজি তাঁহার এক দিন! তাই বলিয়াছি যে, এক দিন তিনি প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

তিনি বিজয়ী বীরের ন্যায় গর্ব্বভরে এক চক্ষু লইয়া চলিলেন। রাস্তায় প্রবেশ করিবা মাত্র, আমার এক চর, তাহার এক চক্ষুতে একখানি কাগজ বসাইয়া, তাঁহার সম্মুখে যাইয়া "শুক্রাচার্য্য! সেলাম" বলিয়া কিঞ্চিৎ অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া এক সেলাম করিল। তিনি দাঁত খিচিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উঠিলেন; অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি পট্‌কা বাজি ফুটিল। তিনি জানিতেন আমি সেই বয়সেও শিকার করিতাম। "গুলি করিয়াছে, খুন করিয়াছে" বলিয়া সপ্তস্বরে এক চীৎকার নির্গত করিয়া তিনি ধরাশায়ী হইলেন। রাস্তা লোকাকীর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর যখন লোকেরা বুঝাইয়া দিল যে তিনি খুন হন নাই, তিনি উঠিয়া যাইতে লাগিলেন; আর রাস্তার ইতর বালকেরা তাঁহাকে তাড়াইতে আরম্ভ করিল। ইতি শুক্রাচার্য্য দৈত্য নামা মহা সর্গ সমাপ্ত।

পিতৃ-বন্ধু দূতের দুর্গতি শুনিয়া ক্ষেপিলেন। তিনি বিদেশে

যাইতেছেন। তাঁহার পুত্রকে দেশে পিতার কাছে রাখিয়া চট্টগ্রাম স্কুলে পড়াইতে পিতা বলিলেন। তিনি সেই সুযোগ পাইয়া বলিলেন,—"তোমার ছেলেকে তুমি যে শিক্ষা দিতেছ, তাহা দেখিতেছি। আমার ছেলে; আমরা টাঙ্গন ঘোড়া।" পিতার মুখ মলিন হইল। সেই দৃশ্য আমার অন্তঃস্থলে যাইয়া আঘাত করিল। প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি যে পিতার অপরিসীম স্নেহের অপব্যবহার করিতেছি না, তাহা এক দিন ইহাকে দেখাইব। তিনি যে তাহা দেখিয়াছেন, এটি আমার জীবনের আর একটি মহৎ সুখ।

কিছু দিন পরে "টাঙ্গনের ঘোড়া" বিদেশস্থিত পিতৃ ষ্টড্ হইতে দেশে আসিলেন। এক বিচিত্র অদ্ভুত জানোয়ার! অল্প জল খাবার দ্রব্যে তাঁহার উদর পূর্ণ হয় না। তিনি স্কুলে যাইবার সময়ে এক সের চিঁড়ে ভিজাইয়া রাখিয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহাতে এক কাঁদি কলা মাখিয়া খাইতেন। আমরা কোনও দিন তাহা ঘাঁটিয়া গোবর করিয়া রাখিতাম। তাঁহার পিতৃদেব এক এক পদাঘাতে তাঁহাকে বৈঠকখানার কেন্দ্রস্থল হইতে প্রাঙ্গনে ফেলিয়া দিতেন, এবং আমার পিতাকে এরূপে পুত্র-শিক্ষার আদর্শ দেখাইতেন। কিন্তু আমার করুণাময় পিতা তাহা শিখিতে পারিবেন কেন? এই জ্ঞানোদ্দীপক পদাঘাতপুঞ্জের এমনি মহিমা যে বেচারি জ্যামিতির and the শব্দ দ্বয়কে "এন দি" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে সারা রাত্রি কাটাইত। সেই "টাঙ্গনো ঘোড়া" আজি চট্টগ্রামের একটি বিখ্যাত মূর্খ।

অবস্থান্তর।

"See what a grace was seated on this brow :
Hyperion's curls ; the front of jove himself ;
An eye like mars to threaten and command ;
A station, like the herald mercury
New lighted on a heaven-kissing hill :
A combination and a form indeed,
Where every god did seem to set his seal."

আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে না উঠিতেই অদৃষ্টচক্র ঘুরিল। সুখ-সূর্য্য বহুদিন হইল মধ্যাহ্ন গগণ অতিক্রম করিয়াছিলেন ; এখন অপ্রতিহত গতিতে অস্তাচলাভিমুখে ছুটিলেন। এই আবর্ত্তনের প্রধান কারণ পিতার দানশীলতা এবং প্রশস্তহৃদয়তা। আমাদের বাসায় এত দরিদ্র ভদ্র সন্তান প্রতিপালিত হইতেন যে যখন ভৃত্যেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আহারান্তে বাসন পত্র ধুইতে যাইত, লোকে তাহাদিগকে পিতার "পল্টন" বলিত। আমি এক ছেলের সঙ্গে বহুতর আত্মীয় অনাত্মীয়ের ছেলেরা শিক্ষা লাভ করিত। পিতা কেবল তাহাদের প্রতিপালনের ও শিক্ষার ভার বহন করিতেন না, তাহাদের পরিবারবর্গেরও অনল্প সাহায্য করিতেন। এমন কি প্রার্থী মাত্রই প্রত্যাখ্যাত হইত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাতঃকালে কিরূপ ব্যবসায়ী মণ্ডলীর দ্বারা বৈঠকখানা সজ্জিত থাকিত। প্রত্যেক খাতায় প্রতিদিন কিছু না কিছু না উঠিয়া যাইত না। তদ্ভিন্ন একজন লোক প্রায় দোকানে চিঠি কাটিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। যে যাহা চাহিতেছে তাহারই জন্য দোকানে চিঠি যাইতেছে। শারদীয় পার্ব্বণ উপলক্ষে দেশীয় বিদেশীয় এত

লোকে "বার্ষিক" প্রদত্ত হইত যে প্রভাত হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত বাসা লোকারণ্য হইয়া থাকিত। সহরে এইরূপ।

আবার পূজার সময় পল্লিগ্রামস্থ বাড়ীর জন্য কাপড় ও খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া লইয়া কুলাইত না। এ জন্য একখানি কাপড়ের ও ময়রার দোকান বাড়ীতে উঠিয়া যাইত। পিতা দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুভঙ্গি দেহ, কাঞ্চন বর্ণ, সুগোল মুখ, সুন্দর নাসিকা, করুণাসিক্ত আয়ত লোচন, বিস্তৃত ললাট, তদুপরে কুঞ্চিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ, বিস্তৃত বক্ষঃ এবং ক্ষীণ কটি। যে দেখিত, সেই তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইত। আমি এমন সুন্দর দেব অবয়ব আর দেখি নাই। নিজে নিতান্ত সুখী ও সৌখিন ছিলেন। একরূপ পোষাক পরিয়া প্রায়ই দুদিন কাছারি যাইতেন না। আমার বড় কাকা পর্য্যন্ত বার চৌদ্দ টাকার কম মূল্যের ধুতি যোড়াটি পরিতেন না। প্রধান চাকরটি পর্য্যন্ত শাল ব্যবহার করিত, এবং প্রত্যেক দোকানে তাহার নামেও স্বতন্ত্র বাকী হিসাব ছিল। অন্য দিকে টাকা কখনও পিতা নিজের হাতে স্পর্শ করিতেন না। আয়ের ব্যয়ের হিসাব কখনও দেখিতেন না। সম্মুখ হইতে ভৃত্য টাকা উঠাইয়া লইয়া গেলে, একবার জিজ্ঞাসা করিতেন না—কত? ভৃত্য বলিল টাকা নাই। পারিষদ একজন যাইয়া পাঁচ ছয় টাকা মাসিক সুদে টাকা কৰ্জ্জ করিয়া আনিল। কিছু দিন পরে সুদ আসল একত্র করিয়া আবার নূতন তমসুক দেওয়া হইল। এরূপ দেখিতে দেখিতে শত সহস্র হইতে চলিল। এক পাপিষ্ঠ হইতে দুই শত টাকা মাত্র ধার করিয়া তাহাকে এগার শত টাকা দিয়াছিলেন, তথাপি সে তাঁহার মৃত্যুর পর ছয় শত টাকার ডিক্রী করিয়াছিল। এ দিকে দোকানদারেরা এক টাকার জায়গায় খাতায় দুই টাকা লিখিয়া রাখিতেছে। যদি তাহা লইয়া কোনও কৰ্ম্মচারী গোলযোগ উপস্থিত করিল, সে কাঁদিয়া পিতার কাছে

উপস্থিত হইল। পিতা হিতৈষী কর্ম্মচারীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"গরীব দুই পয়সা না পাইলে তাহার চলিবে কেন?"

এরূপে তিল তিল করিয়া অলক্ষিতে অদৃষ্টাকাশে মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল। ক্রমে উহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। পিতা তথাপি গ্রাহ্য করিলেন না। কেহ যদি অন্ততঃ সন্তানদের জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে বলিতেন, পিতা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"আমার পিতা আমাকে কিছু দিয়া গিয়াছিলেন না, আমিও আমার পুত্রকে কিছু দিয়া যাইব না। আমি আপন কলমের উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইয়া যাইব। পুত্রকেও তাহা করিতে হইবে।" ক্রমে অবস্থাকাশ আরও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাতা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে আমাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত সরলা ছিলেন। পিতা তাঁহাকে দুচারি কথায় প্রবোধ দিয়া রাখিতেন। শুধু তাহা নহে, বাড়ীর জন্য মাতাকে যে টাকা দেওয়া হইত, যদি পিতা টের পাইতেন যে, মাতা তাহা হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তবে তাহাও কোন প্রকারে বাহির করিয়া লইতেন। এক দিন মাতা বলিলেন—"আমাদের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে, মাথার চুল অপেক্ষা ঋণের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। সহরে যে এত লোক রহিয়াছে তাহাদিগকে এখন স্থানান্তরে যাইতে বল।" পিতা হাসিয়া বলিলেন—সে প্রসন্নতাপূর্ণ হাসি আমার স্মৃতিতে এখনও চিত্রিত রহিয়াছে,—"তুমি নির্ব্বোধ। তুমি জান না, আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেছি, ইহাদের ভাগ্যে পাইতেছি। যদি ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিই তবে আমি কিছুই পাইব না।" পিতা তখন উকিল।

তাঁহার দুইজন পিতৃব্য ভ্রাতার মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। ইঁহারা দুই জন সহোদর। তাঁহারা দুই জন উৎসন্ন যাইতেছেন।

জ্যেষ্ঠ আমাদের সমুদায় বংশ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তিনি আসিয়া পিতার আশ্রয় লইলেন। সমুদায় বংশ পিতার প্রতি খড়্গহস্ত হইল। কিন্তু পিতা পরিষ্কার বলিলেন—"আমি আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে পারিব না।" তখন ইঁহারা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার নীচাশয়তার দ্বারা পিতার অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জনৈক কর্ম্মচারী পিতার নামে জজের কাছে বহুতর "বেনামা দরখাস্ত" দেওয়ার পর, আর একখানি দরখাস্ত আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া দাখিল করিল, এবং অসংখ্য অভিযোগের প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হইল। পিতা তখন জজ আদালতের ক্ষমতাশালী সেরেস্তাদার। জজ তীব্র ভাবে তাহার তদন্ত করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মচারীর একটি পুত্র বহু দিন হইতে আমাদের বাসায় প্রতিপালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছিল। এক দিন কাছারি হইতে নিতান্ত চিন্তাকুল ও বিপদস্থ হইয়া পিতা ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার বহুতর বন্ধু তাঁহাকে তাহার পিতার দুষ্কৃতির জন্য এই বালকটিকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বারম্বার জেদ করিতে লাগিলেন। পিতা অন্যমনা হইয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন। বহুক্ষণ পরে একটুক ঈষৎ হাসিয়া ফর্‌সির নল রাখিয়া, সেই দরখাস্তকারীর নাম করিয়া বলিলেন,—"সে চাকর মাত্র। আপন মুনিবের আদেশ মত কার্য্য করিতেছে, অতএব তাহার প্রতি রাগ করা অন্যায়। বিশেষতঃ তাহার ছেলে আমার কোন্ অপরাধ করিয়াছে যে আমি তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিব?" বন্ধুগণ বিরক্ত হইয়া আর কিছু বলিলেন না। পিতা আমার যে দেবতা তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সেই অবস্থা, সেই বিপদ, এবং সেই প্রসন্নতাপূর্ণ মহাহৃদয়তা,—এরূপ, সহস্র দৃষ্টান্ত যখন আমার স্মরণ হয়, আমি এই স্বার্থপূর্ণ জগত হইতে উত্থিত হইয়া যেন কোনও পবিত্র রাজ্যে

উপস্থিত হই। এই স্মৃতিতে এত গৌরব যে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাহার স্থান হয় না। এই স্মৃতি আমার হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব অপরিসীম শক্তি সঞ্চার করে। আমি এই জীবনে যতবার ঘোরতর বিপদার্ণবে পতিত হইয়াছি, ততবার এই স্মৃতি একটি দেবমূর্ত্তি রূপে সেই ঝটিকা-বিদ্যুৎ বিপ্লাবিত আকাশমণ্ডল বিভাসিত করিয়া আমাকে বলিয়াছে—"তুমি তেমন পিতার পুত্র, তোমার ভয় নাই।"

পরহিতৈষিতা-বৃত্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, কাছারিতে কর্ম্মচারী-বর্গের মধ্যে কেহ কোনও দোষ করিলে পিতা নিজে তাহা মস্তক পাতিয়া লইতেন। তিনি জজের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া এরূপে সমস্ত কর্ম্মচারীবর্গকে বাঁচাইয়া চলিতেন। সময়ে সময়ে ইহার জন্য তিনি ঘোরতর বিপদস্থ হইতেন। আমার স্মরণ হইতেছে, আমি এক দিন কাছারিতে বেড়াইতে গিয়াছি। আমার প্রতি কর্ম্মচারীবর্গের আদরের সীমা নাই। জজের হেডক্লার্ক, আমাকে বলিলেন—"বাবু! আমরা সকলে তোমার পিতার গোলাম। আমাদের চর্ম্মের দ্বারা তাঁহার পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিলেও তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি তেমন পিতার উপযুক্ত পুত্র হইবে।" কথাগুলি আমি স্মৃতিতে মুদ্রিত করিয়া রাখিলাম।

অলৌকিক কার্য্য।

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

একে ত অবস্থার আকাশ সহজেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে বিধাতাও আবার সেই ঘনঘটা বাড়াইতে লাগিলেন। বলিয়াছি আমার জন্মের অব্যবহিত পরেই আমাদের গ্রামশুদ্ধ ভস্মীভূত হয়। তাহার পর আট দশ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত আট বার আমাদের বাড়ী এবং সহরের বাসা বাড়ী পুড়িয়া যায়। এক একবার এমনি হইত, বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে, সংবাদ শুনিয়া বাড়ী গিয়াছি, পর দিন বাড়ীতে শুনিলাম সহরের বাসা বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। অথচ উভয় স্থলে দৈবিক আগুন। আমাদের বংশে পাকা বাড়ী করিবার নিয়ম ছিল না। তাহার কারণ আদিপুরুষ শ্রীযুক্ত রায় দশভূজার পাকা মন্দিরে কাটা পড়িয়াছিলেন। তাহার পর যিনি পাকা বাড়ী করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার কোনও না কোন অমঙ্গল হওয়াতে, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছিল। অতএব সকলেরই মাটির ও বাঁশের ঘর। প্রথমবার অগ্নিতে অনেক পুরাতন, বহুমূল্য ও বহু কারুকার্য্যযুক্ত বাঁশের ঘর ধ্বংস হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য গল্প বলিব। আমার বয়স যখন অনুমান দশ বৎসর, তখন চট্টগ্রামে পশ্চিম অঞ্চল হইতে শঙ্করপুরি স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত হন। তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং ভক্তিভাজন। এমন প্রশান্ত, গম্ভীর, চিন্তাশীল, উন্নত মূর্ত্তি আমি দেখি নাই। আমি তাঁহার কাছে সন্ন্যাস নিয়মে কর্পূরা-লোকে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষিত হইলাম। তাহার পর এ অঞ্চলে তাঁহার

অনেক শিষ্য হইয়াছিল। এই সময় একবার আমাদের বাড়ী পুড়িয়া গেল। পুরি বাবাজি উপর্য্যুপরি এই অগ্নিকাণ্ডের কথা শুনিয়া আমাদের বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতা তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ঘরের ভিটিতে একটি আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হইল। পর দিন প্রাতে তিনি পিতাকে বলিলেন— আমি পিতার কাছে শুনিয়াছি—যে রাত্রিতে তাঁহার শরীরে কয়েক বার অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি এরূপ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে আমাদের বাড়ী কোনও অপদেবতার ক্রীড়াভূমি। তিনি সেই রাত্রিতে কি একটি পুরশ্চরণ করিলেন তাহা আমি জানি না। তিনি আমাকে মাতার কাছে শুইয়া থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং রাত্রিতে পুরস্ত্রী কেহ যেন একাকিনী গৃহের বাহিরে না যান নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আমার নিদ্রা। মাতা বাহিরে গিয়াছেন। নিদ্রিত বলিয়া আমাকে কি দাসীকে জাগান নাই। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জাগাইলেন। বলিলেন,— "তোমার বৈদ্য দাদা কি জন্য এত রাত্রিতে ছাদে গেলেন দেখিয়া আইস ত ?" ইনি তদানীন্তন চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রধান বিখ্যাত চিকিৎসক। সমুদায় গৃহ পুড়িয়া যাইয়া কেবল মাটির কোঠা ঘর মাত্র ছিল। আমি যাইয়া দেখিলাম কেহ কোথায় নাই। বাহিরে একটি আচ্ছাদনের নীচে পুরশ্চরণ হইতেছিল। আমি সেখানে যাইয়া বৈদ্য দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি এখন বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলেন ?" প্রশ্ন শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। মাতা অন্তঃসত্ত্বা। পুরি বাবাজি শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—"ভয় নাই। মাতা যেন আর একাকিনী বাহিরে না যান।" আমি ফিরিয়া আসিলাম; মাতা

পাছে ভয় পান বলিয়া বলিলাম,—"হাঁ, বৈদ্য দাদা আসিয়াছিলেন।" কিঞ্চিৎ পরে মাতা ব্যথা বোধ করিতে লাগিলেন। আমি পিতাকে সংবাদ দিতে গেলাম। পুরি বাবাজি ভীত হইলেন। তখন যজ্ঞ হইতেছিল। আমাকে অল্প ভস্ম দিলেন, এবং মাতাকে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। মাতা খাইলেন, এবং তাহার পর কই আর কোনও অসুখের কথা বলিলেন না। রাত্রিতে কি হইল আমি জানি না। পিতার কাছে পর দিন শুনিলাম যে পুরি বাবাজি আমাদের বাড়ীর চতুঃসীমা পরিক্রমণ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম কোণাতে বলিদানের পাঁঠাটি পুতিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন আর আমাদের বাড়ীতে অগ্ন্যোৎপাত ঘটিবে না। তাহার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমাদের কোনও কোন ঘরের চাল সংলগ্ন আত্মীয়দের ঘর দুই বার জ্বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমার নিজ বাড়ীর একটি তৃণও দগ্ধ হইয়াছিল না। কবিগুরু! তোমার কথাই যথার্থ। "স্বর্গে, মর্ত্ত্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা এখনও দর্শন শাস্ত্রের আয়ত্ত হয় নাই।"

যাহা হউক এতাবৎ কারণে আমাদের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে চলিল। পিতা সেরেস্তাদারী ত্যাগ করিয়া উকীল হইলেন। দেশ-শুদ্ধ লোক বলিতে লাগিল উকিলিতে তাঁহার উপার্জ্জনের সীমা থাকিবে না। ফলতঃ সেই লোকবাণী সত্য হইল। কিন্তু উকিলিতে যে পরিমাণ সময়ের আবশ্যক পিতার সে সময় কোথায়। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আহ্নিক করিতে বসিতেন। তাহা ৯টার পূর্ব্বে শেষ হইত না। বৈঠকখানা অর্থী প্রত্যর্থীতে লোকাকীর্ণ। কিন্তু দশ টার সময়ে কাছারিতে যাইতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবারও সময় হইল না। কাছারি হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া আবার পূজাতে বসিলেন। দীর্ঘপূজা

প্রদতে, সমাপন হইবে না বলিয়া কেবল আহ্নিক মাত্র করিতেন। এই পুজা রাত্রি তিন চারি টার সময়ে সমাপন হইত। কাযে কাযেই উকিলের পসার, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন হ্রাস হইতে চলিল। দুরবস্থাও দিন দিন সেই পরিমাণ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বাড়িতে লাগিল। পিতা অগত্যা মুন্সফী গ্রহণ করিলেন। দুই শত পঞ্চাশ টাকা বেতন সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ হইল। তাহাতে ঋণের সুদও কুলাইয়া উঠে না। একটি মাত্র আশা-সূত্র যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাও এ সময়ে ছিঁড়িয়া গেল।

সর্ব্বস্বান্ত।

বিষয়ে বীতরাগ আমাদের একটি পুরুষানুক্রমিক লক্ষণ। প্রপিতামহ শিশুবৎ সরল, সঙ্গীত ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। নেমক মহালের পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোনও নেমকহারাম দেওয়ানের জামিনিতে জমীদারি আবদ্ধ রাখিয়া প্রপিতামহ তাহার চাকরির সংস্থান করিয়া দেন। এ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের টাকা চুরি করিয়া পিট্টান দিয়া এই সকল উপকারের প্রতিদান করে। সরল প্রপিতামহ জনৈক চতুর ভ্রাতষ্পুত্রের চক্রান্তে জমীদারি জামিনের দায় হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় রাজস্বের জন্য নিলাম করাইয়া অন্য এক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নামে নিলাম খরিদ করেন। ভ্রাতষ্পুত্র তাঁহাকে মূল্যের টাকা আংশিক কর্জ্জ দিয়া একখানি একেরারের দ্বারা এই নিয়মে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত করেন যে তিনি তাহার অর্দ্ধেক উপস্বত্ব প্রপিতামহকে দিবেন, এবং বাকী অর্দ্ধেকের দ্বারা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া সমস্ত জমীদারি পিতামহকে ছাড়িয়া দিবেন। নানারূপ ছলনা করিয়া তাঁহার ঋণ বহু গুণ শোধ হইবার পরও তিনি জমীদারি প্রপিতামহ কি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে ছাড়িয়া দেন না। আমার পিতামহ ৺ ত্রিপুরা শরণ এক জন জন্মতঃ প্রতিভান্বিত শিল্পী ছিলেন। যদিও তিনি কখনও গৃহের বাহিরে যান নাই, তথাপি এমন কোনও শিল্প বিদ্যা নাই যাহাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। তিনি ঘড়ি, বন্দুক, কামন প্রস্তুত করিতেন, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টিমার পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া বাড়ীর সম্মুখে দীঘিতে চালাইতেন। তাঁহার হাতের দুই চারিটি জিনিস আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা ঠিক ইউরোপীয় শিল্পীর নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি বিষয় কার্য্যের ভাবনা দ্বারা তাঁহার শিল্প কার্য্যের ব্যাঘাত

করিতেন না। তাঁহার ভ্রাতাও দিন রাত্রি পূজা লইয়া থাকিতেন। যাহা হউক প্রপিতামহের ভ্রাতষ্পুত্রের মৃত্যু সময়ে বোধ হয় অনুতাপ উপস্থিত হয়। ইঁহাদের প্রতি আর অধর্ম্মাচরণ না করিয়া জমীদারি ছাড়িয়া দিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়া যান। তিনিও তাঁহার পিতার যোগ্য পুত্র। পিতামহকে ত জমীদারি ছাড়িয়াই দেন না, পিতা ক্ষমতাপন্ন হইয়া জমীদারি ফেরত চাহিলে, প্রথমতঃ অর্দ্ধেক মাত্র, যাহার উপস্বত্ব প্রপিতামহের সময় হইতে আমরা পাইতেছিলাম, ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। অবশেষে তিনি উক্ত অর্দ্ধেকের উপস্বত্ব দেওয়াও বন্ধ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মত বলিলেন :—

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।"

অতএব পিতা সেই নিলাম খরিদার হইতে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার মাতুল ভ্রাতার নামে বিনামা কবালা করিয়া লইয়া এই কবালা মূলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন পূর্ব্ব একেরার গোপন করিয়া একখানি জাল একেরার উপস্থিত করিয়া বলিলেন এই 'একেরার' মতে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতার ঋণ পরিশোধ না হওয়াতে সমস্ত জমীদারির তাঁহারা মালিক হইয়াছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে ঋণের পঁচিশ গুণ অর্দ্ধেক জমীদারি হইতে পাইয়াছিলেন! বিধাতার ধর্ম্মনীতি অলঙ্ঘনীয়। মানুষের কর্ম্মফল, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, অনিবার্য্য। এই জবাব দাখিল করিবার কিছু দিন পরে তিনি প্রকৃতই ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অন্ধ হইলেন, এবং তাঁহার দুই খানি জাহাজ ডুবিয়া, যে বাণিজ্যের দ্বারা তিনি উন্নত হইতেছিলেন, তাহাও হারাইলেন। তথাপি তিনি ধৃতরাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করিয়া চট্টগ্রামের এই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং বংশের এই সমুন্নত শাখার ধ্বংস সাধন করিলেন। তিনি বড় ফকিরভক্ত

ছিলেন"। কত ফকির এই যুদ্ধে সারথীত্বে বরিত হইলেন। তথাপি ত্রেতায় যাহা হইয়াছিল, একালেও তাহা হইল,—পাণ্ডবেরা জয়ী হইলেন। কিন্তু সে কালে আপিল আদালত ছিল না। কৌরবেরা আপিল করিতে পারিয়াছিল না। একালের কৌরবেরা হাইকোর্টে আপিল করিলেন। সেখানে যুদ্ধ প্রতিনিধির দ্বারা হইবে। তাঁহাদের এক প্রতিনিধি প্রেরিত হইল। সে কিছু টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া "বেগুণ বাড়ী" প্রাপ্ত হইল। তাহার পর দ্বিতীয় প্রতিনিধি কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইল। আবার ফকিরদের নমাজ, ব্রাহ্মণের স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। ধৃতরাষ্ট্রেরা ত্রেতায় অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। অতএব তাহাও হইল। কিন্তু তাহারা নারায়ণ দ্বারা বহুপ্রকার প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধিও এ কালে নারায়ণের পরিবর্ত্তে এক জুয়াচোরের হস্তে পড়িল! সে বুঝাইয়া দিল যে মুল্লুকের মালিক "লর্ড বিশপ।" বড় লাটই হউন, আর ছোট লাটই হউন, আর "হাইকোর্টের" জজই হউন, সকলকে তাঁহার অনুরোধ মস্তক পাতিয়া লইতে হয়। অতএব তাঁহাকে কিঞ্চিৎ "দক্ষিণা কাঞ্চন মূল্যং" দিতে হইবে, ও তাঁহার বাড়ীতে একটি ভোজ দিয়া তাঁহার দ্বারা জজদিগকে চট্টগ্রামের এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের জন্য অনুরোধ করাইতে হইবে। কৌরবদিগের মধ্যে আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। তিন সহস্র রজত মুদ্রা প্রেরিত হইল, এবং উত্তর আসিল কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিতা "স্বার্থ" এক শব্দ কি তাহা জানিতেন না। মোকদ্দমা প্রথম আদালতে জয়ী হইয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গলার একটি মোক্তারের হস্তে সম্যক ভার দিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্য কৌশলের মধ্যে একটি কৌশল এই হইয়াছিল যে, এই ব্যক্তিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন এবং মোক্তার

মহাশয় "বঙ্গ চন্দ্রের" ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অপলাপ করেন নাই। আপিলের বিচারের দিন কৌরব পক্ষে তদানীন্তন শীর্ষস্থানীয় কাউনসেল ডইন (Doyne) উপস্থিত ছিলেন; আর আমাদের পক্ষে মোক্তার মহাশয় একটি সদ্যপ্রসূত উকিল মাত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনিও মুখ খুলিয়াছিলেন কি না জানি না।

বিদ্যুতে সংবাদ বহন করিয়া আনিল। পিতৃব্য আমাকে ডাকিয়া তাহা পড়িতে দিলেন। সংবাদ—তাঁহারা মোকদ্দমা জয়ী হইয়াছেন। আমি বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পিতার কাছে সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি সন্ধ্যার সময়ে মহকুমা হইতে সহরে আসিলেন। আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কি এ জন্য দুঃখিত হইয়াছিস্? আমার কি এত কাল কোনও জমীদারি ছিল?" পিতার প্রশ্নে আমার হৃদয়ে নব স্ফূর্ত্তি সঞ্চারিত হইল। আমি দৃঢ় স্বরে বলিলাম—"না"। পিতা আমাকে বুকে লইয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। আমি যদি একটি রাজ্য হারাইতাম, তাহাও আমার কাছে সে সময়ে তুচ্ছ বোধ হইত।

পরে যখন প্রকাশ হইল আমাদের মোক্তার বিপক্ষের হস্তগত হইয়া কোনওরূপ তদ্বিরই করে নাই, পিতা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যে দুই জন দূত কলিকাতায় বিপক্ষ পক্ষে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়া সম্বন্ধে যাহারা প্রধান উদ্যোগী ছিল, তাহাদের নাম করিয়া বলিলেন—"তাহারা যদি এরূপ অন্যায় করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, ঈশ্বর তাহাদের ভিটিতে দূর্ব্বা গাছটিও রাখিবেন না।" এই ভীষণ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তাহাদের ভিটায় আজ দূর্ব্বা গাছটিও নাই।

"হাইকোর্ট" ও ইংরাজ রাজ্যে যেরূপ সুবিচার হইয়া থাকে সেইরূপই

করিয়াছিলেন। কয়েকটি অদ্ভুত তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিলাম খরিদার ব্রাহ্মণ, পিতামহ বৈদ্য, হাইকোর্ট স্থির করিলেন, নিলাম খরিদার তাঁহার কুটুম্ব! পিতামহ কোনও কালে নেমক মহলের ত্রিসীমার মধ্যে যান নাই। হাইকোর্ট স্থির করিলেন তিনি নেমক মহলের দারগা ছিলেন! এই অপূর্ব্ব বিচারের প্রতিকূলে বিলাত আপিলের ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র আবার নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। বিলাত আপিল বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া পিতা সম্মত হইয়া জমীদারির দুই আনা অংশ মাত্র লইলেন। বলিয়াছি ইতিপূর্ব্বেই শ্রীভগবান ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়ের বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অলজ্ঘ্য ধর্ম্মনীতি চক্রের আবর্ত্তনে পিতা অবশিষ্ট চৌদ্দ আনার মধ্যে নিজের অংশে যাহা পাইতেন, তাহার অধিক শ্রীভগবান আমাকে দিয়াছেন। সে কথা স্থানান্তরে বলিব।

আমার পিতা।

চাণক্য ঠাকুর বলিয়াছেন—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি
দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে
পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

পঞ্চম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত তাড়না,—তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমার উল্লিখিত পিতৃ-বন্ধু সর্ব্বদাই "সন্তান উৎপাদক" পিতাদিগকে শিক্ষা দিতেন। তিনি বৈঠকখানায় তাঁহার পুত্রদিগকে পদাঘাত করিতেন, আর পাদপদ্মে আঘাতের গুরুত্ব নিবন্ধনই হউক, আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি নিবন্ধনই হউক, তাহারা একেবারে উঠানে গিয়া চিত হইয়া পড়িয়া আকাশ সন্দর্শন করিত। তাহাদের অপরাধ দেবনাগর অক্ষরের রূপ দর্শন না করিতে করিতেই তাহারা "মুগ্ধ বোধের" ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছে না। কিন্তু আমার স্নেহময় পিতা এরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি শিখিবেন দূরে থাকুক, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিতেন। আমার পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে তিনি একটি ঘোরতর প্রতিবন্ধক ছিলেন। আমি পড়াশুনা করিতেছি কি না তাহা ত কখন জিজ্ঞাসাই করিতেন না, বরং তাঁহার পরিচিত কেহ যদি তাঁহাকে আসিয়া বলিত—ইঁহারা অনেকে আমার উৎপীড়নে অস্থির ছিলেন—যে "তোমার ছেলেটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল, তুমি একবার দৃক্‌পাতও কর না", পিতা সস্নেহ নেত্রে আমার দিকে দৃক্‌পাত করিয়া একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন—"পড়াশুনা না করেন কষ্ট পাইবেন, আমি কিছু রাখিয়া যাইব না।" পিতা ইহা অপেক্ষা গুরুতর তাড়না

জানিতেন না। রাত্রি জাগিয়া আমার পড়িবার সাধ্যই ছিল না। তিনি কিছুতেই তাহা দিতেন না। প্রত্যেক শনিবার আমার ঘোরতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। তিনি প্রত্যেক শনিবার বাড়ী যাইতেন। একে বাড়ীতে গেলে সোমবারের পড়া প্রস্তুত করিতে পারিতাম না; দ্বিতীয়তঃ সোমবার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে আমার স্কুল, তৎসঙ্গে এক দিনের "মার্ক" (mark) মারা যাইত। শনিবার স্কুল হইতে আসিয়া আমি জ্বর হইয়াছে বলিয়া চন্দ্রকুমারের বাসায় শুইয়া থাকিতাম। বাবা কাছারি হইতে আসিয়া লোকের উপর লোক পাঠাইতেন, অবশেষে স্বয়ং উপস্থিত হইতেন। আমি কত আপত্তি করিতাম, চন্দ্রকুমার কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু কিছুই মানিতেন না, আমাকে পাল্কিতে পুরিয়া দিতেন। তিনি চন্দ্রকুমারকে বলিতেন—"তোমার পিতা বিদেশে থাকেন বলিয়া তোমরা পিতৃ-স্নেহ কি বুঝিতে পার না। আমি তাহাকে বাড়ী না লইলে তাহার মা আমাকে কি বলিবে, এবং আমারই বা মনকে কি প্রকারে প্রবোধ দিব? আমি সোমবার সকালে সকালে আসিব।" একটি মাত্র ঘটনা বলিব। চট্টগ্রামে কাপড় ব্যবসায়ীরা মহা আড়ম্বরের সহিত সরস্বতী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। মা সরস্বতীর সঙ্গে তাহাদের কি সম্পর্ক আমি জানি না। কই, তিনি লোকের সর্ব্বনাশকারিণী প্রবঞ্চনা-ময়ী-খাতা-ধারিণী কাপড়ের বস্তাসনা, কিম্বা নিরেট নিরক্ষরতা ও নির্জলা মিথ্যাকথা প্রসবিনী বলিয়া ত তাঁহার ধ্যানে লেখে না। যাহা হউক কাপড় ব্যবসায়ী পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ তাঁহাকে বাই খেম্‌টা উপচারে পূজা করিয়া থাকেন। আজ এই উৎসবের মহাষ্টমী। আমার সম্প্রদায়ভুক্ত মহামহোপাধ্যায়গণের সিসৃধ্বনিতে নৈশ গগণ পরিপূরিত হইতেছে। তাঁহাদের সকলেরই আপাদ মস্তক বস্ত্রে

আসনে, কেবল পঙ্ক-চারিণী ইহুদীয় মহিলাগণের ন্যায় দুইটি নেত্র নীলোৎপল মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। তাহার কারণ, সকলেই উচ্চ পদবীস্থ ও চিহ্নিত লোকের সন্তান। ভয় পাছে ধরা পড়িলে টানিয়া লইয়া কেহ মজলিসে বসাইয়া দেয়। সেখানে গুরুজনের ছায়াতে, এবং সাধারণের দৃষ্টির অধীনে, শান্ত ভাবে বসিয়া হাইতোলা আমরা একটি গুরুতর দণ্ড বিবেচনা করিতাম। হায়! হায়! সেটুক পরাধীনতাও বালকের প্রাণে সহিত না। পিতা তখন স্থানান্তরে মুন্সেফ ছিলেন; আমার "চার্জ্জ" মাতুল মহাশয়ের হস্তে ছিল। উক্ত সিস্‌ধ্বনিতে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ এক বিকৃতি সঞ্চার করিল। তিনি আমাকে যাইতে দিলেন না। আমি সিসের দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করিলাম। সঙ্গীদিগের ট্রেণ চলিয়া গেল। আমি রাগে গর্ গর্ করিয়া শয়ন করিলাম এমন সময়ে পিতা আসিয়া পঁহুছিলেন। আমি নমস্কার করিতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই যে তামাসা দেখিতে না গিয় শুইয়া রহিয়াছিস?" আমি উত্তর দিলাম না। মাতুল মহাশয় বিপদে পড়িলেন। তিনি বলিলেন তিনি যাইতে দেন নাই। কিন্তু তিনি এরূপে আমার সচ্চরিত্রের রক্ষা করিতেছেন বলিয়া পিতা কোথায় তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন, না তাঁহাকে তিরস্কার করিয় আমাকে আপন হস্তে বিছানা হইতে তুলিয়া যাইতে জিদ করিলেন আমি তখন সজ্জিত হইয়া ছিন্ন-শিরস্ত্রাণ মাতুলের প্রতি একটি কটাক্ষ করিয়া নৈশ অন্ধকারে গা ঢালিয়া দিলাম। মাতুল মহাশয় বসিয় আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিতে লাগিলেন।

আর এক দিন। আমাদের অবস্থা দিন দিন বড় মন্দ হইতেছে পিতা ঋণ-জালে জড়িত হইতেছেন; অথচ সেইরূপ অবারিত দান অবারিত দয়া। তজ্জন্য তাঁহার মাতুল ভ্রাতা মহাশয় তাঁহাকে কা

তিরস্কার করিয়া আমাদের ব্যয়ের একটি কড়া হিসাব প্রস্তুত করিতেছেন অদৃষ্টের এমনি গতি আমার সেই পিতৃব্য তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ঋণে হারাইয়া পরোলোক গমন করিয়াছেন। হিসাব প্রস্তুত হইতেছে; সকল ব্যয় তাহাতে লিখিত হইতেছে। পিতা নীরবে চিন্তা ও বিষাদে মগ্ন হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গুড়গুড়ি টানিতেছেন। আমি বলিলাম— "কই, আমার খরচ ত ধরা হইল না?" পিতা একটুক কষ্টের হাসি হাসিলেন; দুইটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। আত্মীয় মহাশয় আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"যাও, বাবা। তুমি এখনও ছেলে মানুষ। তোমার খরচ কি আটকাইবে? তোমার খরচ আমি দিব।" কিন্তু এই তিরস্কার নিষ্প্রয়োজন ছিল। পিতার মুখ-ভঙ্গি দেখিয়া আমি যখন বুঝিলাম যে আমি তাঁহার কোমল পুষ্প-নিভ হৃদয়ে গুরুতর আঘাত করিয়াছি, আমার আপন হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে গুরুতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। আমি উঠিয়া গিয়া একটি বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমি পিতার মনে আর কখনও কোনও কষ্ট দিই নাই। সেই এক দিনের অনুতাপ এখন যাবৎ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। যদি এক দিন, এক মুহূর্ত্তেও, পিতাকে সুখী করিতে পারিতাম, তাহার কিঞ্চিৎ শান্তি হইত। পিতৃদেব! তখন বালকের মনে কি ঘোরতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহা দেখিলে— তুমি স্নেহময়,—তাহাকে নিশ্চয় ক্ষমা করিতে! বালক সেই যন্ত্রণা তোমাকে দেখাইতে পারিল না; তোমার ক্ষমা লাভ করিতে পারিল না। তোমার সেই মনকষ্ট তুমি তখনই ভুলিয়াছিলে; অবোধ বালক বলিয়া মনে মনে ক্ষমা করিয়াছিলে; কিন্তু বালকের সেই যন্ত্রণা আজীবন নিবিল না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

দেখিতে দেখিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল"। আমি "বিশ্ববিদ্যালয়কে" যমালয় বলিয়া জানি। "চেনসেলার" স্বয়ং যম; "রেজেষ্ট্রার" চিত্রগুপ্ত; "সিণ্ডিকেট" যমদূত সমিতি; পরীক্ষা "বৈতরণী"; এবং পরীক্ষকগণ গাভী। তাঁহাদের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া এই বৈতরণী পার হইতে হয়। তবে বিভিন্নতা এই, যমালয়ে যাইতে কেবল একটি মাত্র বৈতরণী পার হইতে হয়, আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করিতে তিনটি, এবং প্রবেশ করিয়া আরও তিনটি, বৈতরণী পার হইতে হয়।

—Could not one suffice ? Thy shaft flew thrice,
and thriçe my peace was slain."

অষ্টম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া আর দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কেবল পরীক্ষা। যমালয় যাইতে হইলে একবার মরিতে হয়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে, এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় প্রতি বৎসর একবার মরিতে হয়। আমি অনেকবার ভাবিয়াছি অপগণ্ড কোমলপ্রাণ শিশুর উপর এই অত্যাচার কেন? নিম্নশ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর পরীক্ষা না করিলে যে কি গুরুতর পাপ হয় তাহা ত আমি বুঝি না। প্রত্যহ পড়া লইয়া প্রত্যেক বিষয়ে নম্বর দিলেই ত বৎসরের শেষে ছাত্রের কৃতিত্ব বুঝা যায়, এবং শিক্ষকদেরও তাহা অবিদিত নাই। প্রবেশিকার পর আবার একটি "আর্ট" কেন? একেবারে "বি এ" পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী হতভাগাদিগকে যাইতে দিলে কি ক্ষতি? ইহাতে "বৃষোৎসর্গের" কোন্ অঙ্গ হানি হয়? উপর্য্যুপরি এই পরীক্ষা-রূপ খেলাবাতে দ্বাদশ বার মরিয়া মরিয়া

যখন হতভাগ্যগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কবল হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন তাহারা প্রাণহীন, উদ্যমহীন, রোগ-জর্জ্জরিত কঙ্কালবিশেষ। এরূপ কঙ্কালে বঙ্গদেশ পরিপূরিত হইতেছে। আমার মতে "মেলিরিয়া" অপেক্ষাও এই "বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যাধি" বঙ্গদেশের অধিক সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে। জানি না "বিশ্ববিদ্যালয়" বেদিতে এই অপগণ্ড শিশু বলিদান আর কত কাল চলিবে!

একে ত এক এক পরীক্ষাতে প্রাণান্ত, তাহাতে আবার সঙ্গে সঙ্গে একটি "নির্ব্বাচনী" পরীক্ষা। একেবারে পরীক্ষা-হাড়িকাঠে লইয়া গ্রীবা নিক্ষেপ কর,—না, তাহা হইবে না। শিক্ষক কসাইরা তাহার পূর্ব্বে একবার "জবাই" করিয়া অর্দ্ধেক রক্ত শুষিয়া লইবেন। যাহা হউক আমার এই "নির্ব্বাচনী" পরীক্ষা উপস্থিত। বৎসরের প্রথম ছয় মাস আমাদের একজন বেশ উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীও এমন সুন্দর ছিল যে যদিও তিনি বহু পরিশ্রম করাইতেন, তথাপি আমরা তাহা অনুভব করিতাম না। তিনি স্থানান্তরিত হইলেন; অশ্রুপূর্ণ-লোচনে আমাদের কাছে বিদায় হইয়া গেলেন। আমিও বিদ্যালয় হইতে এক প্রকার বিদায় লইলাম। অবশিষ্ট ছয় মাস তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তীর মূর্ত্তি আমি প্রায় দেখি নাই। মিথ্যা কথা কেন বলিব—দেখিয়াছিলাম। কারণ যেটুক সময় ক্লাশে থাকিতাম, আমি "শ্লেটে" তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি আঁকিতাম। সেই খর্ব্বাকৃতি, চতুষ্কোণ মুখচন্দ্র, স্ফীত মহোদর, তাহাতে স্থানে স্থানে বামকরে করাঘাত,—মূর্ত্তিখানি আমার কাছে একটি রহস্যের ভাণ্ডার বলিয়া বোধ হইত। তিনি লোক অনুপযুক্ত ছিলেন না,—অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তবে মনের ভাব বিশদরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিছু জিজ্ঞাসা

করিলে "গুচ্ গুচ্" (goose goose) করিয়া খর্ব্ব বাম হস্তে উদরাঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন।

পড়াশুনা না করিবার আর এক কারণ ছিল। পিতা বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এ বৎসর আমার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। তাঁহার ভয় পাছে পাশ হইয়া বিদেশে পড়িতে যাই। নির্ব্বাচনী পরীক্ষা নিকট হইলে আমি শিক্ষক মহাশয়কে কবুল জবাব দিলাম যে আমি পরীক্ষা দিব না। তিনি আমাকে কঠোর কণ্ঠে গুচ্ গুচ্ করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন তিনি ভাবিলেন আমি আলস্যপরতন্ত্র হইয়া অসম্মত হইতেছি। শেষে বলিলাম পিতা নিষেধ করিয়াছেন। তিনি একেবারে পিতার কাছে উপস্থিত হইলেন, এবং "ধন্না" দিয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন, যে তিন জন ছাত্র নিম্নতম শ্রেণী হইতে পারিতোষিক পাইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে আমি একজন। বোধ হয় এজন্য আমার উপর তাঁহার কিঞ্চিৎ আশা ছিল। পিতা ঘোরতর আপত্তি করিলেন: অবশেষে তিনি যখন বুঝাইয়া দিলেন যে আমাকে বিদেশে যাইতে দেওয়া না দেওয়া পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, তখন পিতা বলিলেন—"আচ্ছা পরীক্ষা দিক, কিন্তু বিদেশে যাইতে পারিবে না।"

"নির্ব্বাচনী" পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বলিতে হইবে না যে আমি কি পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিলাম। তাহাতে আমাদের তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় আমার রন্ধ্রগত শনি হইলেন। ইনি একজন তরুণবয়স্ক যুবক; শিক্ষকদিগের মধ্যে "নেপোলিয়ান বোনাপার্টি"; ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার মত বিদ্বান পৃথিবীতে কেহ পদার্পণ করে নাই। তিনি "কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাস।" বক্তৃতায় স্বয়ং "ডিমসথেনিস্।" প্রতি শনিবার আমাদের একটি

সভা হইল। যদিও চাটগেঁয়ে কথা বাঙ্গালাই নহে, তথাপি আমি আশৈশব পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার ঘোরতর বিদ্বেষী ছিলাম। তিনি আসল পীঠস্থান শ্রীপাট বিক্রমপুরের লোক; অধরোষ্ঠ আকণ্ঠ আকর্ষণ করিয়া, এবং প্রত্যেক কথায় সপ্তস্বর প্রয়োগপূর্ব্বক উদারা হইতে মূদারা পর্য্যন্ত টানিয়া আমাদিগের উপর বিক্রমপুরী রসিকতা বর্ষণ করিতেন। আমি সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র অভিমুন্যের মত সুদ সমেত প্রতিঘাত করিতাম বলিয়া, তিনি দু চক্ষে আমাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি শিক্ষকদিগকে বলিলেন যে আমি একজন "পাকা নকল নবিশ।" অতএব আমার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খোঁড়া পণ্ডিত মহাশয় এই সংগ্রামে তাঁহার লেফ্‌টেনেণ্ট হইলেন। তিনিও পূর্ব্ববঙ্গবাসী,—প্রধান শিক্ষক সকলই আই। তাঁহার সানুনাসিক উচ্চারণের আমি কিঞ্চিৎ নকল করিতাম বলিয়া, আধুনিক "পাইওনিয়ারের" মত তিনিও এই নকল নবিশির উপর বড় বিরক্ত ছিলেন। আমার সম্মুখে, বেঞ্চের অপর দিকে একখানি চেয়ার রক্ষিত হইল, এবং উভয়ে পালা করিয়া সেখানে বসিতে লাগিলেন। আমার তাহাতে আমোদ বাড়িল। আমরা দুই তিন জন পরামর্শ করিয়া বন্দুকের ছড়্‌রা পকেটে করিয়া লইতাম, এবং তাহা কাগজে পুরিয়া পরীক্ষা-কক্ষের সীমা হইতে সীমান্তরে নিক্ষেপ করিতাম। তৃতীয় শিক্ষক এবং পণ্ডিত মহাশয় মনে করিলেন একে অন্যের কাছে এরূপে প্রশ্নের উত্তর চাহিতেছে, এবং সেই গুলি লুফিতে লাগিলেন। কিছু কাল এরূপ নৃত্যের পর আর একবার আর একটি গুলি পণ্ডিত মহাশয় লুফিতে যাইতেছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ পাদেকের খর্ব্বতা নিবন্ধন পড়িয়া গেলেন। হাস্যধ্বনিতে পরীক্ষাগৃহ নিনাদিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় পরাজয় স্বীকার করিয়া সে অবধি রণে ভঙ্গ দিলেন।

কিন্তু তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় ছাড়িবার লোক নহেন। এক দিন বড় জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। আমি কি উত্তর লিখিতেছি তিনি তাহা বেঞ্চের অপর দিকে আমার সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গিয়া রসিকতা করিতেছেন। আর একবার এরূপে গলা বাড়াইয়া পড়িতেছেন, আমি ঘাড় হেট করিয়া লিখিতেছি। আমার দক্ষিণ চরণ দেখিলেন বড় সুযোগ। তিনি শিক্ষক মহাশয়ের উদরদেশে আশি সিক্কা ওজনের একটি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। উদরস্থ বিক্রমপুরী রসিকতা রাশি দারুণ যন্ত্রণায় তোলপাড় করিয়া উঠিলে, তিনি যেমন উঠিলেন, আমি অমনি গলবস্ত্র হইয়া বলিলাম—"beg your pardon sir"; আমি পা নাড়িতেছিলাম, "(sir)" সার যে এত নিকটে তাহা আমি জানিতাম না।" আর বাক্য ব্যয় না করিয়া,—বোধ হয় করিবার শক্তিও ছিল না,—"সার" একেবারে পেটে হস্ত দিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। পর দিন রথ (চেয়ার) খানিও স্থানান্তরিত হইল।

প্রবেশিকা বিভীষিকা।

নির্ব্বাচনী পরীক্ষা শেষ হইল। আমি কোন বিষয়ে পূর্ণচন্দ্র, কোন বিষয়ে বা তাহার কলাংশ প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও হেডমাষ্টার মহাশয়ের ভক্তি টলিল না। তিনি আমাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার হাড়িকাঠে নিক্ষেপ করিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু পিতা তাহাতে সম্মত হইবেন কেন? শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে আবার অনেক বুঝাইলেন। অবশেষে পিতা শিক্ষক মহাশয়কে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি আমাকে কলেজে যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দিবেন না। শিক্ষক মহাশয় প্রতিশ্রুত হইলেন এবং আমাকে বলিদানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া রাখিলেন।

জানিতাম পিতা পরীক্ষা দিতে দিবেন না। আমি সম্বৎসর যাবৎ কিছুই পড়ি নাই। এমন কি বড় একখানি শিক্ষক মহাশয়ের মুখচন্দ্র পর্য্যন্তও দেখি নাই। যদি কদাচিৎ দেখিয়াছি, তবে ক্লাসে বসিয়া তাঁহার ছবি আঁকিয়াছি। সম্মুখে শারদীয় দীর্ঘ অবসর। পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া তাহার ত অপব্যয় করা যাইতে পারে না। শুভ দশমী প্রভাতে একবার পাঠ্য পুস্তক সকলের সঙ্গে সম্ভাষণ করিলাম। তাঁহাদের প্রায় অস্পৃষ্ট নূতনত্বে নয়ন জুড়াইয়া গেল। অবশিষ্ট অবসরকাল পাখী মারিয়া, দীঘি সাঁতারাইয়া, এবং এই প্রকার নানাবিধ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে অতিবাহিত করিলাম। স্কুল খুলিল; পরীক্ষায় ছ মাস মাত্র বাকী। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হইল না। একে ত সময় অল্প; তাহাতে পিতার দৃঢ় আদেশ যেন রাত্রি জাগিয়া না পড়ি। সমস্ত দিন মুখস্থ করিতাম। সন্ধ্যার পর আহার করিয়া শয়ন করিতাম। পিতা সমস্ত রাত্রি পূজা করিতেন, পূজা

করিতে যাইবার সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ঘুমাইতাম। তিনি পূজায় বসিলে আমি আবার মুখস্থ আরম্ভ করিতাম। রাত্রি ৪ টার সময়ে পিতা যখন পূজান্তে ভক্তিপূর্ণ গীতধ্বনিতে নীরব গৃহ প্লাবিত করিতেন, আমি দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শুইতাম। পিতা আহার করিতে যাইবার সময়ে আমার মাথায় জপ করিয়া শির চুম্বন করিয়া যাইতেন। মনে করিতেন আমার ঘোর নিদ্রা। তিনি আহারান্তে শয়ন করিবামাত্র, ফর্‌সির শব্দ বন্ধ হইলে আমি আবার মুখস্থ কার্য্য আরম্ভ করিতাম। মুখস্থ, মুখস্থ, দিবা রাত্রি মুখস্থ! বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজমন্ত্র—"মুখস্থ।" ইহাতে যথোচিত দীক্ষিত হইয়া পরীক্ষা গৃহে উপস্থিত হইলাম। আমি, চন্দ্রকুমার, এবং জগবন্ধু—আমাদের তিন জনের স্থান বিশাল কক্ষের তিন বিপরীত কোণায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলিতে হইবে না এই বন্দোবস্ত পণ্ডিত এবং তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের statesmanship কৌশলনীতি। পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যেও আমি তাঁহাদিগকে লইয়া কিঞ্চিৎ আমোদ করিতাম। কখনও বা সন্দিগ্ধ ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিতাম, আর তাঁহারা উভয়ে তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিয়া আমার 'খানা তালাশি' করিতেন। মেজ পরীক্ষা করিতেন, কখন বা অঙ্গ টিপিতে ক্রটি করিতেন না। কখনও বা আমি জগবন্ধুর দিকে চাহিয়া হাসিতাম, কাশিতাম,—তাঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিতেন, এবং আমাদিগকে এই অশিষ্টাচারের জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ওই হাসিতে কাশিতে আমরা কোনও প্রশ্নের উত্তর বলা কহা করিতেছি। মিথ্যা কথা বলিব না; হাসি কাশি নহে; একদিন অঙ্গুলি সঙ্কেতে জগবন্ধু হইতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ জানিয়া লইয়াছিলাম। তাঁহারা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু—"সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা,

কেমনে বুঝিব নর বানরের কথা।" কিছুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। তবে পরীক্ষাগৃহে ঐরূপ করসঞ্চালনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা পরীক্ষার দিন আমাকে এবং জগবন্ধুকে রসিকতা করিয়া বলিলেন—"আমাগোরে দিলা না কেন্? আমরা শুদ্ধ কর‍্যা লেখ্যা দিতাম।" জগবন্ধু কিছু রোখাল ছিল। ইহার আশি সিক্কা হিসাবে একটা উত্তর দিল।

--০-

প্রথম অনুরাগ।

"শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল।
বচণক চাতুরী লহু লহু ভাষ।
ধরণীতে চাঁদ ভেলত পরকাশ।"

প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইল। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। শেষ দিন যখন পরীক্ষার গৃহ হইতে বাহির হইলাম, বোধ হইল হৃদয়ে যেন একটি নবীন উৎসাহ, শরীরে যেন একটি নবীন জীবন সঞ্চারিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা যখন মনে করি তখন আমার আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। বলিদান। অজ শিশুগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া আনিল। পরীক্ষার ফিশ দাখিল হইল। ছাগল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বালক অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি জাগিয়া চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল। ছাগলের ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা এবং গলায় বিল্বপত্রের মালা অর্পিত হইল,—বালকের "নমিনেশন রোল" পঁহুছিল। ছাগল তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে হাড়িকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইল,—বালক কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষা গৃহে দাখিল হইল। তাহার পর উভয়ের বলিদান। তারতম্যের মধ্যে এই—ছাগল তখনই মরে, সকল যন্ত্রণা শেষ হয়। বালক যাবজ্জীবনের জন্য আধমরা হইয়া থাকে, তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ মাত্র হয়।

যাহা হউক বলিয়াছি প্রবেশিকা শেষ হইল; শরীরে নবীন জীবন, নবীন উৎসাহ প্রবেশ করিল; প্রকৃতি নবীন সৌন্দর্য্যে হাসিল। হৃদয় হইতে কি একটি পাহাড় নামিয়া গিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নানা আনন্দে আমরা দলে দলে গিরি শৃঙ্গের

উপত্যকায় এবং নির্ঝরের ধারে বেড়াইতে লাগিলাম। কখন কখন প্রশ্নের কাগজ খুলিয়া যে যে প্রকার উত্তর দিয়াছি সেরূপ নম্বর ধরিতাম, কিন্তু কিছুতেই "পাশ মার্ক" কুলাইয়া উঠিত না।

বিদ্যুৎ আমার কোনও দুর আত্মীয়ার কন্যা। তাহার ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে পড়িত। দিনরাত্রি আমরা প্রায় এক সঙ্গে পড়িতাম, খেলিতাম; কখন কখন ঝগড়া করিতাম। বিদ্যুৎ তখন ক্ষুদ্র বালিকা—চঞ্চলা, মুখরা, হাস্যময়ী। বিধাতার হস্তের একটি অপরূপ একমেটে প্রতিমা। যখন সে তাহার নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত অলকারাশি দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া যাইত দেখিতাম, তখন সে শত ত্যক্ত করিয়া গেলেও তাহাকে মারিতে ইচ্ছা হইত না। সেও আমাদিগকে বিরক্ত করাটি একরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভ্রাতা আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান। যখন বিদ্যুৎ সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা, সে একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভাবী সংসার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তদবধি আমি আর তাহার গৃহে বড় একটা যাইতাম না; গেলে মনে কি যেন দুঃখ, হৃদয়ে কি যেন এক অভাব, বোধ হইত। চারি কি পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এক দিন বিদ্যুতের মাতা আমাকে ডাকিলেন। আমি অপরাহ্ণে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছি, পাশে ও কে ধীরে ধীরে কোমল পদবিক্ষেপে আসিয়া বসিল? বিদ্যুৎ! কি চমৎকার পরিবর্ত্তন! যে বালিকা ছুটিয়া, বাতাসে কুন্তলের কুঞ্চিত অলকাবলি এবং অঞ্চল উড়াইয়া ভিন্ন চলিতে পারিত না, সে আজি ধীরে ধীরে কোমল পাদক্ষেপে,—পায়ের নীচে ফুলটি পড়িলেও নমিত হইত না,—এরূপ অলক্ষিত ভাবে আসিয়া বসিল। যাহার হাসি ও কণ্ঠ বাঁশীর মত অনবরত বাজিত, আজি তাহার সে

তরঙ্গায়িত অধরবিপ্লাবী হাসি কমলা ত অধরপ্রান্তে বিলীনপ্রায় হইয়া কি এক অস্ফুট ভাব ও শোভা বিকাশ করিতেছিল। কণ্ঠ নীরব। যে কখনও গলা জড়াইয়া ধরিয়া অংশে উরসে ভিন্ন বসিত না, কি আশ্চর্য্য আজি তাহার সঙ্গে চোকে চোকে দেখা হইলে সে চোক নামাইয়া লইতেছে; আমি অন্য কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে, সে তাহার কমলদলায়ত দুই ভাসা চক্ষু আমার মুখের দিকে স্থির ভাবে স্থাপিত করিয়া অতৃপ্তভাবে চাহিতেছে। কি দৃষ্টি! কি অর্থ! কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে কলকণ্ঠে কাকলি বর্ষণ না করিয়া থামিত না, সে আজি ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তরে অধোমুখে চাহিতেছে।

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মে বচোভিঃ।
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখী সা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ।"

শকুন্তলা!

আমারও হৃদয়ে কি একটি ভাবের উদয় হইতেছিল আমি বড় বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমারও সেই মুখখানি বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল, অথচ নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারিতেছিলাম না। কে যেন চোক ফিরাইয়া দিতেছিল। চোকে চোকে দেখা হইলে কি যেন একটি কোমল কুসুম-স্পর্শ-মৃদু-মধুর আঘাত হৃদয়ে পঁহুছিতেছিল। সেখান হইতে যে উঠিতে পারিতেছিলাম না সে কথা আর বলিতে হইবে না। বসিতে বসিতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ রাত্রি হইল। অবশেষে উঠিলাম; আত্মহারাবৎ চলিয়া যাইতেছিলাম, অন্ধকারে বারণ্ডা পার হইতে বক্ষে কি লাগিল? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার সে কুসুমস্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল—আহা! কি স্পর্শ!

বুঝিলাম আমার বুকে মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ। অজ্ঞাতে আমার দুই ভুজ তাহাকে আরও বুকে টানিয়া ধরিল। আমার সমস্ত শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আপ্লুত হইয়া নিশ্চল হইল! বালিকা আমার করে একটি গোলাপ ফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে গুরু ঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে ঊর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইলাম। গুরুমহাশয় আমাকে যথাশাস্ত্র বুঝাইয়া দিলেন যে বিদ্যুতের সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারিবে না। অতএব সেখানে আর যাইতে আমাকে নিষেধ করিলেন।

কলিকাতা যাত্রা।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইল। তাহাতে আমি বিস্মিত; দেশশুদ্ধ লোক তটস্থ হইল। যে ছেলের জেঠামিতে এবং দুর্বৃত্তিতে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিত হইতে পারিত, সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইল, কথাটি কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তিও সাধারণ প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করিত। চন্দ্রকুমার এবং জগবন্ধুও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিল। পিতা শুনিয়া একটুক হাসিলেন, পরক্ষণে অশ্রুপাত করিলেন। হাসিলেন আমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছি। কাঁদিলেন, পাছে আমি বিদেশে পড়িতে যাইতে চাহি। তাহার পর যখন শুনিলেন যে আমি বড় রাত্রি জাগিয়া পরিশ্রম করিয়াছিলাম, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিলেন। যদি কেহ আমাকে কলেজে পড়িতে পাঠাইবার কথার উল্লেখ মাত্র করিত, বাবা তাহাকেও ন ভূত ন ভবিষ্যতি তিরস্কার করিতেন। ঐ হৃদয়ের তুলনা কি জগতে আছে?

একে ত পিতার হৃদয়ের ভাব এরূপ, তাহাতে আবার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র মহাশয় কুট সাংসারিক যুক্তির দ্বারা তাহা দৃঢ়তর করিতে ব্রতী হইলেন। তিনি পিতাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে পিতার অবস্থা মন্দ, তিনি তাহার উপর আবার আমার কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিবেন। অপিচ যদি আমি ২০ টাকারও একটি চাকরি করি, তবে তাহা বৎসরে ২৪০, দশ বৎসরে ২৪০০ হইবে। তাহাতে পিতার অমোঘ সাহায্য হইবে। তাঁহার এই যুক্তির কারণ তিনি এক দিন খুলিয়া বলিয়াছিলেন। আমার কালেজে অধ্যয়ন কালে পিতা ঋণে জড়িত হইয়াছেন। পিতৃব্য তাঁহার পিতার ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে সম্পত্তি

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পিতা তাহা তাঁহার কাছে আমার বন্ধক রাখিতেছেন। পিতৃব্য মহাশয় বন্ধকনামার লেখা লইয়া বড় কচকচি এবং মুনসিয়ানা আরম্ভ করিয়াছেন। পিতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন এত বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। তখন পিতৃব্য মহাশয় অকাতরে বলিলেন—"তোমার সঙ্গে আমি মোকদ্দমা করিয়া জিতিয়াছি। তোমার পুত্র যেরূপ উপযুক্ত হইতেছে, আমি যদি লেখায় আঁটাআঁটি করিয়া না যাই, আমার পুত্র তাহার সঙ্গে পারিবে কেন?" আমি কাছে বসিয়াছিলাম, দেখিলাম পিতার মুখ মলিন হইল। তিনি গভীর মনোকষ্টে নীরব হইয়া রহিলেন। তবে পিতৃব্য মহাশয় অন্ধ।

যাহা হউক, পিতা সেই ২০ টাকার যুক্তির মাহাত্ম্য বড় একটা বুঝিলেন না। যে শত ২০ টাকা প্রত্যেক মাসে অকাতরে দান করিয়াছে, তাহার তাহা না বুঝিবারই কথা। তবে তাঁহার একমাত্র আপত্তি—আমাকে বিদেশে পাঠাইতে হইবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রকুমারের পিতা সে সময় দেশে আসিলেন। তাঁহার উপর্য্যুপরি ভর্ৎসনায় পিতা অগত্যা আমাকে কলিকাতা পাঠাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহার পর আমি যত দিন দেশে ছিলাম আমার পিতার অশ্রুজল থামিল না। মাতা আমার এরূপ সরলা ছিলেন যে তিনি ১ হইতে ১০ পর্য্যন্তও গণিতে পারিতেন না। পরীক্ষা, ছাত্রবৃত্তি, কলেজ, তিনি এ সকল কথা বুঝিবেন দূরে থাকুক, উচ্চারণও করিতে পারিতেন না। অতএব তিনি এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। যখন কলিকাতা যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল, তখন মা বুঝিলেন যে বিষয়টা কি। তখন পিতার অশ্রুস্রোতে তাঁহার অশ্রুস্রোতও যোগ দিল। আমি ভাগ্যবান এই পবিত্রা স্বর্গ-সম্ভূতা গঙ্গা যমুনার সম্মিলিত স্রোতে পবিত্র হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। শুধু এবার বলিয়া নহে, আমি কলেজের

অবসর সময় যখনই বাড়ী আসিতাম, ফিরিবার সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সম্মুখীন হইতাম না। আমাকে দেখিলেই নীরবে তাঁহাদের অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকিত। যখনই স্মরণ হয়, আমার বোধ হয় যেন সেই পবিত্র অশ্রুধারা এখনও তাঁহাদের মুখ বাহিয়া আমার মস্তকে ও মুখে পড়িতেছে। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে কি তাহার এক বিন্দুরও প্রতিদান করিতে বিধাতা আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলেন না ?

বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত। ঘনকৃষ্ণ বাষ্পরাশি স্তম্ভাকারে বাষ্পপ্রণালী হইতে গগণপথে উত্থিত হইতেছে। পিতা আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও সেই স্নেহস্বর্গে মুখ লুকাইয়া বালকের কোমলপ্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দৃশ্যে জাহাজের শ্বেত কর্ম্মচারী-গণের পর্য্যন্ত চক্ষু ভিজিয়া আসিল। জাহাজ খুলিতেছে। চন্দ্রকুমারের পিতা আমাকে বলপূর্ব্বক সরাইয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তুমি নবীনের মা না বাপ ?" পিতা আমার উভয়।

জাহাজ খুলিল। আমি সপ্তদশ বৎসর বয়সে বিদেশ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। জীবন-কাব্যের তৃতীয় অধ্যায় খুলিল।

কলিকাতা।

জাহাজ খুলিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রে পড়িল। দেখিতে দেখিতে জন্মভূমি সাগরপ্রান্তে চিত্রবৎ ভাসিতে লাগিল। কালেজের অবসর সময়ে একবার বাড়ী আসিতে এই দৃশ্যটি তখনকার একটি কবিতায় এরূপ চিত্র করিয়াছিলাম স্মরণ হয় ;—

"দেখিলাম ওই মোহন শ্যামল মূরতি,—
সজ্জ পল্লব-বসনে,
সুন্দর অচল ব্যূহ, ধবল কিরীটী সহ,
দেখিতেছে মুখ-কান্তি সাগর-দর্পণে।
ভাবিনু মা বুঝি করি উন্নত বদন,
দেখিছেন আসে কিনা দীন বাছাধন।"

দেখিতে দেখিতে সেই সৌধশীর্ষ-গিরিমালা-সজ্জিত-চিত্র সমুদ্র প্রান্তে মিশাইয়া গেল। তখন কেবল অনন্ত সমুদ্র! আকাশ বিশাল নীল কটাহের মত সমুদ্র ঢাকিয়া রহিয়াছে। সমুদ্র প্রথম সমলশ্বেত, ক্রমে পীত, ক্রমে নীল, ক্রমে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। তখন কেবল উপরে সেই নীল আকাশ, নীচে সেই ঘননীল পারাবার। সেই অমল নীল বক্ষঃ কাটিয়া, সেই নীলিমায় অমলশ্বেতপুষ্পনিভ ফেনরাশি বিকীর্ণ করিয়া, গর্ব্বভরে আমাদের জাহাজ চলিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য সেই সিন্ধুগর্ভ হইতে উঠিতেছে, আবার সেই সিন্ধুগর্ভে ডুবিতেছে। যখন প্রথম এই অনন্তের মুখ দেখিলাম, তখন হৃদয়ে কি এক গভীর ভাব উদয় হইল, তাহাতে কি এক নূতন জগত খুলিয়া গেল! যে সমুদ্র দেখে নাই; ইহাতে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখে নাই; সূর্য্যকিরণতলে

ইহার উচ্ছ্বাসপূর্ণ লহরীমালার গম্ভীরত্ব, এবং ফুল্ল চন্দ্রকরে ইহার অনন্ত হাস্য দেখে নাই; যে ইহার শান্ত এবং ঝটিকাবিলোড়িত সৃষ্টিসংহারকারী মূর্ত্তি দেখে নাই; তাহার মানব-জন্ম বৃথা।

দুই দিন এই অনন্তের কোলে ভাসিয়া আমি এবং চন্দ্রকুমার তৃতীয় দিন গোধূলি সময়ে কলিকাতায় পঁহুছিলাম। আমাদের পূর্ব্বে কলিকাতায় চট্টগ্রামের কেহ কখনও বিদ্যার অন্বেষণে যায় নাই। অতএব কলিকাতা এ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে এক প্রকার অনাবিষ্কৃত দেশ। চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাভাজন সব্ জজ হরগৌরী বাবু পিতার পরম বন্ধু। তাঁহার একটি আত্মীয় আমাদিগের পাণ্ডা। কলিকাতার পর্ব্বতাকৃতি জাহাজের বিশাল অরণ্য ভেদ করিয়া আমাদের জাহাজ শেষে ঘন ঘর্ঘর শব্দে ভাগীরথী-বক্ষঃ শব্দায়িত করিয়া থামিল। পাণ্ডা মহাশয় আমাদিগকে গঙ্গাতীরে একটি কাষ্ঠ ও খড় নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহে লইয়া দাখিল করিলেন। পাণ্ডা মহাশয় আমাদিগকে কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক 'রূপ কথা' বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গৃহে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কাষ্ঠরাশিতে, এবং অননুভূতপূর্ব্ব সৌরভে, তাঁহার গল্পের উপর আমাদের বড় অবিশ্বাস হইল। এই কি সেই কলিকাতা?

এই অপরূপ স্থানে রাত্রিবাসের পর পাণ্ডা মহাশয় আমাদিগকে কলিকাতা লইয়া চলিলেন। তবে তাঁহার গৃহ কলিকাতা নহে,—মনে কিঞ্চিৎ আশা হইল। কিন্তু যাইতে যাইতে যাহা দেখিলাম তাহাতে ঘোরতর আতঙ্ক এবং ঘৃণা হইতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় সেই অট্টালিকা-তরঙ্গ দেখিয়া মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল, এবং পঞ্চরঙ্গ অনাঘ্রাতপূর্ব্ব গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দেশে রাখিয়া আসিলে ভাল হইত বলিয়া বিবেচনা হইতেছিল। যদিও এতদুভয় সম্পর্কে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা এখনও অটুট রহিয়াছে, তথাপি অন্যান্য বিষয়ে সেকালের কলিকাতায়

এবং একালের কলিকাতায় কত প্রভেদ! উড়ে বারিবাহুকগণ কলিকাতাবাসীদিগের ভগীরথ। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে গঙ্গা, আনিতেন। তাহা জল কি কর্দ্দম স্থির করা বড় কঠিন কথা ছিল। শুনিয়াছিলাম কর্দ্দমের বড় উর্ব্বরতা শক্তি আছে। কলিকাতার ত্রৈলোক্য মোটা অথর্ব্ব মানব-সৃষ্টিগুলি দেখিয়া আমাদের তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনওরূপ সংশয় রহিল না। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন "Extremes meet"। কলিকাতা এখনও তাহার জীবন্ত সঙ্গমস্থল।

হরগৌরী বাবুর অন্যতর আত্মীয় সিংহ মহাশয়ের দৌলতখানা পটুয়াটোলা লেনে। তিনি সেই লেনে আমাদের জন্য একটি সামান্য দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে আমাদিগকে অধিষ্ঠিত করিলেন। সিংহ মহাশয়ের একটি পা পরিমাণে কিঞ্চিৎ কম ছিল। তিনি যখন হুকা হস্তে করিয়া আমাদের অভিভাবকত্ব করিতে আসিতেন, আমি মনে করিতাম 'নোটবুক' হস্তে মুন্সী সাহেব! কিন্তু তিনি লোক ভাল ছিলেন; আমাদের বড় যত্ন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে তির্য্যগ্-গতিতে গম্ভীরভাবে পাদচারণ করিতে করিতে আমাদিগকে কলিকাতার অনেক রহস্য শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একটি অপরূপ কাল জিনিস ছিল। তিনি তাহাকে তাঁহার পোষ্যপুত্র বলিতেন। আমাদিগের হস্তে তাহার শিক্ষকতার ভার দিলেন। কিন্তু বোধ হয় তাহার বর্ণ এবং অবয়ব না সরস্বতীর ঠিক বিপরীত বলিয়া তিনি তাহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না।

প্রেসিডেন্সি কলেজ।

"বাসার স্থার" হইলে "আশার সুষারে" চলিলাম। কলেজে ভর্ত্তি হইতে গেলাম। "যেখানে সেখানেই রাত হয়।" প্রথমেই খ্যাতনামা অধ্যাপক রিজ (Rees) সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁহার সেই দীর্ঘ কালটুপি-শীর্ষ দীর্ঘ দেশীয় ফিরিঙ্গিমূর্ত্তি, তাঁহার সেই মসৃণ ক্ষৌরীকৃত মুখভঙ্গি, তাহাতে সেই বিশ্বনিন্দুক ঈষৎ হাসি, তাঁহার চারিদিকে মদিরা গন্ধে মুগ্ধ মাছিগণের বিহার, তাঁহার সেই বাক্য প্রবাহের বৈদ্যুতিক গতি, অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার সেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া থাকিবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ যেমন কুকুর, রিজ মহোদয় তেমনি মুগুর। তিনি এক সঙ্গে তিন সেক্‌সনে (section) অঙ্ক কসাইতেন, অথচ ভয়ে তিনটি শ্রেণীই নীরব। তিনি যে সকল অঙ্ক কসিতে দিতেন, গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে তাহা অনায়াসে কসিতে পারে, ভারতবর্ষে এমন লোক নাই। এরূপ দুরূহ অঙ্ক ছাত্রদিগকে দেওয়ার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে স্পার্টানদিগকে সর্ব্বদা গুরুতর ভারি অস্ত্রের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইত, যেন রণক্ষেত্রে লঘু অস্ত্রে তাহারা অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। তিনি পরীক্ষামন্দির ছাত্রদের যুদ্ধক্ষেত্র বলিতেন। মাদক-প্রিয়তা নিবন্ধন তিনি অবশেষে কর্ম্মচ্যুত হন। কটকে এক দিন মাত্র তাহার সঙ্গে আমার কলেজ ছাড়িবার পর সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল।

কলেজে প্রবেশ করিতেই তাঁহার হস্তে পড়ি। আমাদিগকে দেখিবা মাত্র তাঁহার কথার রেলগাড়ী ছুটিল। মুহূর্ত্তে দুই হাজার প্রশ্ন হইল। চট্টগ্রাম হইতে গিয়াছি শুনিয়া কত রসিকতাই করিলেন।

আমরা বাক্যের বিদ্যুৎ প্রবাহে তটস্থ। ছাত্রগণ চারিদিকে হাসিতেছে। পাঁচ মিনিট কাল এরূপে উৎপীড়িত করিয়া নাম লিখিলেন। গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আমরা সর্ব্ব শেষের একখানি বেঞ্চে বসিলে, সূর্য্য জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেবের বিলাত তোমাদের দেশে না?" সূর্য্যকুমার মিত্রের বাড়ী বর্দ্ধমান, তাহার গলা বড় মিষ্ট। তাহার কথা বড় মধুর। এই উৎপীড়নের পর তাহার কথা যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। তাহার স্নেহে যেন হৃদয় ভরিয়া গেল, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। সে সেদিন হইতেই আমাদের বড় যত্ন করিতে লাগিল। কলেজের পর সঙ্গে করিয়া তাহার বাসায় লইল। বলা বাহুল্য যে সেটি বর্দ্ধমানী আড্ডা। আমরা চাটগেঁয়ে ছেলে বলিয়া সকলেই বড় আদর করিল। সূর্য্য সঙ্গে করিয়া উদ্দেশ করিয়া আমাদের বাসায় লইয়া রাখিয়া আসিল। বলা বাহুল্য তাহা না হইলে খুঁজিয়াই পাইতাম না। কত দিন রাস্তা ভুলিয়া ঘোল খাইয়া বেড়াইয়াছি বলিতে পারি না। সুখে অসুখে সূর্য্য আমাদিগকে ঠিক ভাইয়ের মত যত্ন করিত। তাহার নামটি সে জন্য লিখিলাম। সূর্য্য পরে পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা যেখানে যান সেখানে একটা দল চাহি। কলেজেও তাই। ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের ছাত্রদের এক স্বতন্ত্র বেঞ্চ। তাঁহারা পশ্চিম বাঙ্গলার ছাত্রদের সংস্রবে মাত্র আসিতেন না, কারণ তাহারা "বাঙ্গাল" বলিয়া ডাকে। যে একবার "বাঙ্গাল" ডাকিয়াছে, তাহার অপরাধ আর মোচন হইবার নহে। সে চিরশত্রু। শুধু ছাত্র বলিয়া নহে, কই দেখি ধীর স্থির গম্ভীর একজন ব্রাহ্মভ্রাতাকে একবার বাঙ্গাল বলিয়া ডাক দেখি। আর কিছু না একবার তাহার কাছে হতভাগ্য ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'খানির নাম কর দেখি। অমনি কার্পাস-স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইবে। আমাদিগকেও

সকলে অজস্র ধারায় "বাঙ্গাল" ডাকিত, "চাটগেঁয়ে ভূত" ডাকিত, কিন্তু কই আমাদের ত কোনরূপ অপমান বোধ হইত না। আমরা পশ্চিম বাঙ্গালার ছাত্রদের সঙ্গে বসিতাম, এবং যদিও আমাদের মাতৃভাষা একরূপ বাঙ্গালাই নহে, তথাপি প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতাম, মাখামাখি করিতাম। অনেকেই আমাদের নিতান্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের টপ্পাবাজ অনেকেই আমাদের বাসায় দিনরাত্রি কাটাইতেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদিগকে চিমটি কাটিয়া রক্তপাত করিয়া ফেলিলেও কথা কহিতেন না, পাছে "বাঙ্গাল" ডাকে। ইংরাজি বাঙ্গালা উভয়েতেই তাঁহাদের কথা কালীঘাটে আরম্ভ হইয়া সারিগামা খেলিয়া বাগবাজারে গিয়া শেষ হয়। যেখানে আমোদ পায় লোক সেখানে বেশী ঝোঁকে। বিশেষতঃ বালকেরা। কাযে কাযে ছাত্রেরাও তাঁহাদের উপর বেশী অত্যাচার করিত। "জগচ্চন্দ্রকে" তাহারা "ঝগ্‌গৎ ছন্দ্র" বই ডাকিতে পারিত না, এবং "ঝগত ছন্দ্র"ও নয়ন কোণ হইতে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া নানাবিধ কুটুম্বিতা করিতেন।

কলিকাতার নানা স্থান দেখিয়া, কেশব সেনের ও লালবেহারীর কবির লড়াই শুনিয়া,—তাঁহাদের দুজনেরই তখন নব অভ্যুত্থান,—কলিকাতায় প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল।

নিষ্ফল পর্ব্ব।

গ্রীষ্মের শেষ ভাগে আমাদের দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি কার্য্যবশতঃ কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার মুখে এবং তাঁহার সঙ্গীদের মুখে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাদ্বয়ের রূপ গুণের কথা শুনিয়া আমার "হৃদয় কপাট" খুলিয়া গেল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে আমার এক খুড়তত ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাব করেন। তিনি জাত্যংশে কিছু দূষিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে অকৃতকার্য্য হন। এবার কলিকাতা আসিয়া আমাদের দুই জনের সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করেন। চন্দ্রকুমার শীঘ্র বর্ষি গিলিবার পাত্র নহেন, আমি গিলিলাম। আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কার্য্যস্থানে যাইয়া কন্যাদ্বয়কে দেখিতে আকুল হইলাম। চন্দ্রকুমার সৎকর্ম্মে শত বাধা। তাহার যন্ত্রণায় বিমুখ হইয়া বাড়ী গেলাম। সেই দুইটি বালিকার অদৃষ্ট ভাল। তাহারা এই দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইয়া দুই ভাগ্যবানের গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছিল। সেবার চন্দ্রকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। আমার মাতা আমার বিবাহের জন্য আকুল হইলেন। পরের শীতের বন্ধ উপলক্ষে বাড়ী গেলে তিনি অস্থির হইলেন। আমার চূড়া ও বিবাহ উভয়ই সেবার নিষ্পন্ন করিবেন। বলিয়াছি মাতা আমার বড় সরলা ছিলেন। তিনি দশের অধিক গণিতে জানিতেন না। ওই দেবীমূর্ত্তিখানি কেবল স্নেহে, ও তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি স্বামী এবং সন্তানের সুখ সঙ্কল্পে পরিপূরিত ছিল। কিসে আমরা সুখে থাকিব, এই ভাবনা ভিন্ন মাতার অন্য ভাবনা ছিল না। পূর্ণ গর্ভাবস্থায়ও আমাদিগকে স্বহস্তে রাঁধিয়া না খাওয়াইলে, তাঁহার যেন সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইত না। আমার একজন পিতৃব্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণালাভাশয়ে আমার জন্য অনুগ্রহ করিয়া একটি পাত্রী স্থির করিলেন। তাঁহার বিশেষণের মধ্যে ধন। তিনি মাতাকে

লওয়াইলেন যে আমি সে ধনের অধিকারী হইতে পারিব। মাতা তাহাই বুঝিলেন। ' পিতা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন; দানব্রতে ঋণী। হাজার টাকার নাম শুনিলেই মাতা মনে করিতেন কুবেরত্ব। আমি বড় দায়ে ঠেকিলাম। নূতন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, প্রণয়মূলক বিবাহ, তদ্দ্বারা ভারত উদ্ধার, প্রভৃতিতে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। তাঁহাতে কোথায় না একটি "টাকার থলে" আনিয়া নির্ব্বোধ মাতা পিতা গলায় বাঁধিয়া দিবেন। আমি অসম্মত হইলাম। পিতৃব্য মহাশয় বুঝাইলেন যে আমি মূর্খ। তাঁহার নির্ব্বাচিত কন্যা রূপগুণহীনা হইলেও তাহার এক যুবতী ও অসামান্য রূপবতী বিধবা ভ্রাতৃজায়া আছে। এক গুলিতে দুই পাখি মারিতে পারিব। এমন সুযোগও ছাড়িতে আছে! তিনি এই দুই নাল চাপিয়াও আমার ব্রহ্মজ্ঞান-স্ফুরিত বিবাহ নীতি ধ্বংস করিতে পারিলেন না। এই ষড়যন্ত্র ভেদ করিবার উপায় ভাবিতে লাগিলাম। চূড়া উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্রের জন্য একটি কবিতা লিখিয়া দিতে পিতা আদেশ করিলেন। আমি মালঝম্প কি ছাই ভস্ম ছন্দে এক "প্রভাকরী" ধরণের কবিতা লিখিয়া, সে কাগজখানির পৃষ্ঠে পিতা মাতা যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখ বিবাহ যূপে বলিদান দিতেছেন, তাহার এক উচ্ছ্বাস লিখিয়া দিলাম। কাগজখানি যথা সময় পিতার হস্তগত হইল, পিতা উভয় পৃষ্ঠা পড়িলেন। অলক্ষিত থাকিয়া দেখিলাম যে মুখের ফরসীর নল শ্লথ হইয়া আসিল; তাম্রকূট যন্ত্রের গুরু গম্ভীর ধ্বনি ধীরে ধীরে হাল্কা হইয়া উঠিল; পিতা অন্য মনে ভাবিতে লাগিলেন। বুঝিলাম ঔষধ ধরিয়াছে, কোমল হৃদয়ের কোমলতম স্থানে নালিশ পঁহুছিয়াছে, আর ভয় নাই। তাহার দুই দিন পর পিতার জ্বর, আমি মাতার বুকে মাথা দিয়া বসিয়া আছি। সেই আইবুড় ছেলে, তথাপি এরূপে বসিতে ভালবাসিতাম।

আজি যে খাটের ছায়ায় পড়িয়াছি, আজিও যদি একবার এই চিন্তাক্লান্ত মস্তক, সেই স্বর্গে রাখিতে পারিতাম! বিধাতা সে স্বর্গ আমার অদৃষ্টে বহুদিন লিখিয়াছিলেন না। পিতা জ্বরের প্রলাপে শয্যাতে উঠিয়া বসিয়া, মাতাকে তিরস্কার করিয়া ও একজন পিতৃব্যকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, তিনি কখনও আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে বিবাহ দিবেন না। না, তাহা ত পারিবেন না। তাহা আমার পিতার অসাধ্য কর্ম্ম! অনিন্দ্যসুন্দর সেই পবিত্র মূর্ত্তি, সেই উত্তেজনা, সেই উচ্ছ্বাস, এখনও চক্ষের কর্ণের উপর ভাসিতেছে। তাহাতে সরলা মাতার মনও ভিজিয়া গেল। মাতা আমাকে বুকে আঁটিয়া ধরিয়া আমার ললাট চুম্বন করিলেন। কে বলে স্বর্গ-সুখ পৃথিবীতে নাই! অদ্ভুত বিবাহ-নীতিপরায়ণ পিতৃব্যের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইল। আমি বিজয়ী বীরের মত কলিকাতা চলিয়া গেলাম।

ষষ্ঠী মাহাত্ম্য।

দাদা অখিলবাবু ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ, দিয়া কলিকাতায় এম, এ, দিতে আসেন। আমরা এক বৎসর কলিকাতায় থাকাতে সকলের কলিকাতা আসিতে ভরসা হইয়াছে। তাঁহার মাতুল ষষ্ঠীও 'ফাষ্ট আর্ট' পড়িতে আসিয়াছেন। ষষ্ঠী নামটি যেমন অপূর্ব্ব, লোকটিও তেমন,—একজন মহাপুরুষ। এই উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ সরল ও সহজ প্রকৃতির লোক বড় দেখা যায় না। তাহার আকৃতি প্রকৃতি, চলা ফিরা সকলই হাস্যকর। আমি আশৈশব ক্ষেপান বিদ্যায় মন্ত্রসিদ্ধ। বাবার অসাক্ষাতে যে সকল লোক বাসায় কার্য্যে অকার্য্যে আসিত, তাহারা যেমন বড় বা ছোট হউক, আমি না ক্ষেপাইয়া ছাড়িতাম না। স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত নিত্য এক একখানি প্রহসন অভিনীত হইত। অতএব এরূপ গুণগ্রাহী লোকের ষষ্ঠীকে চিনিয়া লইতে বড় বিলম্ব হইল না। ষষ্ঠী দাদার মামা, কাযেই আমার মামা। আমার মামা ত বাসাশুদ্ধ সকলেরই মামা, আমাদের পরিচিত সকলেরই মামা, পটলডাঙ্গার সকলেরই মামা। এরূপে কলিকাতা সহরে 'একাউণ্টেণ্ট জেনেরেল,' 'রেজিষ্টার জেনেরেল,' 'ইনস্‌পেক্টার জেনেরেল' প্রভৃতি নানাবিধ জেনেরেল উপাধিধারী উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে ষষ্ঠীও এক জন 'মামা জেনেরেল' হইয়া উঠিল। দিন রাত্রি হাসিতে বাসা তোলপাড়, পটলডাঙ্গা তোলপাড়। ষষ্ঠী কখন একখানি এগার ইঞ্চি হস্তে সিঁড়ির শিরদেশে আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, কখন বা ঘোর নিশীথে আমার শয্যার শিরোভাগে অধিষ্ঠিত, কখন বা বৃক্ষ শাখা হস্তে আমাকে তাড়াইয়া চাঁপাতলার পুকুর প্রদক্ষিণ করিতেছে,—উদ্দেশ্য আমাকে half murder (অর্দ্ধ খুন) করিবে। এ অর্দ্ধ-হত্যা ব্যাপারটাও

আমাদের শিক্ষক মুন্সি সাহেবের শিক্ষা। শুধু মামার লীলা দেখিবার জন্য কলিকাতার অনেক বন্ধু আমাদের বাসায় আসিতেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুরোধে, ভবিষ্যৎ মানব জাতির উপকারার্থ, এতাদৃশ মহাপুরুষের দুই চারিটি মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত।

প্রথম মাহাত্ম্য।—কলিকাতা সহরের গাড়ীর হুটাহুটি ছুটাছুটি দেখিয়া ষষ্ঠী কোথায়ও প্রাণপণে যাইতে চাহিত না। একদিন আমি কিছুতেই ইচ্ছা করিয়া গেলাম না, ষষ্ঠীকে তাহার একখানি বহি কিনিবার জন্য 'থেকার স্পিঙ্কের' বাড়ীতে যাইতে হইল। যাইবার সময়ে, দুপুর বেলা, ষষ্ঠী কোনমতে বিপদ কাটাইয়া গিয়া বহি কিনিয়াছে। মনে তখন বড় আনন্দ হইয়াছে। সে আনন্দে অধীর হইয়া কয়েকটা কমলা লেবু কিনিয়া, আমার সৌখিন ছাতাখানা মস্তকের উপর প্রসারিত করিয়া, মহা গৌরবের সহিত বউবাজারের মোড় পর্য্যন্ত উপস্থিত। এখন অপরাহ্ণ। মহাকালের ভীষণ যন্ত্রের মত শকটমালা নক্ষত্রবেগে চারি দিকে ছুটিতেছে। মোড়টি ষষ্ঠীর চক্ষে যেন চতুর্ম্মুখ মহাকাল! ষষ্ঠী এক একবার অসম সাহসে রাস্তা পার হইবার চেষ্টা করিতেছে, অকৃতকার্য্য হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। কলিকাতা সহর, ষষ্ঠীর এই লীলা, সেই মুহুর্ম্মুহু অগ্রসর ও পলায়ন, সেই অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি, শনৈঃ শনৈঃ হাঃ হুঃ রবে ঢাকার ভাষায় চীৎকার,—একটা ক্ষুদ্র জনতা হইয়া গিয়াছে। আর উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া ষষ্ঠী একবার যেই প্রাণপণ করিয়া পাড়ী যোগাইয়াছে, অমনি একখানি গাড়ী ছুটিয়া আসিয়াছে। তখন বিকট চীৎকার ছাড়িয়া—হায় রে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব গৌরব!—ষষ্ঠী একবারে নর্দ্দমায় গিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার রাস্তার সুশীল বালকবৃন্দ—বালক কেন, বৃদ্ধবৃন্দ বলিলেও বড় অসাহসের কথা হয় না—ষষ্ঠীর সাধের লেবুগুলি, চাদরখানি, গরিবের মাথার ছাতাটি, এমন

কি বহিখানি পর্য্যন্ত, লইয়া চম্পট দিয়াছে। যেটের বাছা ষষ্ঠী কোনও মতে ধড়খানি লইয়া গৃহাভিমুখী হইয়া, সমুদায় রাস্তা হাসাইতে হাসাইতে গৃহে চলিল। কিন্তু একটা বিভ্রাট যে হইবে তাহা আমি ভবিষ্যৎজ্ঞানে জানিয়াছিলাম, এবং তদপেক্ষায় ছাদের উপর বসিয়া ষষ্ঠীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম ষষ্ঠী আসিতেছে। কি অপূর্ব্ব রূপ! গায়ের পিরান ও ধুতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ও কর্দ্দম রাশিতে বসনদ্বয় স্থানে স্থানে, এবং মুখের অর্দ্ধভাগ সম্পূর্ণরূপে, সমাচ্ছন্ন ও সুবাসিত হইয়াছে। বদনের অপরার্দ্ধের স্থানে স্থানে চর্ম্ম উঠিয়া রক্ত পড়িতেছে। কর্দ্দমাচ্ছন্ন এক চক্ষে, এবং রক্তাচ্ছন্ন অন্য চক্ষে, অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আর হৃদয়হীন কলিকাতার অল্পসংখ্যক বাল-বৃদ্ধ পশ্চাতে হাততালি দিতে দিতে আসিতেছে। আমার অপরাধ আমি হাসিলাম। ষষ্ঠী আমাকে half murder করিতে ছুটিল। তাহার স্থির বিশ্বাস আমি 'ষ্টুপিড' (stupid) তাহার সকল দুর্গতির কারণ। আমি বহি কিনিতে গেলে ত তাহার এই দশা হইত না। বাসাশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া এ যাত্রা আমাকে কোনমতে অর্দ্ধখুন হইতে রক্ষা করিল।

দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।—ষষ্ঠীর বিশ্বাস তাহার বড় কফের ব্যারাম। ইহার অন্য কোন কারণ ষষ্ঠী কি আমরা অবগত নহি। এক দিন এক জন মেডিকেল কলেজের নেটিব-ডাক্তার-শ্রেণীর ছাত্র বলিয়াছিল,—'মামার বড় ভয়ানক কফের ব্যারাম।' সে দিন হইতে ষষ্ঠী যেখানে বসিত তাহার চতুর্দ্দিকে মুখামৃত বর্ষণ করিত এবং মুহুর্মুহু এত কাশিত যে কাহার সাধ্য কাছে বসে। আর এক দিন সেই ছাত্রটি কলেজ হইতে আসিয়া একটা পুরিয়া ষষ্ঠীর হস্তে দিয়া বলিল—"মামা! ডাক্তার ফ্রেয়ার আজ লেকচার দিবার সময় বলিয়াছিল এটি কফের বড় 'ঋবর'—কথাটা ষষ্ঠী ঢাকা হইতে আমদানি করিয়াছিল—ঔষধ। এক পুরিয়া খাইলেই ভেদ বমি

হইয়া কফ বাহির হইয়া যায়।" সে আমাকে কাণে কাণে বলিয়া গেল যে সে পুরিয়াতে কলেজ ষ্ট্রীটের বহু শকটনিষ্পেষিত এবং বহু পদদলিত সুর্কি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এখন মামার দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। এক,—তুমি তাহাকে যে রোগের কথাই বল, সে বলিবে তাহার শরীরে সে রোগ ষোল আনা আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। একদিন একটি যক্ষ্মারোগী বাসায় আসিল, ষষ্ঠী বলিল তাহারও যক্ষ্মা হইয়াছে। যখন তাহার মধ্যম বয়স তখন তাহার একটি ভাগিনার বহুমূত্র হইয়াছে, ষষ্ঠী বলিল তাহারও বহুমূত্র হইয়াছে, দেশশুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিল। দ্বিতীয়—সে ঔষধের গুণ কখনও প্রাণান্তে অপলাপ করিত না। ষষ্ঠী সন্ধ্যার সময় সেই মহা পুরিয়া পরম ভক্তিসহকারে ভক্ষণ করিল। অর্দ্ধরাত্রে তাহার কণ্ঠ-নিনাদে কলিকাতা সহর তোলপাড়, কার সাধ্য ঘুমায়। সকলে ব্যস্ত হইয়া জাগিয়া বসিলাম। ব্যাপারখানা কি? ষষ্ঠী বলিল তাহার ভেদ ও বমি হইতেছে। ঘন ঘন পায়খানা যাত্রা ও ঘন ঘন মহা উদ্গার-ধ্বনি! বলা বাহুল্য বমি কিছুই হইতেছে না। সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল! ডাক্তার ডাকিয়া আনিবার জন্য দাদা আমাকে জিদ করিতে লাগিলেন। দুপুর রাত্রিতে আমি এরূপ অভিযানে অসম্মত হইলাম। কিছুক্ষণ এ অভিনয় হইলে, আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম বমিতে বাহির হইতেছে কি? ষষ্ঠী অমনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল—"আজ্ঞা অখিল বাবু—what are these আজ্ঞা?" এ সকল কি? ইহা ষষ্ঠীর দরখাস্তের বাঁধা ফারম। আর তাহার প্রত্যেক কথার পূর্ব্বে ও পরে 'আজ্ঞা' থাকা চাহি। "আমি আজ্ঞা মরিতেছি, আর সে আজ্ঞা ঠাট্টা করিতেছে। আমি আজ্ঞা তাহাকে কি murder do (খুন) করিতে পারি না?" ষষ্ঠীর রসময়ী ইংরাজী ভাষা এরূপই ছিল। সে বলিত "read করিতেছি," "eat করিতেছি।" আমি আবার বলিলাম

সেই ছাত্রটি আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে সে পুরিয়াতে কলেজ ষ্ট্রীটের খাঁটি সুর্কি মাত্র ছিল। তখন বাসাশুদ্ধ হাসিয়া উঠিল। ষষ্ঠী আবার দরখাস্ত পেশ করিল—"আচ্ছা, অখিল বাবু what are these ?" সে উচ্চারণ করিল—water these. দাদা বিষয়টি কি বুঝিয়া বলিলেন—"মামা! আমি কি ভিস্তি!" তখন ষষ্ঠী এক বজ্র লম্ফে বাঘের মত আমার ঘাড়ে পড়িল। এবার আর 'হাফ মর্ডার' নহে, পুরো 'মর্ডার' সঙ্কল্প।

তৃতীয় মাহাত্ম্য।—দাদা এম. এ. দিতে আসিবার পূর্ব্বে রামপুর বোয়ালিয়া স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। মামা মহোদয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার বাসার পাশাপাশি আর একটি ভদ্রলোকের বাসা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা 'কামিনী'। সে ষষ্ঠীর 'ডলসিনিয়া', দিগ্গজ ঠাকুরের আসমানী। ষষ্ঠী কলিকাতা আসিয়া অবধি তাহার প্রেমে বিভোর। সেই আশ্চর্য্য ইংরাজি বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় তাহার রূপের গুণের ব্যাখ্যা, আমাকে নির্জ্জনে পাইলেই, কাশির ও মুখামৃত বর্ষণের অবসরে আমার কর্ণে ঢালিত। একবার গ্রীষ্মের বন্ধে দাদার অনুরোধে আমি ও ষষ্ঠী রামপুর বোয়ালিয়া চলিলাম। পথে আমাদের একজন সঙ্গী দূরে পলাশির মাঠ দেখাইয়া যুদ্ধের অনেক অপূর্ব্ব অনৈতিহাসিক গল্প বলিলেন। এখানে 'পলাশির যুদ্ধের' অঙ্কুর পাত হইল। বোয়ালিয়া গিয়া দেখিলাম কামিনীর বয়স জোর ১০ বৎসর, বর্ণটা সাদা-গৌর, চুল কটা, চক্ষু মার্জ্জারের। এই বালিকাই ষষ্ঠীর প্রেমময়ী নায়িকা, শ্রীমতী রাধিকা। তাহার মুখে ইহার বর্ণনা শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম কামিনী নব-যৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা একটি অদ্বিতীয়া সুন্দরী, ষষ্ঠী-প্রেমে ঢল ঢল। বালিকার পঞ্চক্রোশের মধ্যেও প্রেমের গন্ধ নাই। না থাকুক, গরিব ষষ্ঠীর প্রেম-ভাব বোয়ালিয়া বাজার পর্য্যন্ত রাষ্ট। কামিনীর বাপ পর্য্যন্ত তাহা লইয়া তাহাকে বর সাজাইয়া

নাচাইতেন। কখন বা বিবাহের কথা হইতেছে, কখন বা যৌতুকের একটি দীর্ঘতালিকা হইতেছে। কখন বা ষষ্ঠীর চুল দীর্ঘ, বলিয়া আপত্তি করিলেন ; ষষ্ঠী মাথা নেড়া করিয়া ফেলিল। তখন তিনি নেড়া বলিয়া আপত্তি করিলেন, ষষ্ঠী মাথায় দিন রাত্রি 'মেকেসার' ঘষিতে লাগিল। তাঁহারও মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ ছিটা ছিল। তা না হইলে এমন জামাতা যুটিবে কেন? তাস খেলিতে ষষ্ঠীকে তাঁহার খেরু করিয়া দেওয়া হইত আর আমি অপর পক্ষে বসিতাম। আমি তাস খেলায়ও মন্ত্রসিদ্ধ ছিলাম। দুজনকে ক্ষেপাইয়া দিয়া, পিট হইতে কাগজ বারম্বার তুলিয়া আগাগোড়া খেলিতেছি। তাহাদের লক্ষ্য মাত্র নাই। যোগস্থ হইয়া আপনাদের হাতের তাস চিন্তা করিতেছে। ঘন ঘন দুজনে ঝগড়া করিতেছে। বৈঠকখানা শুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। দেখিতে দেখিতে কত ছক্কা, কত পাঞ্জা হইতেছে। শেষে উহারা প্রতিজ্ঞা করিল আমি যে ঘরে থাকি, তাহারা সে ঘরে খেলিতে বসিবে না।

একদিন বেলা অপরাহ্নে আমি একখানি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' বসিয়া সংস্কৃত শকুন্তলা পড়িতেছি। কামিনী আসিয়া আমার লাউঞ্জ চেয়ারের হাতের উপর পুতুলটির মত বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। বলা বাহুল্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষষ্ঠী আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এ জগতে প্রকৃত প্রণয়ের প্রতিদান নাই। কামিনীও তাহাকে দেখিয়া হাসিত ও ঠাট্টা করিত। সে মূর্ত্তিরই এমন হাস্যস্কর মহিমা যে একটি বালিকা পর্য্যন্ত না হাসিয়া, ঠাট্টা না করিয়া, থাকিতে পারিত না। ষষ্ঠী অনেক সময়ে তাহা দুষ্মন্তের মত অনুরাগের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কামিনী আমার এত কাছে বসিয়া, মালা গাঁথিতেছে, গল্প করিতেছে, ষষ্ঠী পার্শ্বে এক তক্তপোষের উপর পদ্মাসনে বসিয়া মনোবেদনায় অধীর হইয়া অঙ্কের উপর হাতে হাত রগড়াইতেছে, কটমট করিয়া এদিক ওদিক

কটাক্ষ বর্ষণ করিতেছে, কখন আপন মনে হাসিতেছে, কখন গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়া কি এক বহি পড়িতেছে। তাহার উপর সেই মহা কফ-রোগ নিবন্ধন শনৈঃ শনৈঃ কাশি আর নিষ্ঠীবন বর্ষণ ত আছেই। প্রেম চাগিয়া উঠিলে ইহাদের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশী হইত মাত্র। কামিনীর মালাগাঁথা শেষ হইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল কেমন হইয়াছে। আমি বলিলাম,—"বেশ হইয়াছে। এ মালা কি করিবে?" "আপনার গলায় দিব"—বলিয়া সে আমার গলায় মালা দিয়া হাসিতে লাগিল। আমি ষষ্ঠীর দিকে চাহিয়া যে একটুক ঈষৎ হাসিলাম, ষষ্ঠী লাফাইয়া আসিতে আমি ছুটিলাম। ষষ্ঠী একখানি প্রকাণ্ড কাঠ লইয়া—একটা ছোটখাট গন্ধমাদন—আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল। আমার ভাগ্য ভাল, কেবল পায়ে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়া মাংস এক টুকরা উঠিয়া গেল। একটুক উপরে পড়িলে আমার ভবলীলা শেষ হইত। বালিকা চীৎকার করিতে লাগিল। রাস্তা হইতে লোক আসিয়া বাসা লোকারণ্য হইল। দাদা এ সময়ে স্কুল হইতে পঁহুছিলেন। কামিনীর পিতা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও আফিস হইতে আসিলেন। হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। কামিনী প্রত্যেকের কাছে জলের মত অম্লানমুখে এই পুষ্পমালা বিভ্রাট ব্যাখ্যা করিল। তাঁহারা প্রথম স্তম্ভিত হইলেন; পরে হাসির তুফান উঠিল। কেবল গরিব ষষ্ঠী নিরাশ-প্রেমে হউক, কি চারি দিকের গালির চোটে হউক, নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতেছিল। তা ও পারে কই, তাহাকে একবার এক একজন টানিয়া আনিতেছে, আর সে নানারূপ মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির সহিত অদ্ভুত interjection (ক্রোধোক্তি) ছড়াইয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

চতুর্থ মাহাত্ম্য।—একবার গ্রীষ্মের বন্ধের সময় সকলে বাড়ী যাইব। আমি সকলের বাজার করিয়া ও ষ্টীমারের পাশ লইয়া,—এ সকল কার্য্য

অন্য কেহ আমাদের মাতৃভাষার কল্যাণে করিতে চাহিত না,—অবসন্ন ও ধূলি সমাচ্ছন্ন দেহে গৃহে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেখিলাম দাদা মহা চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন তাঁহার বাড়ী যাওয়া হইবে না। কেন? না, ষষ্ঠীর সাটিনের এক পিরান নিজের জন্য, এবং এক গাউন তাহার ভাইঝিয়ের জন্য না পাইলে সে বাড়ী যাইবে না। তিনি তাহাকে ফেলিয়া কিরূপে যাইবেন? অথচ সে রাত্রিতে আমরা ষ্টীমারে উঠিব। তিনি সাটিন কিনিতে টাকাই বা কোথায় পাইবেন, আর সময়ই বা কোথায়? আমি বলিলাম—"এজন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন, আমি তাহার কিনারা করিতেছি।" আমি ষষ্ঠীকে লইয়া সাটিন কিনিতে যাত্রা করিলাম। বলিলাম বাকী লইতে পারিব। ষষ্ঠী বিশ্বাস করিল। আমি ষষ্ঠীর সোণার কাটি রূপার কাটি জানিতাম। এক কাটি দেখাইলে, ষষ্ঠী আমাকে 'হাকমর্ডা' করিতে আসিত, আর এক কাটি দেখাইলে আনন্দে আটখানা হইয়া আমার গায়ে ঢলিয়া পড়িত। এই শেষোক্ত কাটি চালাইলাম। সেই কামিনীর উপাখ্যান আরম্ভ করিলাম। ষষ্ঠীর প্রতি তাহার অসাধারণ প্রেম, তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব,—ষষ্ঠী "ষ্টুপিড, ষ্টুপিড" বলিয়া আনন্দে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, একেবারে অবশ ও আত্মহারা হইয়া চলিল। সময়ে সময়ে গাড়ী চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। এভাবে মাধব দত্তের বাজারে উপস্থিত হইয়া বলিলাম—"মামা! বেলা শেষ, বড়বাজারে কি চিনাবাজারে এ সময়ে সাটিন কিনিতে বড় ঠকিব। এখানে আমাদের পরিচিত যে দোকানদার আছে, তাহার কাছে সাটিন আছে কি না, আমি দেখিয়া আসি।" তাহাকে গিয়া আমাদের বিপদের কথা বলিয়া কোনও একটা কাপড় সাটিন বলিয়া পাশ করিয়া দিতে বলিলাম।

সে ষষ্ঠীকে চিনিত, বলিল ভয় নাই। আমি অভয় পাইয়া ষষ্ঠীকে ডাকিলাম। কলিকাতার দোকানদার, সে একটা লম্বা চৌড়া গৌরচন্দ্রিকা দিয়া কাগজে চাপিয়া খানিকটা ক্রেপ বাহির করিয়া একটুক কোনা উল্টাইয়া একটা প্রকাণ্ড ফুলের কিঞ্চিৎ অংশ ষষ্ঠীকে দেখাইয়া বলিল—"মামা! এমন সাটিন তুমি কলিকাতা সহরে ঘুরিয়া পাইবে না। আহেল বিলাতি—আমদানি!" ষষ্ঠী আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"good thing কি?" ষষ্ঠী কোনও জিনিসকে বাঙ্গালায় 'ভাল' না বলিয়া, good thing বলিত। পাওরুটি একটা বিশেষ good thing। আমি বলিলাম যে আমি এমন সাটিন দেখি নাই। সাটিন লইয়া একটা দর্জ্জির দোকানে গিয়া কি করিতে হইবে আমি তাহাকে বেশ করিয়া শিখাইয়া আসিয়া রাস্তার পার্শ্বে গাড়ীর ভয়ে ভীত, ও কামিনী-প্রেমে গদগদ, ভাবে দণ্ডায়মান ষষ্ঠীকে বলিলাম—"গাউন এত অল্প সময়ে পারিবে না। তোমার পিরানটা দিবে বলিয়াছে।" তখন আবার প্রেম-তরঙ্গে ভাসাইয়া ষষ্ঠীকে বাসায় লইলাম। দাদা ও বাসাশুদ্ধ অবাক। রাত্রি ৮ টার সময়ে দর্জ্জি পিরান কাগজে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ষষ্ঠীর হাতে দিয়া ও সাটিনের বহু প্রশংসা করিয়া বলিল—"খবরদার দুই তিন দিনের মধ্যে খুলিও না, শেলাই নষ্ট হইবে। বেশ করিয়া চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।" ষষ্ঠী তাহার কথা বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস করিয়া কাপড়ে চাপা দিয়া সে পুটুলি তাহার ট্রঙ্কের তলায় রাখিল; আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ষ্টীমারে পর দিন গোপনে এই রহস্য সহপাঠীদের কাছে প্রকাশিত হইলে হাসির তরঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গ দুই দিন দুই রাত্রি পরাভূত হইল। কিন্তু পাছে ষষ্ঠী আমার সমুদ্র শয্যা ব্যবস্থা করে, তাই তাহার কাছে কেহ প্রকাশ করিল না। চট্টগ্রাম পঁহুছিয়া ষষ্ঠী ট্রঙ্ক খুলিয়া সাধের সাটিনের পিরান গায়ে দিয়া বাহার দিবার জন্য বাহির করিয়া যখন দেখিল যে

সাটিন দুই দিন দুই রাত্রিতে চালিতা প্রমাণ বুটা সম্বলিত অতি নিকৃষ্ট ও হাস্যকর 'ক্রেপে' পরিণত হইয়াছে, তখনই সে পিরাণ গায়ে দিয়া সক্রোধে সটান আমার বাসায় ছুটিয়া আসিয়া আমাকে না পাইয়া চন্দ্রকুমারের বাসায় উপস্থিত। চন্দ্রকুমারের পিতার কাছে আমরা সসম্ভ্রমে বসিয়া আছি। সেখানে আমার প্রতি আইন বহির্ভূত ব্যবহার করিবার সুযোগ নাই দেখিয়া, ষষ্ঠী এক পার্শ্বে বসিয়া এরূপ ভাবে চাদরের দ্বারা পিরাণ ঢাকিতেছিল যে তাহাতে বরং চন্দ্রকুমারের পিতার চোক আরও বেশী আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন—"তুই কি পিরাণ গায়ে দিয়াছিস! অমন করিয়া লুকাইতেছিস কেন?" আমরা হাসিয়া উঠিলাম। আর না। বারুদ স্তূপে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িল। ষষ্ঠী এক লম্ফে আসিয়া আমার গালে এক প্রকাণ্ড চড় কসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। চন্দ্রকুমারের পিতা অবাক। আমরা হাসিয়া আকুল। গল্পটা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে তিনিও উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। বিকাল বেলা দাদা অখিল বাবুর বাসা লোকে পরিপূর্ণ। সকলে বসিয়া আছি। অপূর্ব্ব সাটিনের পিরানের গল্প উঠিয়াছে। বৈঠকখানা হাসিতে পরিপূর্ণ। এমন সময়ে মামার আগমন, আর আমার ঘাড়ে পতন। বৈঠকখানাশুদ্ধ লোক পড়িয়া কোনও মতে সে যাত্রায় আমাকে রক্ষা করিল।

পঞ্চম মাহাত্ম্য।—ষষ্ঠী ছেলে ভাল। আমাদের সকলের অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিত, রাত জাগিয়া পড়িত। সকল বিষয় আমাদের অপেক্ষা অধিক না হউক কম জানিত না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? পরীক্ষা গৃহে যাইবার সময় গাড়ীতে আমরা সমস্ত রাস্তা তাহাকে কিরূপে পরীক্ষা দিবে তাহার উপদেশ দিতাম। তথাপি ষষ্ঠী কোনও দিন হয় ত একটি কঠিন 'প্রব্লেমে' হাত দিয়া দিন কাটাইয়া

আসিয়াছে। কোনও দিন কাগজের এক পৃষ্ঠের প্রশ্নের মাত্র উত্তর দিয়া আসিয়াছে। অপর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখে নাই। কোন দিন বা তাড়াতাড়িতে উত্তর-লেখা কাগজগুলি ঘরে লইয়া আসিয়াছে, কতকগুলি সাদা কাগজ তৎপরিবর্ত্তে দিয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে বহুবার মাটি কাটা পরিশ্রম করিয়াও ষষ্ঠী কোনও মতে 'ফাষ্ট আর্ট' রূপ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

ষষ্ঠ মাহাত্ম্য।—এতদ্ভিন্ন ষষ্ঠীর ক্ষুদ্র কীর্ত্তি অনেক আছে। তাহাকে যে যেখানে পায় পাগল সাজাইত। একদিন সেই সাটিন বিক্রেতা দোকানদার হইতে ষষ্ঠী দশ হাত এক ধুতি কিনিয়া আনিয়াছে। বাসায় আনিয়া মাপিলে হইল আট হাত। ষষ্ঠী আবার তাহার দোকানে গেলে সে মাপিয়া দিল দশ হাত। ষষ্ঠী কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় আসিয়া বলিল—"তোমরা আমাকে পাগল পাইয়াছ?" আবার মাপিল, আবার আট হাত। ষষ্ঠী আবার দোকানদারের কাছে গেল। সে আবার মাপিয়া দিল দশ হাত। ষষ্ঠী এবার ক্রোধে গর গর করিয়া আসিয়া কাপড় তাহার ট্রঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখিল। বলিল—"হউক আট হাত, তোদের বাপের কি?" এক দিন দিগ্‌গজ ঠাকুরের মত সেই ধুতি পরিল। ধেড়ে ছেলে আট হাত কাপড়ে কুলাইবে কেন? কেহ হাসিলে তাহাকে বাপান্ত করিয়া গালি দিতে লাগিল। পরে দোকানদার এক দিন আসিয়া প্রকৃত দশ হাত একখান কাপড় দিয়া বহুরূপী কাপড়খানি লইয়া গেল। ষষ্ঠী বহি কিনিত দপ্তরি পাড়া হইতে, সের ও মণ হিসাবে। কোনও বহির অর্দ্ধাংশ, কাহারও চতুর্থাংশ, কাহারও বা মলাট মাত্র আছে। এরূপে এক এক দিন এক এক ঝাঁকা বহি কিনিয়া আনিত। একদিন বেথুন সোসাইটিতে গিয়া ভিড়ের জন্য ষষ্ঠী বসিতে পারিল না। পরের বার সে সমুদায় শরীরে 'কড্‌লিভার অইল' মাখিয়া

গিয়া উপস্থিত। যেখানে গিয়া বসিল সে দিকের বেঞ্চকে বেঞ্চ শূন্য করিয়া নাকে হাত দিয়া লোক পলাইল। ষষ্ঠী মনের আনন্দে একলা এক বেঞ্চে বসিয়া অবিভক্ত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। ষষ্ঠী এক নিলামে একটি বালকের ব্যবহার্য্য খাট কিনিয়া, তাহাতে কোণাকুণি হইয়া শুইয়া থাকিত। পুথি বাড়ান নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় এই ষষ্ঠী মাহাত্ম্যে ভবিষ্যৎ মানবগণ ষষ্ঠী নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রৌঢ় বয়সে উকিল হইয়াও তাহার প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়াছিল না। সে আপনার পুত্র ভ্রাতষ্পুত্রের কাছেও হাস্যকর কৃপাপাত্র ছিল। তাহাদের উপর রাগ করিয়া সে নিজে কাঁদিত। এখনও সে ঠিক যেন একটি শিশু। ওকালতিতে মক্কেলেরা ঠকাইয়া যাহা দিত সে তাহা লইত। গরিব বলিলে তাহার সমস্ত ফিস মাপ। তাহার এ সামান্য আয়ের দ্বারা একটা সৈন্য প্রতিপালন করিত। এরূপ পরোপকারে সে জীবনপাত করিয়াছে। তাহার চরিত্র কি পবিত্র, কি সুন্দর, কি সরল! আজ ষষ্ঠী সেরূপ পবিত্র, সুন্দর ও সরল স্বর্গে।

পূর্ব্বরাগ।

"কৃষ্ণ রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট"

খুলিল হৃদয় দ্বার না লাগে কপাট।

ভাট—আর কেহ নহে, ভায়া ষষ্ঠী। তাহার খুড়া ঢাকায় চাকরি করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মী। তাহার বয়স তখন ১০ বৎসর। এই বালিকা সম্বন্ধে "একমে হাজার বাত বানাইয়া" দাদা ও ষষ্ঠী গল্প করিতেন। শুনিতে শুনিতে আমার "হৃদয় কপাট" খিল কবজা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া গেল। Love by first sight—"প্রথম দর্শনে প্রেম" তাহা ত শুনিয়াছ। কিন্তু Love by no sight—"অদর্শনে প্রেম" কি কেহ শুনিয়াছ? বাঙ্গালির ত শুনিবার কথাই নহে। ইহাদের দুরদৃষ্ট কি শুভদৃষ্ট বশতঃই হউক—ঘোরতর মতভেদ আছে—ঘোড়ার আগে গাড়ী, লেখার আগে রেজষ্টরি, আগে বিবাহ, পরে প্রেম। কিন্তু যাহাদের প্রেমের শ্রাদ্ধটা গড়াইয়া গেলে তাহার পর শুভবিবাহ হয় তাদৃশ ভাগ্যবানদের মধ্যেও কেহ বোধ হয় এতাদৃশ পূর্ব্বরাগ অনুভব করেন নাই। যদি বৈষ্ণবঠাকুরদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা যায়, তবে করিয়াছিলেন কেবল শ্রীমতী—

"কেবা শুনাইবে শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
নাহি জানি কত মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?"

তবে শ্রীমতীর "কুলমজান" বাঁশি শোনা, কদম্ব তলায় বেড়ান, আর—

"জলে ঢেউ দিও না সখি।
জলের ছায়াতে শ্রীকৃষ্ণ দেখি॥"

ভিন্ন অন্য কোন কাঁধ ছিল না। কিন্তু আমি গরিবের কুলের অধিক কলেজ আছে, আয়ানের অধিক রিজ সাহেব আছে, বংশীর অধিক রিজ সাহেবের মুখভঙ্গি ও "লগেরেথিম" (Log) আছে। আমার যে মারা পড়িবার কথা। আমার পড়া শুনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেবল সেই নাম "জপিতে জপিতে অবশ করিল গো"। শুধু তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। তাহার উপর—

"রূপলাগি আঁখি ঝোরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে।"

আমি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলাম—

"হইতে হইতে অধিক হইল সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর পাগলী হইয়া গেনু।"
দিন রাত্রি একই ভাবনা কেমনে পাইব সই তারে?"

কিন্তু দারুণ কলির দৌরাত্ম্যে এখন 'মেঘদূত'ও জোটে না, 'হংসদূত'ও জোটে না। জুটিল কেবল আমার পিসতত ভাই 'জগত'। তাহার দ্বারা অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রাম্য ভাষার শ্রীমতীর একখানি আলেখ্য আনাইলাম। "একমে হাজার বাত" হইতে বাদসাদ দিয়া দেখিলাম শ্রীমতী দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহেন, চতুরা, বুদ্ধিমতী, ও কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানেন। দেশে তখন লেখা পড়া কেহ জানে না। মেয়েদের লেখা পড়া শিখা মহাপাপ বলিয়া গণ্য। যদিও পড়িয়াছিলাম—Little

learning is a dangerous thing (অল্প শিক্ষা ভয়ানক জিনিস) তথাপি এই "কিঞ্চিৎ লেখাপড়া" আমার পক্ষে মহা মূল্যবান বোধ হইল। কিন্তু "কেমনে পাইব সই তারে"?

তাহার পিতা এই দশম বৎসর বয়স্কা এই কন্যা ও সাত বৎসরের এক পুত্র ও বিধবা স্ত্রী রাখিয়া অকস্মাৎ ঢাকায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি আমার পিতার মত বড় সদাশয় ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। পরোপকারে জীবন সমর্পণ করিয়া আপনার পরিবারকে সংসারসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যান। ইহাদের এক বেলা অন্নের সংস্থানও ছিল না। এই দরিদ্রা অনাথা বিধবার কন্যাকে বিবাহ করিতে মাতা স্বীকার করিবেন কেন? শুনিয়াছি তাহার পিতা ও আমার পিতা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে আমার প্রথমা ভগিনীর এবং তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ সহদরকেও কলেজে পড়িবার সময়ে ঢাকা গ্রাস করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সেই প্রতিজ্ঞার সূত্রও ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি পিতা অর্ধ চরণে ঠেলিতেন। তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাতা এরূপ বিবাহে ঘোরতর বিরোধিনী। অতএব আমি—

"এখন তখন করি দিবস গোঁয়াইনু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঁয়াইনু
খোয়াইনু এ তনু কি আশা।
বরিখ বরিখ করি সময় গোঁয়াইনু
খোয়াইনু এ তনু কি আশ।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী মাস?"

দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল। একদিন হঠাৎ তাহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি দাদার কাছে পত্র লিখিলেন যে আমার জন্য এত কাল তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আমার মাতার ঘোরতর অনিচ্ছা। অতএব তাঁহারা অন্যত্র বিবাহের জবাব দিয়াছেন। So sweet was never so fatal! আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। আমি বুঝিলাম—

"হিমকর কিরণে নলিনী যদি জাড়ব
কি করব মাধবী মাস ?"

অনেক চিন্তার পর এক মাত্র অস্ত্র পাইলাম। উহা করুণাময় পিতার বক্ষে প্রহার করিলাম।

বিবাহ বিভ্রাট

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে?
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।"

চণ্ডীদাস।

উপায়টিও শ্রীমতী যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা, পৌরাণিক। বলিয়াছি পিতা আমার মাতার অধিক ছিলেন। আমার হাতের লেখা পত্র যাহার নামে হউক না, তিনি দেখিলেই খুলিয়া ফেলিতেন। এই কারণে জগতের কাছে যে দিন আমার "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানির" কথা লিখিতাম সে দিন পিতার কাছে স্বতন্ত্র এক পত্র লিখিতাম। তিনি তাঁহার পত্রখানি পাইলে আর জগতের পত্র খুলিতেন না। অতএব এইদিন কেবল জগতের কাছে এক পত্র লিখিলাম যদি এখানে আমার বিবাহ না হয় তবে হয় আমি সেই স্বদেশী ব্রাহ্ম মহাশয়ের বিখ্যাত কন্যা একটি বিবাহ করিব, না হয়—

"যমুনা সলিলে সখি! অবতনু ডারব,
আন সখি! ভখিব গরল।"

যাহা মনে করিয়াছিলাম। পিতা পত্র খুলিয়া পড়িলেন, পড়িয়া ব্যাকুল হইলেন। এতদিন এ কথা তাঁহাকে বলে নাই বলিয়া গরিব জগতকে বহু তিরস্কার করিলেন, এবং তখনই কন্যার ভগ্নীপতি ও মাতুলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উভয়ে উচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁহারা আসিলেন। পিতা পূজায় বসিয়াছেন। সেই বালিকার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিল, তাহারা বলিলেন—"তাহার বিবাহের দিন কল্য। এখন

কি করিব? তথাপি আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমরা আজ্ঞা পালন করিব।" পিতা কোসা হইতে জল হস্তে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা তখনই সহর হইতে ছুটিলেন। কিন্তু কন্যার পিত্রালয় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বরপক্ষ বস্ত্রালঙ্কার দিয়া বিবাহের অধিবাস করাইয়া গিয়াছেন। বরের প্রায় পাশাপাশি বাড়ী এবং তাহারা ক্ষমতাশালী লোক। তথাপি নির্ভয়ে বস্ত্রালঙ্কার ফিরাইয়া দিয়া মাতুল মহাশয় সে রাত্রিতে তাঁহার ভাগিনেয়ীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আমাকে সে দিনের ষ্টীমারে বাড়ী পাঠাইতে পিতা দাদার কাছে টেলিগ্রাফ করিলেন।

First Art পরীক্ষার আর এক মাস মাত্র বাকী। আজ কলেজ সে জন্য বন্ধ হইতেছে। বিদ্যুৎদূত—ধন্য ইংরাজ রাজের মাহাত্ম্য—মুহূর্ত্তে সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন, এবং প্রথম আঘাতে আমাকে বজ্রাহত করিলেন। মহা সঙ্কট—যাই কি না যাই। "To be or not to be," এক দিকে পরীক্ষা, অন্য দিকে জীবনের সুখের তিতিক্ষা। বাসা তোলপাড়। যাহাদের বিবাহ হইয়াছে তাঁহাদের মত নহে আমি যাই। তাঁহারা তখনকার দিল্লীর লাড্ডু, শিক্ষিতা পত্নী, পান নাই, আমি পাইব কেন? বেলঘরিয়ার উমেশ সংস্কৃত কলেজে পড়ে। তাহার বড় ভাই নবীন অন্য কলেজে পড়ে। দুই ভাই আমাদের বাসা হইয়া রোজ বাড়ী যায়, অনেক সময় আমাদের বাসায় থাকে। দুজনেই আমাকে বড় ভালবাসে। দুজনেই আমার মনের ভাব জানিত। সহপাঠী তারকও কলেজে অবস্থা শুনিয়া বলিল যাইতে হইবে। তাহার বাড়ী স্মরণ হয় চাঙ্গড়িপোতা, ডায়মণ্ড হারবার। তারক এণ্ট্রেন্সে প্রথম হইয়াছিল। ফার্ষ্ট আর্টেও প্রথম কি দ্বিতীয় হইয়াছিল। কিন্তু এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র অস্তমিত হয়। আমি কলেজে তাহার পার্শ্বে বসিতাম এবং

সে আমাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করিত। নবীন ও উমেশ দুই ভাই জোর করিয়া, আমাকে অর্দ্ধ রাত্রিতে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিল। দেশে কি হইয়াছে জানি না। তথাপি কেমন মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে যাত্রা করিলাম।

অকূল সাগরের নীলমণিময় পথ বাহিয়া বাষ্পীয় তরী তৃতীয় দিবসে ঘাটে পঁহুছিল। আমার আত্মীয় স্বজন আমার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকে কিঞ্চিৎ পকেটস্থ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া সেই "কুবেরের কন্যা" বিবাহ করাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। আমি সমুদায় ষড়যন্ত্র বিফল করিয়াছি। আমার যে পিতৃব্য "এক গুলিতে দুই পাখী মারিতে পারিব" বলিয়া বিবাহের প্রধান উদ্যোক্ত ছিলেন, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জাহাজে আসিয়াছেন। নমস্কার করিলে আশীর্ব্বাদ মাত্র না করিয়া একটুক কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন— "বেশ সুপুত্রের কার্য্য করিয়াছ। ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে, পুলিশ তদন্ত করিতেছে। তোমার পিতা মাতা শাশুড়ী সকলকেই জেলে যাইতে হইবে।" এবার যথার্থই মাথায় বজ্রাঘাত হইল। আমি কিছু দেখিতেছিলাম না, কিছু শুনিতেছিলাম না, কিছু বুঝিতেছিলাম না। আমি মূর্চ্ছিত অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। ফৌজদারী মোকদ্দমা কি, জেল কি, কিছুই জানি না। তবে জানি দুটিই কোন ভীষণ জিনিস। পিতৃব্য মহাশয়ের তখনও দয়া হইল না। তিনি তখন পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী মহা ঘোরাল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আমি ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ক বালকের মর্ম্মে অস্ত্রের উপর অস্ত্র প্রহার করিয়া, ব্যাখ্যান করিলেন। আমি কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া পিসতত ভাই জগৎকে লইয়া এক পার্শ্বে গেলাম। পিতৃব্য মহাশয় তাহার উপর কত বাক্যাস্ত্র ও কটাক্ষাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সে আমার উপযুক্ত ভাই। শুনিলাম পূর্ব্ব বরপক্ষে

কন্যা হরণের জন্য ভাবী পত্নীর মাতুল ও ভগ্নীপতির নামে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। দেশটা উলট পালট হইতেছে। সমুদয় দেশীয় বিদেশীয় ভদ্র লোকেরা দুই দলে বিভক্ত। মহা যুদ্ধ চলিতেছে। এসকল কথা বলিয়া সে নির্ভয় হৃদয়ে বলিল—"আপনি কোন ভয় করিবেন না। আমার মামার প্রতাপে সকলই উড়িয়া যাইবে।"

আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তীরে উঠিলাম। তীরে লোকে লোকারণ্য। কত বন্ধু, অবন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত, লোক আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে লোক সারি সারি; সকলের অঙ্গুলি আমার দিকে, কেহ বলিতেছে "বিদ্যাসুন্দর", কেহ বলিতেছে "সাবিত্রি সত্যবান", কেহ বলিতেছে "নল দময়ন্তী", কেহ বলিতেছে "সীতা হরণ।" কত অপূর্ব্ব উপাখ্যানই সৃষ্ট হইয়াছে—আমাদের আশৈশব প্রেম, ঢাকায় দুজনে এক সঙ্গে পড়িতাম, খেলিতাম, বুড়ী গঙ্গায় সাঁতার দিতাম, জন্মাষ্টমীর মেলা দেখিতাম। তিনি রাঁধিয়া দিতেন আমি খাইতাম। উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম—"তুমি রাধা, আমি শ্যাম"। অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাব হইলে দশ বৎসরের নায়িকা অশ্রুজলে একটা পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে গেলে তিনি লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন —"আমাকে যে বিবাহ করিবে সে কলিকাতায়।" তিনি রুক্মিণীর মত আমার কাছে স্বহস্তে লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। তাই আমি আসিতেছি। আমার সমবয়স্ক বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া যাইতে যাইতে এরূপ কত মনোহর উপাখ্যানই শুনিলাম। বালিকার বিপন্ন মাতুল মহাশয় পথ চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার বাসার কাছ দিয়া যাইতে তিনি রোরুদ্যমান ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমাদের যাহা হইবে, হউক। তুমি আসিয়াছ, আর ভয় নাই।" বাসায়

পঁহুছিলাম। পিতা টাকা কর্জ্জ করিতে ও নিমন্ত্রণ করিতে বহির্গত হইয়াছেন। দুই দিন পরে বিবাহ। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কত লোক, কত কথা, কত ছন্দে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি ম্রিয়মাণ। পিতা ফিরিলেন। আমি সে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিলাম। আজ আটত্রিশ বৎসর আমি সেই স্বর্গ-সুখ হইতে—অশ্রু সরিয়া যাও, দেখিতে পারিতেছি না,—সে মহাতীর্থ দরশন ও পরশন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি! পিতা গলদশ্রু নয়নে ললাট চুম্বন করিয়া বুকে লইয়া বলিলেন—"তুই কোন চিন্তা করিস না। কুলমাতা ও ইষ্ট দেবতা আমাদের সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। যেমন নাম, মেয়েটি তেমনি লক্ষ্মী। আমি বড় সুখী হইয়াছি। কেবল আমার এক দুঃখ। সময় নাই, আমি মনের মত উৎসব করিতে পারিলাম না।" পিতা পুত্রের সম্মিলিত অশ্রুতে পিতার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছিল। দর্শকগণেরও চক্ষু ভিজিল। যে চিন্তার মেঘে আমার হৃদয় ছাইয়াছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে উড়িয়া গেল।

বাড়ী গেলাম। সরলা স্নেহময়ী মাতা বড় নিরাশ হইয়াছিলেন। কোথায় একটা বড় মানুষের কন্যা বিবাহ করিয়া যৌতুকে ঘর ভরাইব, না একটা "কাঙ্গালিনীর কন্যা"—মা এই নামে তাহাকে অভিহিতা করিতেন—বিবাহ করিতে চলিলাম। তথাপি প্রথম পুত্রের বিবাহ-আনন্দে মার প্রাণের সে নিরাশা চাপা পড়িল। পাছে পথে বিপক্ষ কোন বিভ্রাট ঘটায়—অনেক গল্প উঠিয়াছিল—পিতা স্বয়ং কন্যা আনিতে গেলেন। আমাদের বংশের বর শ্বশুরবাড়ী বিবাহ করিতে গেলে এত আড়ম্বরে, এত লোক সঙ্গে লইতে হয়—আমাদের "ছত্রিশ জাতি" প্রজা আছে—যে 'কাঙ্গালিনীর' কথা দূরে থাকুক, অর্থশালী লোকও চোট্ সামলাইতে পারে না। এ জন্য আমাদের বংশের অধিকাংশের বিবাহ

নিজ বাড়ীতে হয়। শাশুড়া এক হস্তে কন্যাকে, ও অন্য হস্তে তাঁহার সাত বৎসরের অনাথ শিশুকে পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। ইহাই আমার বিবাহের যৌতুক! পিতা তখন এরূপ ঋণজালগ্রস্ত যে আমার শিক্ষাভার বহন করাও কষ্টকর হইয়াছে। তথাপি অম্লান বদনে বলিলেন "—ঠাকুরাণি! আজ হইতে এই পুত্রও আমার হইল।" এ হৃদয় কি মানুষের?

পিতার প্রতাপান্বিত নাম, বিপক্ষেরা চুঁ শব্দ করিল না। পিতা মাতার অশ্রুজলে আমার শুভ বিবাহ আড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইল। মাতার অশ্রুর কারণ—যৌতুকের স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। পিতার অশ্রুর কারণ—তিনি সময়াভাবে আরও অধিক ঋণ করিয়া, আরও অধিক আড়ম্বর করিতে পারিলেন না। এরূপে ১৮৬৫ ইংরাজি নবেম্বর (কার্ত্তিক) মাসে আমার সংসার জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইল। আমার বয়স তখন উনিশ, স্ত্রীর দশ। চত্বারিংশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। হায় মা! তোমাদের পবিত্র অশ্রু কতবার মনে পড়িয়াছে। ভাবী ঘটনার ন্যায়, সময়ে সময়ে—"ভাবী জীবনের ছায়া পড়ে পুরোভাগে"।

—০—

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

আমার বিবাহ বিভ্রাটের একটি প্রত্যক্ষ ফল অবিলম্বে ফলিয়াছিল ইহাও আমার এক উদ্দেশ্য ছিল। আমার বিবাহের পরদিন হইতেই দেশের ভদ্র লোকেরা আপনার কন্যাদিগকে পাঠশালায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। এত দিন অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক বক্তৃতা করিয়া, অনেক সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়া একটি বালিকারও লেখা পড়া আরম্ভ করাইতে পারি নাই। এরূপ প্রস্তাব করিলেই অভিভাবকেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিতেন—"কেন? মেয়েদের লেখাপড়ার কি প্রয়োজন? তাহারা কি চাকরি করিবে?" চাকরি করাই যে এই হতভাগ্য দেশে লেখাপড়া শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা বোধ হয় এখন দেশব্যাপী বিশ্বাস। তাহার উপর সকলের স্থির বিশ্বাস লেখা পড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে, দুশ্চরিত্র ত হইবেই। আমিও তখন একজন ক্ষুদ্র "সমাজ সংস্কারক"। বুঝিলাম—Example teaches better than precepts বক্তৃতায় এ "কুসংস্কার রাক্ষসী" মরিবে না। তাহার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র চাই। গণনার ভুল হইল না। এই বিবাহ-বিভ্রাট ব্রহ্মাস্ত্রে পাপীয়সী প্রাণে মারা পড়িল। অভিভাবকেরা বুঝিলেন যে ঘোর কলি উপস্থিত,—ঘটকালির স্থলে নির্ব্বাচন-প্রণালী! কোথায় বিবাহের পঞ্চবর্গ—রূপ, গুণ, ধন, কুল, ও মিষ্টান্ন, মুষ্টিমুদ্রা (আমার পিতৃব্যদের সংস্করণ মতে), আর সব উড়িয়া গিয়া এখন লেখা পড়া। তাঁহারা দেখিলেন লেখা পড়া না শিখাইলে আর এই 'শিক্ষিত' যুবকদের কাছে মেয়ে বিকাইবে না। অতএব স্ত্রী-শিক্ষা খরস্রোতে চলিতে আরম্ভ হইল এবং ধূমের দ্বারা যেমন পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রতিপাদিত হয়, যদি লেখা পড়ার দ্বারাও

স্ত্রী-শিক্ষা প্রমাণিত হয় তবে আজ দেশ স্ত্রী-শিক্ষায় টলটলায়মান। যদি অশিক্ষিতা শাশুড়ীর, কি আত্মীয়ার কি শিক্ষিত 'প্রিয়তমের', ঘাড়ে গৃহকর্ম্ম, এমন কি সন্তান প্রতিপালন পর্য্যন্ত, চাপাইয়া দিয়া বাঙ্গালার উপন্যাস ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ করাই শিক্ষা হয়, তবে আজ দেশ স্ত্রী-শিক্ষায় টলটলায়মান। যদি কথায় কথায় সূর্য্যমুখীর মত গৃহত্যাগ, কুন্দনন্দিনীর মত বিষপান, ভ্রমরের মত দারুণ অভিমান, স্ত্রী-শিক্ষা হয়, তবে আজ স্ত্রী-শিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি বিমলার চতুরতা, গিরিজায়ার চটুলতা, এবং আসমানীর বণিকতার অনুকরণ স্ত্রী-শিক্ষা বল, তবে আজ স্ত্রী-শিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি অহোরাত্রি স্বামীর দোষ অনুসন্ধান ও তস্য শাসন, উপন্যাসোদ্ধৃত তীব্র বাক্যানলে তস্য অস্থি মজ্জা দাহন, পরিবারবর্গের মর্ম্ম-পীড়ন স্ত্রী-শিক্ষা, তবে আজ স্ত্রী-শিক্ষায় সত্য সত্যই দেশ টলটলায়মান। যদি সংসারে অসচ্ছলতা, হৃদয়ে অশান্তি, কর্ত্তব্যে ভ্রান্তি, স্ত্রী-শিক্ষার ফল হয়, তবে আর ভাবনা নাই, আজ স্ত্রী-শিক্ষায় দেশ টলটলায়মান।

সে দিন বাড়ী গিয়াছিলাম। শ্রাবণ মাস,—চৌদ্দ বৎসর পর শ্রাবণ মাসে বাড়ী গিয়াছিলাম। কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে সমস্ত শ্রাবণ মাস মনসা দেবীর মূর্ত্তি সকল ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে স্থাপিতা হইত; সন্ধ্যার সময়ে গ্রামটি মনসা-পুঁথি পাঠের উচ্চ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী তাহা মহা সমারোহে পঠিত হইত। সেরূপ অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বৎসর বাড়ী বাড়ী রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন পাঠ হইত। এক এক জন কি মধুর কণ্ঠে কি ভাবতরঙ্গ তুলিয়া সে সকল পবিত্র কাব্য পাঠ করিতেন। নবীনা, প্রবীণা, বালবৃদ্ধ দিবসের কার্য্য সারিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে সকল উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে শোকে ও ভক্তিতে অশ্রুবর্ষণ করিতেন, এবং প্রেমে

পবিত্রিত, বীরত্বে উদ্দীপিত, পুণ্যে মোহিত, পাপে রোমাঞ্চিত হইতেন এই মহাগ্রন্থ সকল তাঁহাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের শোণিতে শোণিতে সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাদের শরীর ও চরিত্র গঠন করিত, এবং কর্ম্মে নিষ্কামতা, ধর্ম্মে ভক্তি, অবিচলতা, অধর্ম্মে ঘৃণার পরাকাষ্ঠা, পুণ্যে প্রবৃত্তি, পাপে নিবৃত্তি, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, সতীত্বে সুখ, শিক্ষা দিত। এমন উচ্চ শিক্ষা, তাহার এমন সহজ উপায়, তাহার এমন দেশব্যাপী সুফল, আর কোনও দেশ কি কখনও দেখাইতে পারিয়াছে? এখন মনসা দেবী কোন কোন বাড়ী আসিয়া থাকেন। কিন্তু মনসা-পুথি ও অন্য পুথি পাঠ একরূপ বন্ধ হইয়াছে। মনসা-পুথি শুনিবার জন্য আমি দেশ খুঁজিয়া লোক সংগ্রহ করিলাম। দেখিলাম আমার বাল্যকালে যাহারা পাঠক ছিল, তাহাদের মধ্যে এখন দুই চারি জন যাহারা জীবিত আছে, তাহারাই এখনকার খ্যাতনামা পাঠক। তাহাদের উত্তরাধিকারী কেহ আর গ্রামে জন্মে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম,—"দেশে পুথি কে শুনে যে পাঠ করিতে কেহ শিক্ষা করিবে? কোন বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এখন আর এ সকল পুথি শুনে না।" বুঝিলাম স্ত্রী-শিক্ষায় দেশ যথার্থই টলটলায়মান। এ সকল পুথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। সীতার স্থান সূর্য্যমুখী, রামচন্দ্রের স্থান সীতারাম সাবিত্রীর স্থান কুন্দনন্দিনী, বিপুলার স্থান বিমলা, শ্রীকৃষ্ণের স্থান সত্যানন্দ অর্জ্জুনের স্থান জীবানন্দ, গ্রহণ করিয়াছেন। ভরত লক্ষ্মণের স্থান শূন্য কাযে কাযেই কেবল স্ত্রী-শিক্ষায় নহে পুরুষ-শিক্ষায়ও দেশ টলটলায়মান তবে আমার এক মাত্র সান্ত্বনা এই যে এই শিক্ষা বিভ্রাটের জন্য কেবল আমার বিবাহ বিভ্রাট দায়ী নহে। দায়ী সেই মহামান্য শিক্ষাবিভাগ ও বাঙ্গালার উপন্যাস।

বন্ধুর ঈর্ষা।

"কি করি শকুনী মামা! বল না করি মন্ত্রণা,
পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য দেখি প্রাণ ত বাঁচে না।"

সত্য সত্যই পিতার প্রতাপে সকল বিপদ উড়িয়া গেল। ফৌজদারী মোকদ্দমার আর কিছু শুনা গেল না। পুলিশ না কি রিপোর্ট করিয়াছিল 'কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না।' শিবলাল বাবু এক জন ক্ষমতাশালী কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার। তিনিও অন্য পক্ষে ছিলেন। এ শুভ-বিবাহের ছয় বৎসর পর যখন রাজকার্য্যে দেশে নিয়োজিত হইয়া আসিলাম তিনি এক দিন কথায় কথায় বলিতেছিলেন—"তোমার পিতার কি দেশব্যাপী প্রতাপ ও প্রভুত্ব ছিল তাহা আমি সে মোকদ্দমায় বুঝিয়াছিলাম। এরূপ একটা অত্যাচার হইল, অথচ আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। দেশের একটি লোক আমাদের দিকে হইল না।" এদিকে অধিকাংশই পিতার প্রতাপে ঈর্ষান্বিত বিদেশীয় লোক ছিলেন। কিন্তু বড় সুখের বিষয় যে যাঁহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তাঁহাতে আমাতে কখনও কোন মনান্তর ঘটে নাই। তিনি আজ দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর অর্থ ও পদ সম্পন্ন লোক এবং আমার একজন পরম বন্ধু। এ ঘটনার সময় তাঁহার সহিত আমার পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। তবে তিনি বয়সে আমার বড় এবং তখনও একজন যোগ্য লোক বলিয়া পরিচিত; সংসার ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়া কেবল আপনার মানসিক শক্তিবলে ভাসিয়া উঠিতেছিলেন। অতএব তিনি বুঝিয়াছিলেন এই বিভ্রাটে তিনি ও আমি উভয়েই নির্দ্দোষী। দোষী কেবল সেই অঘটন ঘটনকারী প্রজাপতি ঠাকুর।

বিবাহের পর সহরে আসিয়া সাত দিন ছিলাম। তখনও আন্দোলন অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে। আমি দিনে গৃহের বাহির হইতাম না। তাহাতেও কি রক্ষা, কত লোক বাবাকে পর্য্যন্ত আমার বিখ্যাতা স্ত্রীর এবং বিখ্যাত বিবাহের গল্পের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিত। স্ত্রী সেই বালিকা বয়সেই এমন বুদ্ধিমতী ও চতুরা যে ইতিমধ্যেই পিতা মাতার পরম আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন। পিতার মুখে তাঁহার প্রশংসার স্রোত বহিত। আমি সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইলে রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানে ও বাসায় আমাদের প্রণয়ের কত অপূর্ব্ব গল্পই শুনিতাম। ব্যক্তিগত বৈচিত্র যাহাই থাকুক, মনুষ্যসমাজও বালকের মত কল্পনাপ্রিয়। বোধ করি সেই জন্যই পৌত্তলিক। কিন্তু বড় সুখের কথা যে এ সকল গল্পে কুৎসা কিছুই ছিল না। থাকিবার কথাও নহে।

সেই অভাবটুকু আমার শিক্ষিত সহপাঠীগণ কলিকাতায় বসিয়া পূরণ করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত ছিলেন এবং নিরক্ষরা স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আমার এ বিবাহে মত ছিল না। তখন "শিক্ষিতা স্ত্রী" এমন একটি "পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য" মধ্যে পরিগণিত ছিল যে আমি চট্টগ্রাম চলিয়া আসিলে তাঁহাদের একটা ঘোরতর গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। আমার ও বালিকা ভার্য্যার উদ্দেশে এক শব্দভেদী শর ত্যাগ করিলেন। হঠাৎ এক দিন "চট্টগ্রাম স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রতি আগে" এক বিনামা পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ছাত্রগণের কাছে বড় প্রিয় ছিলাম। বলিয়াছি আমি সকল শ্রেণীর ছাত্রগণের সেনাপতি ছিলাম। তাহাদের সঙ্গে খেলিতাম, গান শুনিতাম, তাহাদের পড়া বলিয়া দিতাম, গরিব ছাত্রদের দুঃখে কাঁদিতাম, যথাসাধ্য সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ সাহায্যও করিতাম। নিম্নশ্রেণীর সে সকল ছাত্র এখন প্রথম শ্রেণীতে। পত্র

পাইয়া তাহারা চটিয়া লাল। আমি সহরে গেলে পত্রখানি আমাকে আনিয়া দিল। তাহাতে "ট্রোজন" যুদ্ধের সঙ্গে আমার বিবাহের তুলনা করিয়া রসিকতা করা হইয়াছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সহপাঠীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি কাহারও ছিল না, রসিকতার ধার কেহ ধারিতেন না। কাযে কাযেই পত্রখানি ইতর ও পচা রসিকতাপূর্ণ ছিল। তাহার সুদ সহ প্রতিশোধ দিয়া ছাত্রগণ "কলিকাতাস্থ চট্টগ্রামী ছাত্রদের সমীপে" এক প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন। উভয় পত্র দেখিয়া আমি বড় হাসিলাম। বন্ধুদিগের এ হেন ব্রহ্মাস্ত্র বায়বাস্ত্রে উড়িয়া গেল। ছাত্রগণকে ভারতচন্দ্রের সেই মহাবাক্য স্মরণ করাইয়া দিলাম,—

"নীচ যদি উচ্চ ভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে"

তখন সকলেই নূতন 'কপাল কুণ্ডলা' পড়িয়াছে। বঙ্কিম বাবুর সেই মহাবাক্যও স্মরণ করাইয়া দিলাম—"পাঠক! তুমি অধম, তাহা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" এরূপ শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণের দ্বারা ছাত্রগণকে প্রত্যস্ত্রত্যাগ হইতে নিরত করিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া গেলাম।

পত্রখানি যাহার লেখা, আমি বুঝিয়াছিলাম রচনা তাহার নহে। লেখক সিদা ছেলে। বাসায় পঁহুছিয়া তাহাকে গোটা দুই ব্যঙ্গোক্তি করিলে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং সকল রহস্য ভেদ করিয়া দিল। তখন শুনিলাম এ মহাপত্রের ব্যাস আমার দাদা মহাশয়, গণেশ আমার পরম বন্ধু চন্দ্রকুমার। পৌরাণিক সময়ে 'নকল নবিশ' ছিল না, কারণ হাতের লেখা ধরা পড়িবার ভয় ছিল না। এই ঐংরাজিক সময়ে নকল নবিশ সর্ব্বেসর্ব্বা। গরিব নকল নবিশ আমার মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গোক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"ও চন্দ্রকুমার বাবু ও অখিল বাবু! এখন চুপ করিয়া রহিলেন কেন?" তাঁহারা ও

বিবাহিত সহ-অধ্যায়ীগণ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে পড়িতে লাগিলেন। অবিবাহিত সহ-অধ্যায়ীগণ মুখ টিপিয়া, কেহ বা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল—দৃশ্যটি বড় Serio-comic বা লঘু গম্ভীর হইয়া উঠিল। চন্দ্রকুমার একেবারে মর্ম্মান্তিক লজ্জিত হইয়া সন্ধ্যার পর নির্জ্জনে ছাতের উপর আমার কাছে গিয়া বসিল এবং বলিল,—"আমি কি যে অন্যায় করিয়াছি পত্রখানি প্রেরিত হইবার পর আমি বুঝিয়াছি। আমি অখিল বাবুর তাড়নায় ভ্রান্ত হইয়া এরূপ করিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিবে। তুমি যদি তাহাতে মনঃ কষ্ট পাইয়া থাক, তবে আমাকে ক্ষমা কর।" আমি বলিলাম—"পত্রে আমি কষ্ট পাই নাই, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি; তবে কষ্ট পাইয়াছি তোমার মনের ভাব দেখিয়া। আমি তোমাকে যেরূপ প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি, তুমি আমাকে যে সেরূপ ভালবাস না, এই প্রথম পরিচয় পাইলাম। তোমার মনের কোণায় কোথায় যেন অলক্ষিত ভাবে একটুকু ঈর্ষা লুকাইয়া আছে। কেন ভাই! আমি ত লেখা পড়া কিছুতেই তোমার সমকক্ষ নহি, কখনও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারি নাই। তোমাকে আমার গুরু ও অভিভাবকের মত জানি। তোমার মনে এমন ভাব হইবে কেন?" চন্দ্রকুমার বলিল, তাহার ভুল হইয়াছে। আমিও বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে, বাসায় আমার বিবাহের আন্দোলনের তরঙ্গে পড়িয়া চন্দ্রকুমারও ভুল করিয়াছে। কিন্তু এ জীবনে আরও দুই এক বার এরূপ সন্দেহ হইয়াছে, অন্য লোকেরও হইয়াছে। আমি এখনও বুঝিতে পারি না চন্দ্রকুমারের আমার প্রতি মনের ভাব এরূপ হইবে কেন? তাহার অনিচ্ছায় সময়ে সময়ে কথঞ্চিৎ ঈর্ষার দাগ তাহার পবিত্র হৃদয়ে পড়িবে কেন? চন্দ্রকুমারের কোন সুখের, সৌভাগ্যের

সৎকর্ম্মের কথা শুনিলে আমার ত হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। চন্দ্রকুমারকে আমি এই বয়সেও একটি দেবতার মত পূজা করি।

পর দিনই First Art পরীক্ষা আরম্ভ হইল। আমি ত এক মাস কিছুই পড়িতে পারি নাই। শুনিলাম এই এক মাস চট্টগ্রামের মত কলিকাতাস্থ চট্টগ্রামী উপনিবেশটিও উলট পালট হইয়া গিয়াছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল আমার বিবাহের কথা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন ও সমালোচনা। কখন কখন ঘোরতর বিবাদ ও হাতাহাতি। পড়াশুনা এক প্রকার বন্ধ। তাহার এক ফল,—সেই মহাপত্র। দ্বিতীয় ফল—পরীক্ষার নিষ্ফলতা। যদিও প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইলাম বটে, কিন্তু আমি কি চন্দ্রকুমার কেহই বৃত্তি পাইলাম না। জগবন্ধু ঢাকা গিয়াছিল। সে এই আন্দোলনের তরঙ্গে পড়ে নাই। কেবল জগবন্ধু বৃত্তি পাইল; পাইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিল।

নৌযাত্রা।

"হংস ডিম্ব হেন ডিঙ্গা মধুকর ভাসে,
ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে।
ঘুরনিয়া জলে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক,
পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুম্ভকারের চাক।"

কবিকঙ্কণ।

পরীক্ষার পর সকলে বাড়ী চলিলাম। দেশের একজন ভদ্রলোক দোকানদার এক 'বালাম' নৌকায় তাহার জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন এবং কিঞ্চিৎ কবি কল্পনা খাটাইয়া আমাকে বলিলেন যে, নানা দেশ দেখিতে দেখিতে নাচিতে নাচিতে সাত আট দিনে গিয়া দেশে পৌঁছিব। আমিও মনে করিলাম সমুদ্র-পথে যাইতে কেবল জল ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। কেবল নীলাম্বুর পশ্চাতে নীলাম্বু, তাহার পশ্চাতে নীলাম্বু! অতএব এবার এ পথে যাইতে আমারও বড় সাধ হইল। তাহার উপর বাঙ্গালী unadventurous বলিয়া চির-নিন্দিত, সে কলঙ্কও দূর হইবে। চন্দ্রকুমারকে আমি কবিত্বপূর্ণ ছবি দেখাইয়া অনেক অনুনয় করিয়া সম্মত করিলাম। তিনিও সঙ্গী হইলেন। আর হইলেন সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ষষ্ঠী। তাহাকে আর বিশেষ কিছু বলিতে হইল না। কেবল পথে পথে কামিনীর গল্প করিব বলাতে প্রেমিক পুরুষ হাসিতে হাসিতে অধীর হইয়া বলিল—"yes আমিও তোমার সঙ্গে go করিব। ষ্টিমারে যাওয়া good thing নহে।" অন্য সহপাঠীদের অদৃষ্ট ভাল, তাহারা ষ্টিমারে গেল। ষষ্ঠী তাহাদিগকে বাঙ্গালীর adventure হীনতা লইয়া প্রত্যেক কথায় এক এক "আজ্ঞা" বসাইয়া তাহার না ইংরাজি না বাঙ্গলা ভাষায় অনেক বক্তৃতা ও উপহাস করিল।

বেলেঘাটা হইতে তরী গজেন্দ্রগমনে চলিল। বরিশাল ফেলিয়া গেলাম। নূতন নূতন স্থান দেখিতে বেশ একটুকু আমোদ বোধ হইতে লাগিল। কেবল "ঝালকাটিতে" সিঁড়ির উপর বসিয়া স্নান করিবার সময় ঘটী পড়িয়া গেলে আমি তাহার পশ্চাতে ঝাঁপ দিলাম। ঘটী উদ্ধার করা দূরে থাকুক, আমি বিশাল নদীর খরস্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। তবে আমি সন্তরণপটু, শিকারপটু ও ক্রীড়াপটু ছিলাম। অতি কষ্টে সাঁতারিয়া বহুদূর ভাসিয়া গিয়া কূল পাইলাম। তাহার পর নিরাপদে স্বনামখ্যাত নাবিকাতঙ্ক "জালছিড়াতে" উপস্থিত। "জালছিড়া" চর সমাচ্ছন্ন বঙ্গোপসাগরের একটি সঙ্কটপূর্ণ অংশ। অতি প্রভাতে ভাটায় পাড়ী আরম্ভ করিয়া প্রায় 'বামনির' উপকূলে পঁহুছিয়াছি সকলের মুখ শুষ্ক, ভয়ে প্রাণ গতিহীন। মাঝি মাল্লাগণ প্রাণপণ করিয়া নৌকা চালাইতেছে। আর দুই চারি মিনিট সময় পাইলে কূল পাইয়া খালে প্রবেশ করিতে পারি। এমন সময়ে দূর হইতে গর্জ্জন করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ উর্দ্ধফণা অযুত ভুজঙ্গের মত জোয়ারের বিশাল তরঙ্গশ্রেণী আসিতে লাগিল। মাঝিগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। জোয়ারের আঘাতে আমাদের হালি ভাঙ্গিয়া গেল; মাঝিগণ "আল্লা আল্লা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং "ঘুরণিয়া জলে ডিঙ্গী ঘন পাক" দিতে দিতে জোয়ারের মাথায় সমুদ্রের দিকে ছুটিল। আমাদের মহা বিপদ দেখিয়া যে সকল তরী তীরে লাগিয়াছিল, তাহাদের আরোহীগণ হাহাকার করিতে লাগিল ও দক্ষ মাঝিগণ "পাল তুলিয়া দে। পাল তুলিয়া দে!"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দোকানদার মহাশয় মাথা কুটিয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ও চন্দ্রকুমার নীরব স্তম্ভিত। চন্দ্রকুমারের চক্ষে জলধারা নীরবে বহিতেছে। বিপদে আমি তাঁহার অপেক্ষা সাহসী ও

স্থির। আর ষষ্ঠী? ষষ্ঠী কাঁদিতে কাঁদিতে একবার দাঁড় টানিতেছে, একবার "ভাই! কি হইল" বলিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিতেছে। ঘোরতর বিপদের সময় না হইলে সে মূর্ত্তি ও তাহার কার্য্য দেখিয়া কাহার সাধ্য না হাসিয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক মাঝিগণ পাল তুলিয়া দিলে, নৌকা বহুদূর পশ্চাত সরিয়া গিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তীরে লাগিল। সেখান হইতে নৌকার 'বহর' প্রায় তিন মাইল। বহরের এক নৌকায় একজন মুনসেফের সেরেস্তাদারকে দেখিয়াছিলাম। অগত্যা তাঁহার নৌকায় আমরা তিনজন যাইব স্থির করিয়া আমি তাঁহার নৌকার অন্বেষণে চলিলাম। নৌকায় গিয়া শুনিলাম তিনি প্রায় দুই মাইল ব্যবধান এক গ্রামে আহার করিতে গিয়াছেন। সেখানে গেলাম। তিনি রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বিপদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন। "তোর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তুই স্নান করিয়া আহার কর"—বলিয়া এক বাটি তৈল আমার মাথায় ঢালিয়া দিলেন। আমি বলিলাম আমার সঙ্গীদের উপবাস ফেলিয়া আমি আহার করিব না। লোকটি আমার পিতার আশ্রিত ছিলেন, বড় জিদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৌকায় যাইব স্থির করিয়া আমি আহার না করিয়া চলিয়া গেলাম। এখন আর এক বিপদ। যে সকল চরস্থ খাল আমি কাদা হাঁটিয়া পার হইয়া আসিয়াছিলাম এখন জোয়ারের জলে তাহারা বিস্তৃত নদী হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি ত আমি সাঁতারিয়া পার হইলাম। কিন্তু শেষটি এত বিস্তৃত ও স্রোত এত প্রখর, এবং সমুদ্রের এত নিকট যে সাঁতারিয়া পার হওয়া অসম্ভব। পৌষ মাস, সন্ধ্যা সমাগত, গ্রাম বহুদূর। সমস্ত দিবসের, বিপদে, অনাহারে ও পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। আবার যে সে সকল নদী সন্তরণ করিয়া গ্রামে যাইব সে শক্তি নাই। সূর্য্যদেব

জলন্ত সুবর্ণ কলসির ন্যায় সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিলেন। তাহা দেখিতে দেখিতে, বস্ত্রহীন সিক্ত দেহে পৌষের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্ত দিনের মধ্যে প্রথম আমার চক্ষে জল আসিল। স্নেহপ্রতিমা মাতা ও পিতার মুখ মনে পড়িতে লাগিল, নব বিবাহিতা বালিকা ভার্য্যার মুখ, ছোট ভাই ভগিনীদের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। নদীর অপর পারে আমাদের নৌকা দেখা যাইতেছিল। সঙ্গীগণ আমার বিপদ দেখিয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। কি বলিতেছেন কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। কোনও উপায় না দেখিয়া স্থির গম্ভীর ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ভগবানকে ডাকিতেছি, এমন সময়ে কোথা হইতে একখানি ঘাসভরা নৌকা আসিল। উহা প্রকৃতই আমার পক্ষে রবি বাবুর সোণার তরী হইল। বহুদুর জল ভাঙ্গিয়া গিয়া সেই নৌকায় উঠিয়া অবশেষে নদী পার হইলাম। শুনিলাম নৌকার হালি মেরামত হইয়াছে। আমরা রাত্রিতে নৌকা খুলিলাম, পর দিন দ্বিপ্রহর সময়ে সীতাকুণ্ডের সম্মুখে সমুদ্র তীরে পঁহুছিলাম। সমুদ্র হইতে প্রভাত অবধি চন্দ্রশেখর শৈলমালার পূর্ব্ব আকাশ সীমায় কি অবর্ণনীয় শ্যামল তরঙ্গায়িত শোভাই দেখিতেছিলাম। নয় দিন অতীত হইয়া গিয়াছে; এখান হইতে নৌকায় চট্টগ্রাম সহরে যাইতে শুনিলাম আরও তিন চারি দিন লাগিবে। তখন দোকানদার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সেখান হইতে হাঁটিয়া যাইব স্থির করিলাম। কারণ নৌকায় আহার্য্য কিছুই নাই, দুই তিন দিন যাবৎ প্রায় উপবাসেই কাটাইয়াছি। হাতে টাকা পয়সাও কিছুই নাই। কোথায় সাত দিনে চট্টগ্রাম পঁহুছিব, আর কোথায় বার তের দিন! প্রস্তাব আমার; সঙ্গীরাও নিরুপায় হইয়া সম্মত হইলেন। দুই তিন মাইল হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর সীতাকুণ্ডে পঁহুছিলাম। সেখানে আমাদের দুইটি পৈতৃক বাসাবাড়ী আছে। তাহাতে

আমাদের পুরোহিত অনুন একজন সর্ব্বদা থাকেন, শম্ভুনাথ বাড়ীতে নিত্যপূজা দিবার জন্য ইঁহাদের ব্রহ্মোত্তর আছে। আমরা যেন আকাশ হইতে খসিয়া পড়িয়াছি—পুরোহিতগণ দেখিয়া একেবারে অবাক্। শেষে সীতাকুণ্ডে একটা হুলুস্থূল হইবার উপক্রম হইল। সকলে বলিলেন প্রাতে মোহান্তের হাতী ঘোড়া আনাইয়া দিবেন। আমরা তাহাতে যাইব। কিন্তু আমাদের মনে এক ভয় হইল। আমি ও চন্দ্রকুমার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে এরূপ কাঙ্গালের বেশে সীতাকুণ্ডে আসিয়া একটা হুলুস্থূল করিয়া গেলে আপন আপন পিতার কাছে বড় তিরস্কারভাজন হইব। অতএব অর্দ্ধ রাত্রিতে যখন চন্দ্রোদয় হইল, আমরা নিঃশব্দে সীতাকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া চলিলাম। সর্ব্বাগ্রে আমি, পশ্চাৎ চন্দ্রকুমার, মধ্যে বষ্ঠী। সে আগে কি পিছে চলিবার লোক নহে। শৈলমালার পদমূল বাহিয়া পথ চলিয়াছে। চন্দ্রালোকে নীরব গিরিশ্রেণী, পাদমূলস্থ অটবীসমাচ্ছন্ন গ্রাম, দীর্ঘ রজত সূত্রের মত পথ, ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ নানাবিধ শস্যশোভিত ক্ষেত্র সকল খণ্ডে খণ্ডে, কি শোভাই বিকাশ করিতেছিল। আশৈশব আমি প্রকৃতির উপাসক! আমার হৃদয় এরূপ আনন্দে উচ্ছ্বসিত যে পথশ্রম আমার কাছে কিছু বোধ হইতেছিল না। শীতকালে এ পথে ব্যাঘ্রের ভয়। তাহার উপর বষ্ঠীর ভুতের ভয় ত আছেই। অস্ত্রের মধ্যে আমার হাতে একটি কাষ্ঠের প্রকাণ্ড বাঁশি। যখন পর্ব্বতের বড় নিকটে আসিয়া পড়ি, যখন অন্য পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষশ্রেণীর নিবিড় ছায়ার অন্ধকারে প্রবেশ করি, তখন বষ্ঠী ভয়ে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে। আমি উচ্চ-হাসি হাসিয়া খুব উচ্চৈস্বঃরে বাঁশি বাজাই ও পর্ব্বততরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলিতে থাকে। কখন বা পার্শ্বের দোকানের ভগ্ন-নিদ্র দোকানদার তজ্জন্য কিঞ্চিৎ মিষ্ট সম্ভাষণ করে। একে আমরা তিন জনই

বালক, তাহাতে কখনও দূরপথ হাঁটিয়া যাই নাই। চলিতে পারিব কেন? দুই তিন ক্রোশ যাইতে যাইতেই পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গেল। তখন জুতা খুলিয়া পদাতিক মহাশয়দের মত চাদরের দ্বারা কোমর বাঁধিয়া লইলাম। ক্বচিৎ দুই একজন পথিকের সঙ্গে, দুই একখানি গরুর গাড়ীর সঙ্গে দেখা হইতেছিল। তিনটি এরূপ আকৃতির বালক এরূপ ভাবে চলিতেছে দেখিয়া তাঁহারা সকলে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর না পাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কেহ বা গালি দিলেন। ঊষা দেবী যখন আপন মনোহারিণী শোভা পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে ভাসাইতে লাগিলেন, আমরা কুমিরা ষ্টেশনের সমক্ষে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পুলিশ সব-ইন্‌সপেক্টার মহাশয় মুখ ধুইতে আসিয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন ও গ্রেপ্তার করিলেন। তিনি বলিলেন তিনি আমার পরোপকারী পিতার কাছে অশেষরূপে উপকৃত। তিনি আমাদিগকে পাল্কি করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। আমাদের অবিলম্বে সহরে পঁহুছিবার বিশেষ প্রয়োজনতাব্যঞ্জক এক উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে বহু কষ্টে অব্যাহতি লাভ করিয়া আমরা তখনই আবার চলিলাম।

ব্যাঘ্র-ভয়ে ও ভুত-ভয়ে ষষ্ঠী সমস্ত রাত্রি নীরব ছিল। যেই প্রভাত হইল তাহার মুখে শতমুখী গালির স্রোতস্বতী বহিতে লাগিল। ষষ্ঠী একজন ছোটখাট গালির ভগীরথ। পূর্ব্ব বাঙ্গলা, পশ্চিম বাঙ্গলা, তাহার মধ্যে মধ্যে ইংরাজি সমন্বিত সে গালি এক অপূর্ব্ব জিনিস। আমি তাহার সকল বর্ত্তমান দুঃখের মূল। অতএব গালির স্রোত অজস্র ধারায় আমার মস্তকে বহিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে "আমার বড় ক্ষিধা পাইয়াছে, আমি না খাইলে যাইতে পারমু না," বলিয়া বসিয়া পড়িল। সম্মুখে

মদনের হাট। পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের মত চিড়া ও মাটি কাঁকর মাছি মিশ্রিত গুড়। এই উভয় উপকরণে তাহার এক কচ্ছি পুরিয়া দিলে যষ্ঠী চলিতে লাগিল। বাম হাতে অর্দ্ধখোসা-মুক্ত পক্ক রম্ভা, ও দক্ষিণ হস্ত কচ্ছে, উহা মুখ গহ্বরে দ্রুতবেগে উঠিতেছে পড়িতেছে। রাস্তার লোক যে দেখিতেছে সে একবার না হাসিয়া যাইতেছে না। চট্টগ্রাম সহরের প্রবেশ-পথে চক্রাকারে এক গিরিশ্রেণী দুর্গবৎ দাঁড়াইয়া আছে। তাহা ভেদ করিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। নাম 'খুলসি'। যষ্ঠীর আহার ফুরাইয়াছে। সে এখানে আবার বসিয়া পড়িল, কিছুতেই যাইবে না। আমি কিছুদুর গিয়া একজন পথিকের সঙ্গে দু-চারটা কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহা-ভয়াকুল কণ্ঠে বলিলাম—"শুনিয়াছ মামা! এখানে কাল ঠিক এমন সময়ে বাঘে একটি লোক মারিয়াছে।" যষ্ঠী আর কথাটিমাত্র না কহিয়া তোপের গোলার মত ছুটিয়া এক দৌড়ে খুলসি পার হইয়া গিয়া এক বৃক্ষ তলায় পড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আমাকে গালি দিতে লাগিল। এখান হইতে সে কিছুতেই যাইবে না। আমরা চলিয়া গেলাম। বাসাবাটির পশ্চাৎ দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পদাতিকের পোষাক ছাড়িয়া পিতার পবিত্র চরণে গিয়া প্রণত হইলাম। বিলম্ব দেখিয়া করুণাময় পিতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুকে লইয়া কাঁদিয়া কত স্নেহামৃত বর্ষণ করিলেন। সেই স্বর্গে মাথা রাখিয়া আমি সকল শ্রম ভুলিয়া নব জীবন পাইলাম। আমি তাঁহাকে বিপদ ও কষ্টের কথা কিছুই বলিলাম না। কিন্তু কিছু পরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যষ্ঠী আসিয়া আমার নামে নালিশ করিতে উপস্থিত। প্রত্যেক কথার অগ্রে ও পশ্চাতে এক একটি "আজ্ঞা" বসাইয়া তাহার সে অদ্ভুত ভাষায় সমস্ত নৌ-যাত্রার বিবরণ তিলকে তাল করিয়া পিতাকে বলিয়া ফেলিল। সে ভাষা সে বর্ণনা ও সে মুখভঙ্গি আমি এখনও ভুলিতে

ারি নাই। আর বুঝাইয়া দিল আমি দুর্ব্বৃত্ত এ সমস্ত বিপদের কারণ। াতা আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন ও আমাকে বহুতর ভর্ৎসনা করিলেন। স ভর্ৎসনাই কত মধুর। ষষ্ঠী উঠিয়া যাইবার সময় আমি সঙ্কেত করিয়া বলিলাম—"আচ্ছা ইহার প্রতিশোধ লইব।" সে আবার মুখ ফিরাইয়া আমার নামে এক নম্বর নালিশ দাখিল করিয়া ভেনর ভেনর করিয়া চলিয়া গেল। আমোদটা হইয়াছিল ভাল! চব্বিশ মাইল পথ হাটিয়া সমস্ত পায়ে এরূপ অবিরল ফোস্কা পড়িয়াছিল যে সাত দিন আর এক পা চলিতে হয় নাই।

———o———

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন

অদৃষ্টাকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। পিতা কিছুদিন মুন্সেফি করিয়া আবার ওকালতিতে উপস্থিত হইয়াছেন। দেশব্যাপী বিশ্বাস ছিল যে তিনি ওকালতি করিলে অশেষ অর্থ উপার্জ্জন করিবেন এ বিশ্বাসের বিশেষ কারণও ছিল। তিনি যেরূপ নামে গোপীমোহন রূপেও গোপীমোহন ছিলেন। সুন্দর, সুগোল, সুগৌর, সমুজ্জ্বল মাধুর্য্য-মণ্ডিত দীর্ঘ মূর্ত্তি। সুকেশ ও সুগুম্ফ শোভিত মুখমণ্ডলে বিস্তৃ ললাট। আয়ত বিস্ফারিত নয়নে নীলমণি-সন্নিভ তারাযুগল মধ্যাহ্ন মার্ত্তং তেজে প্রজ্বলিত এবং সতত স্নেহসিক্ত। সমুন্নত সুবঙ্কিম নাসিকা ঈষদস্থূল ওষ্ঠাধর। প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি আজানুলম্বিত ভুজবল্লী। সম দেহ হইতে যেন মাধুর্য্য-মণ্ডিত বীর্য্য ও সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির ঐশ্ব উছলিয়া পড়িতেছে। সুরসিক, সুচতুর, সুবক্তা। শত্রুও এক মুখ দেখিলে, একবার কথা শুনিলে মুগ্ধ হইত। রূপের আভায়, গু গরিমায়, বংশ গৌরবে, পদমর্য্যাদায়, সম্পদে, নিষ্কামতায়, বিপদে নির্ভিকতায়, পিতা তখন দেশে অদ্বিতীয়।

> "সমাজের শিরোমণি, সদ্গুণ-ভাণ্ডার,
> বিপদে প্রসন্নমুখ, মোহন আকার,
> সরল হৃদয় পর-দুঃখে ম্রিয়মাণ,
> প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান।
> চতুর, মধুর-ভাষী সাহসে অতুল
> এ দেশে দুজন নাহি তাঁর সমতুল।"

তিনি সমস্ত জীবন মোকদ্দমা ঘাঁটিয়া কাটাইয়াছেন। অতএব তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ উকিল হইবেন লোকে বিশ্বাস করিবে না কেন

য়র আরম্ভেই তিনি একেবারে উকিলদিগের শীর্ষস্থানে উঠিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র উকিলের সেই নীচতা ও ধূর্ত্ততা, সেই প্রবঞ্চনা ও অর্থগৃধ্নুতা তাঁহার প্রশস্ত দয়ার্দ্র হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে নাই। সর্ব্বশেষে র অবসর নাই। প্রভাতে উঠিয়া পূজায় বসিতেন, উঠিতেন নয় কি নয়টার সময়ে। বৈঠকখানাভরা মক্কেল। তাহাদের সকলের সঙ্গে কথা কহিবারও সময় হইত না। তাহার পর কাছারি। কাছারি হইতে র পাঁচটায় ফিরিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেন ও বন্ধুদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সন্ধ্যা হইবা মাত্র আবার পূজায় বসিতেন রাত্রি তিন চারিটার পূর্ব্বে উঠিতেন না। ওকালতির কার্য্য করিবেন কখন? এতাবৎ কারণে ও বিশেষতঃ ব্যবসাটিও তাঁহার কাছে এত মনুষ্যত্বশূন্য ও জঘন্য বোধ হইল যে তিনি আবার মধ্যে মধ্যে মুন্‌সেফিতে হইতে লাগিলেন। তাহাতে মক্কেলের বিশ্বাস উঠিয়া যাইতে গিল এবং ব্যবসায় একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছুদিন বিত থাকিলে পাকা মুন্‌সেফ হইতেন। তাঁহার সমসাময়িকেরা বজজি করিয়া এখন পেন্‌সন্‌ লইয়াছেন। কিন্তু সে ভাগ্য আমাদের ছিল না! এখন অবস্থা এত শোচনীয় হইল এবং পিতা এত ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন যে তিনি আমার শিক্ষাভার বহন করিতেও অসমর্থ হইয়া উঠিলেন। বাড়ী গিয়া শুনিলাম আমি টাকার জন্য পত্র লিখিলে তাকে পড়িয়া শুনাইয়া দুজনে অশ্রুবর্ষণ করিতেন,—না, আমি আর লিখিতে পারিতেছি না। অশ্রুতে আমার নয়ন অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে। বুক ভাসিয়া যাইতেছে। মাতা কাঁদিতেন, আর এ অবস্থার কথা আমাকে বলিতেন। হায়! এই অশ্রুর এক বিন্দুও যে মুছাইব আমার ভাগ্যে বিধাতা লিখিয়াছিলেন না।

ভগ্নহৃদয়ে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। আমার বিবাহের কল্যাণে

আমি ও চন্দ্রকুমার উভয়ে বৃত্তি হারাইলাম, 'প্রেসিডেন্সি' কলে পড়িবার আশাও সেই সঙ্গে অতল জলে ডুবিল। জগবন্ধু টাকি হই বৃত্তি লইয়া আসিয়া সে কলেজে পড়িতে লাগিল। আমরা দুই জন জেনেরেল এসেম্ব্লি কলেজে (General Assembly College) পড়িতে লাগিলাম। পিতাকে আর আমার শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বিরক্ত করিব না স্থির করিয়াছিলাম। দুইটি ছাত্র শিক্ষার (private tuition যোগাড় করিলাম। একটি বড় বাজারে—ছাত্র আশু। আর একটি সিমলায়—ছাত্র নিবারণ। আশু ছেলেমানুষ, হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। নিবারণ আমার সমবয়স্ক, মেট্রপলিটন একেডেমির প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দুটিই বড় সুন্দর, সরল ও স্নেহময়। আমাকে বড় ভালবাসিত। নিবারণ, হাইকোর্টের জজ অনুকূল বাবুর জামাতা। আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করিত। তাহাদের সেই আদর, সেই সহৃদয়তা আমি এ জীবনে ভুলিব না। দুটিই আমার বড় দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী ছিল। আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। বালকেই বালককে কেবল এরূপ ভালবাসিতে পারে। আমার কষ্ট যতদূ লাঘব করিতে পারে তাহার যথাসাধ্য তাহারা চেষ্টা করিত। আপনার চেষ্টা করিয়া পড়া শিখিয়া রাখিত। আমি গেলে আমাকে কবিত আওড়াইতে ও গল্প করিতে বলিত। বৃষ্টির দিন গেলে রাগ করিত তাহারা আগে ভালছেলে ছিল না। কিন্তু স্নেহের এমনি মোহিনী শক্তি, তাহারা এখন বেশ ভালছেলে হইয়া উঠিল। অভিভাবকেরা আমার উপর বড় সন্তুষ্ট। বেতনের উপর পারিতোষিক দিতেন। তাঁহার মনে করিতেন আমি বড় পরিশ্রম করিয়া পড়াইতেছি। তাঁহারাও আমাকে বড় ভালবাসিতেন এবং আমার চেহারার ও চরিত্রের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। দশ টাকা করিয়া বিশ টাকা বেতন পাইতাম

আনিয়া চন্দ্রকুমারের ছোট ভাই হরকুমারকে দিতাম। হরকুমার আমার বাসা খরচ চালাইত। আমার ছাত্র দুটির জন্য আমার এখনও প্রাণ কাঁদে। জানি না এখন তাহারা কোথায় কি অবস্থায় আছে। চেষ্টা করিয়াও তাহাদের উদ্দেশ পাই নাই।

যাহা হউক খরচ এক প্রকার চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পিতাও কিছু টাকা পাঠাইতেন। আমি এরূপ ভাবে পড়িতেছি বলিয়া লোকের মুখে শুনিয়া করুণার দেবদেবী উভয়ে সর্ব্বদা কাঁদিতেন। হায়! স্নেহপ্রাণ যুগল। আমার মনে ত কোন দুঃখ বোধ হইত না। টাকা চাহিয়া আর তোমাদের মনে কষ্ট দিতে হইতেছে না—ইহাতে বরং আমার হৃদয় এক অভিনব আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পটুয়াটোলা লেনে বাসা। বড় বাজারে সিমলায় ও হেদোয়া পুকুরে কলেজে যাইতে আসিতে আমায় দিন প্রায় বার তের মাইল রাস্তা হাঁটিতে হইত। সকালে সিমলায় ও সায়াহ্নে বড় বাজারে যাইতে হইত। অতএব পড়িব কখন? ছাত্রদুটি আমার উপর এরূপ দয়া না দেখাইলে আমার পড়াই হইত না। তাহার উপর বি, এ, শ্রেণীর সমুদায় পুস্তক কিনিতে টাকা কোথায় পাইব? চাহিলে পিতা কর্জ্জ করিয়া পাঠাইতেন। অতএব চাহিলাম না। দুই একখানি বহি মাত্র কিনিলাম। সমপাঠীদের অবসর মতে অবশিষ্ট বহি চাহিয়া লইয়া পড়িতে হইত। কেহ কেহ তজ্জন্য বিরক্ত হইতেন, কটূক্তি করিতেন। দুঃখের মুখ দেখিয়া অবধি আমার উদ্ধতস্বভাব ঘুচিয়া হৃদয় কোমল ও তরল হইয়া উঠিতেছিল। তাহা বিনীতভাবে সহিতাম। অধিকাংশ চন্দ্রকুমারের বহি লইয়া পড়িতাম। এরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। শীতের সময় বাড়ী গেলাম।

———o———

বিচার বিভ্রাট।

"A Daniel come to judgment!"

ইংরাজ-রাজ্যের গর্ব্বপূর্ণ একটি সুবিচারের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। এখানে আর একটি দিব। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের কিছু দিন হইতে একটি উড়ে চাকর আছে, নাম রঘু। সে একজন সহবাসীর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করাতে তাহাকে আমরা সম্যক্ বেতন দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। কলিকাতাবাসী উড়িয়াদের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। কিছু দিন পরে কলিকাতা Small Cause কোর্ট হইতে আমার, চন্দ্রকুমার ও জগবন্ধুর নামে নিমন্ত্রণ পত্র উপস্থিত। বাদী রঘুনাথ। দাবী তাহার ৩০৲ টাকা বেতন বাকী! সে যত দিন চাকরি করিয়াছে তাহার সমুদায় বেতন একত্র করিলেও ৩০৲ টাকা হইবে না। আমরা স্তম্ভিত হইলাম। কলিকাতারূপ মহা অরণ্যে আমরা তিনটি ক্ষুদ্র বিদেশী ছাত্র। ধর্ম্মাধিকরণের—ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয় ধর্ম্মাধিকরণই বটে—কি মামলা মোকদ্দমার কোন খবরই রাখি না। ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। নিরূপিত দিবসে শুষ্কপ্রাণে ধর্ম্মতলার ধর্ম্মাধিকরণে—ধর্ম্মের উপযুক্ত স্থান ও গৃহ!—গিয়া উপস্থিত হইলাম! অমনি কালীঘাটের পাণ্ডার মত এক পাল লোক আসিয়া আমাদিগকে টানাটানি আরম্ভ করিল। কিছুই বুঝিতেছি না। শেষে একজন জয়ী হইয়া আমাদিগকে বলিদানের পাঁটার মত টানিয়া লইয়া চলিল। তখন তাহার পরাজিত সহযোদ্ধারা তাহাকে ও আমাদিগকে গালি দিয়া অন্য শিকার ধরিতে চলিল। পাণ্ডা বা টর্ণি মহাশয় আমাদিগকে একজন সামলাওয়ালার কাছে দাখিল করিলেন। শুনিলাম ইনি একজন উকিল। তখন আমাদের যাহা কিছু ছিল দুই জনে অনুগ্রহ

করিয়া তাহার ভার আপনাদের 'পকেটে' লইয়া যথাসময়ে আমাদিগকে হাকিমের কাছে লইয়া ফেলিলেন। বিচারপতি খ্যাতনামা হরচন্দ্র ঘোষ। রঘু ও তাহার দুই উড়িয়া সাক্ষী 'হলফ' করিয়া বলিল বেতন চাহিলে আমরা তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। আমরা ও আমাদের সহপাঠী সাক্ষীরা 'হলফ' করিয়া প্রকৃত কথা কি তাহা বলিলাম। বিচারক মহাশয়ের শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল হইতে একটি কথা মাত্র নির্গত হইল—"ডিক্রি"। উকিল ও টর্ণি মহাশয়েরা আমাদিগকে বলিলেন—"তোমরা মোকদ্দমা হারিলে, টাকা দিতে হইবে।" আর আমাদের সঙ্গে কথাটি না কহিয়া দুইজন অন্য শিকার অন্বেষণে ছুটিলেন। জগবন্ধুর মুখখানি বড় সংস্কৃত ছিল না। সে ধর্ম্মাধিকরণের বাহিরে আসিয়া সেই বিচারক ও তাঁহার চৌদ্দ পুরুষ, ধর্ম্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার চৌদ্দ পুরুষ, বিপন্নের উপকারী "সাধারণ-সেবক" (Public servant) মহাশয়দের,—উকিল মহাশয়েরা তাঁহাদের নির্ম্মম জলৌকা-বৃত্তির এরূপ সদ্‌ব্যাখ্যাই করিয়া থাকেন—ও তাহাদের চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে নানারূপ কুটুম্বিতা ও তদনুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা করিতেছিল। চন্দ্রকুমার কাঁদিতে লাগিল। আমি স্তম্ভিত। মহা প্রতাপান্বিত ইংরাজ-রাজ্যের মহামান্য বিচারালয় সকলের 'সুবিচার' এই প্রথম আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম হইল, এবং তাহার সমালোচনা করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এই নিরীহ সংসারানভিজ্ঞ বিদেশবাসী বালকদিগের কথা অপেক্ষা তিন জন উড়িয়া চাকরের কথা যে কেন বিচারক মহাশয় বিশ্বাস করিলেন, এই সমস্যার আমি এখন পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে পারি নাই। আর হরচন্দ্র ঘোষের মত লোকের বিচারের যদি এই আদর্শ হয়, তবে না জানি অন্য বিচারকদের দ্বারা দেশের কি সর্ব্বনাশই হইতেছে! তবে আমার একটি ধারণা আছে,

সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু"— পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের পৌরাণিক বিদ্বেষ বোধ হয় এই সুবিচারের মূলে ছিল। আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী। অতএব পশ্চিমবঙ্গবাসী বিচারক, সিদ্ধান্ত করিলেন ইহারা 'বাঙ্গাল', সুতরাং মিথ্যুক। বালক বলিয়া কি? সর্প শিশুর কি বিষ থাকে না? কাযে কাযেই 'উড়ে জন্তুর' উপর বাঙ্গাল বালকেরা অত্যাচার করিবে তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

কিছু দিন পরে রঘু আসিয়া আমাদের কাছে ক্ষমা চাহিল ও চাকরি চাহিল। আমরা অস্বীকার করিলাম। তখন ডিক্রী বাহির করিয়া টাকাটা উশুল করিয়া লইল। আমরা সকল ছাত্রে ভাগ করিয়া ঘোষজার দক্ষিণা দিলাম। কিন্তু ঘোষজার উপরও বিচারক একজন আছেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম হতভাগা রঘু মরিয়াছে। আমরা বড় দুঃখিত হইলাম।

এ সময়ে আবার একটি সুবিচারের দৃষ্টান্তে ইংরাজ রাজ্যের বিচারের উপর আমি আরও অশ্রদ্ধাবান হই, এবং ইংরাজেরা কিরূপ যদৃচ্ছাক্রমে দেশীয় লোক হত্যা করিয়া অব্যাহতি পায়, তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। চট্টগ্রাম নগর বিস্তৃত-সলিলা কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। তাহার অপর পারে একটি গ্রামে কয়েক জন ইংরাজ নাবিক (English Sailor) শিকার করিতে গিয়া একটি ছাগলকে গুলি করে। তাহাতে গ্রামের লোক আসিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে, গ্রামের লোকদিগের একজনকে তাহারা গুলি করিয়া হত্যা করে। ইংরাজ আসামী বিচারার্থ সুপ্রিম কোর্টে প্রেরিত হয়। সে সময়ে উক্ত কোর্ট টাউনহলের নিম্নতলায় অধিষ্ঠিত ছিল। ইন্‌স্পেক্টার বাবু উমাচরণ দাস সাক্ষী লইয়া চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা (ছাত্রেরা) তামাসা দেখিতে যাই। যিনি পরে শের

আলির ছুরিকায় সেই টাউনহলের দ্বারে নিহত হইয়াছিলেন সেই জষ্টিস নরমেন বিচারক। টাউনহল সামলাধারী উকিল, টর্ণি, এবং ঘোর কৃষ্ণ গাউনধারী বেরিষ্টারবর্গে পরিপূর্ণ। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। কিন্তু সাক্ষীদিগের মুখে আমাদের স্থানীয় বাঙ্গালা ভাষা শুনিয়া সকলে অবাক। খ্যাতনামা শ্যামাচরণ সরকার তখন ইণ্টারপ্রেটার। তিনি একজন বহুভাষাভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার মনে বড় গৌরব ছিল। কিন্তু কুব্জার দর্পচূর্ণ হইল। তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন অনুবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু দশ পনর মিনিট এ অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিলে, বিবাদীর বেরিষ্টার উড্রফের ধমক খাইয়া কবুল জবাব দিলেন। আমার মাতৃভাষা বিদেশীর পক্ষে অসাধ্য ভাষা। বুঝিতে ত পারিবেই না, তাহা শিক্ষা করাও অসাধ্য। ঢাকা অঞ্চলের ভাষার মত প্রত্যেক শব্দে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা ইহাতে নাই। তথাপি ঢাকা অঞ্চলের শব্দ অন্ততঃ বাঙ্গালা। উক্ত বিস্তৃত মূর্চ্ছনা সত্বেও কলিকাতা অঞ্চলের লোক উহা বুঝিতে পারেন এবং অনুকরণ করিতে পারেন। বাইরন মেনফ্রেড লিখিয়া বলিয়াছিলেন "অবশেষ আমি একখান কাব্য লিখিয়াছি যাহার অভিনয় অসম্ভব।" আমার মাতৃভাষা শিক্ষাও অসম্ভব। ইহাতে ঢাকা অঞ্চলের বিশেষ কোনও শব্দ নাই। উচ্চারণও সেরূপ নহে। অনেক শব্দই রাঢ় অঞ্চলের, কিন্তু তাহার উচ্চারণ এত সংক্ষিপ্ত এবং কোমল, যে বিদেশীয় লোক, যাহারা একজীবন চট্টগ্রামে আছে, তাহারাও উহা উচ্চারণ করিতে পারে না। অতএব এই ভাষার অনুবাদ করিয়া কে কোর্ট এবং কাউনসিলদিগকে বুঝাইয়া দিবে? মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। জজ বলিলেন চট্টগ্রাম হইতে যে ইন্‌স্পেক্টার আসিয়াছে, সে অনুবাদ করুক। বিবাদীর পক্ষে অন্যান্য কাউনসিলের সঙ্গে উড্রফ সাহেব ছিলেন। তখন ইঁহার

খ্যাতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তিনি আপত্তি করিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টার যখন এ মোকদ্দমা তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহার উপর এ কার্য্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে না। তখন জজ চট্টগ্রামের অন্য কোনও লোক কোর্টে আছে কিনা ইনস্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন কয়েকজন কলেজের ছাত্র আছে। তাহাদের একজনকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে জজ আদেশ দিলেন। আমার সহপাঠীরা কেহই অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। সকলে আমাকে ঠেলিতে লাগিল, এবং ইন্‌স্পেক্টারও আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া বলিদানের ছাগশিশুর মত লইয়া উপস্থিত করিলেন। শত শত লোকের চক্ষু আমার উপর পড়িল। আমার তখন সতর আঠার বৎসর মাত্র বয়স। এফ এ পড়িতেছি। পরিধান ধুতি, চাদর ও পিরান। তাহাও মলিন এবং তৈলাক্ত। বদনচন্দ্র ও চাঁচর চিকুর কলিকাতার তদানীন্তন মসৃণ রক্তধূলিতে সমাচ্ছন্ন। আমাকে দেখিয়া সকলে সস্নেহ হাসি হাসিলেন, এবং জজও সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক! তোমার বাড়ী চট্টগ্রামে?" উত্তর—হাঁ, মি লর্ড! প্রশ্ন—"তুমি এ সাক্ষীদের কথা অনুবাদ করিতে পারিবে?" উত্তর—"বলিতে পারি না, মি লর্ড! আমি চেষ্টা করিতে পারি।" যে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়াছিলাম তাহাতে মি লর্ডের (my Lord) ছড়াছড়ি শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, যে এই প্রভুদের মি লর্ড বলিতে হয়। কিন্তু শব্দটির অর্থ কি বুঝিতাম না। বিশেষতঃ আমাদের জমীদারি মোকদ্দমার সূক্ষ্ম বিচারের পর এই প্রভুদের উপর আমার ঘোরতর অশ্রদ্ধা হইয়াছে। জজ আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন,—"এ বালক বেশ পারিবে।" উড্রুফও সায় দিলেন। তখন শপথ পাঠ করাইয়া আমাকে শ্যামাচরণ বাবুর পার্শ্বে সেই উচ্চ স্থানে আসন দিয়া বসান হইল।

শ্যামাচরণ বাবুও আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন—ভয় নাই, যেখানে আমি ঠেকি সেখানে তিনি সাহায্য করিবেন। সাক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হইল। আমি ইংরাজি প্রশ্ন অনুবাদ করিয়া সাক্ষীকে আমার চট্টগ্রামী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এবং তাহাদের উত্তর লিণ্ডসে মরের ও হাইলির ব্যাকরণের (Lindsay Murray's and Highly's Grammar) মুণ্ডপাত করিয়া ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে লাগিলাম! আমার ও সাক্ষীর মুখে চট্টগ্রামী ভাষা শুনিয়া প্রথম কয়েক মিনিট হাসির তরঙ্গে কার্য্য করা অসাধ্য হইল। কিন্তু দুই চারিটি সন্দেশ খাইলেও আর খাইতে ভাল লাগে না। অতএব আমার মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রূপের হাসি ক্রমে থামিয়া গেল। আমি প্রথম ভয়ে কাঁপিতেছিলাম। কিন্তু জজ ও উভয় দিকের কাউনসিল আমাকে অভয় দিতে লাগিলেন—"বেশ ছেলে। তুমি বেশ অনুবাদ করিতেছ। ভয় পাইও না।" কয়েক মিনিট পরে আমার ভয় ঘুচিয়া গেল। টিফিনের সময়ে শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"বাপ! কি বিট্‌কেলে ভাষা!" আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কক্ষে লইয়া গিয়া আমার চৌদ্দ পুরুষের ইতিহাস পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যেন ভূগর্ভ হইতে একটি নূতন জীব উৎপন্ন হইয়াছি। আমাকে দেখিবার জন্য কর্ম্মচারীবৃন্দে তাঁহার কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। চাট্‌গাঁ খালাশির দেশ—সেখান হইতে এ অপূর্ব্ব জীব আসিয়াছি—সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—ইহাই আমার অপরাধ! তাহার উপর, আমি খাঁটি কলিকাতার বাঙ্গালা বলিতেছি; তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এরূপ দুই দিনে মোকদ্দমার বিচার শেষ হইল, এবং সে হইতে এই অর্দ্ধ শতাব্দি যাবৎ এরূপ মোকদ্দমার যেরূপ বিচার হইয়া থাকে, তাহাই হইল। পরিষ্কার নরহত্যা প্রমাণিত হইল। কিন্তু উড্রুফ বহুক্ষণ যাবৎ বুঝাইলেন যে ভীষণ গ্রাম্য অসভ্য দস্যুরা গোরাদের

আক্রমণ করিয়াছিল। অতএব তাহারা আত্মরক্ষার্থ গুলি করিয়াছিল। তদানীন্তন কসাঁই টোলার জুরি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—'নির্দ্দোষী'। জজ বলিলেন—'খালাস।' কাউনসিলেরা গাউনের একটা সন্‌সনি, জুতার একটা মস্‌মসী তুলিয়া উঠিয়া গেলেন। আর সহস্রাধিক দেশীয় দর্শক বিচারের ফল শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। আমার স্বদেশীয় ইন্‌স্পেক্টার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আমারও চক্ষু সজল হইল, এবং কিশোর-কোমল হৃদয়ে যে আঘাত পাইলাম, তাহা আমি ভুলিতে পারি নাই। জজ আমাকে সস্নেহ-কণ্ঠে বলিলেন—You are a brave boy! You have done very well. (তুমি সাহসী বালক, তুমি বেশ কায করিয়াছ)। আমাকে ইণ্টার-প্রেটারের পুরা ফিস দুই দিনের জন্য দিতে আদেশ করিলেন। আমি বত্রিশ টাকা লইয়া বিচারের ফল সহপাঠীদের সঙ্গে সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে আসিলাম। তাঁহারাও আমার কত প্রশংসা করিলেন, এবং উক্ত টাকা হইতে একটা জলযোগের বন্দোবস্ত করিলেন। অতএব আমার প্রথম চাকরি খুব বড় চাকরি বলিতে হইবে।

আত্মবাল।

"তুলিব না এ কমল ছিল যদি মনে.
প্রেম সরোবরে কেন দিলাম সাঁতার ?
কেন সহি এত জ্বালা ভুজঙ্গ দংশনে ?
কেন ছিঁড়িলাম আহা ! মৃণাল তাহার ?"

অবকাশ-রঞ্জিনী।

সেই সান্ধ্য সম্মিলনে হৃদয়ে কি এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। আমার বয়স তখন সপ্তদশ, বিদ্যুতের দ্বাদশ, কেহ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তবে উভয়ে উভয়কে দিনে অন্ততঃ একবার না দেখিলে থাকিতে পারিতাম না। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর, আর স্কুলে যাইতে হয় না। আহারের পর বিদ্যুতের বাসায় গিয়া সমস্ত দিন কাটাই, তাহাতেও আমার তৃপ্তি হয় না। তাহার বাসার নিকট দিয়া যাইতে শিস্ দিলে, সে বিজুলির মত বাহির হইয়া আসিত, এবং যতক্ষণ দেখা যায় দুইজনে দুই জনকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতাম। কেন ? কিছুই জানি না। কলিকাতা বিদ্যাভ্যাসের সময়ে, বাড়ী গেলে সহরে যে কয়দিন থাকিতাম, তাহার সঙ্গে দিবাভাগের অধিকাংশ কাটাইতাম। আমি গেলে সে একটুকু আড়ালে দাঁড়াইত। তাহার কি উদাসিনী কিশোরীমূর্ত্তি ! একখানি সামান্য লাল শাড়ী মাত্র পরিধান, দুই হাতে দুই গাছি সামান্য সঙ্খের বালা। দীর্ঘ নিবিড় কুঞ্চিত অলকারাশি অযত্নে সেই আকর্ণবিশ্রান্ত ও বিস্ফারিত নয়ন শোভিত অনিন্দ্য ক্ষুদ্র মুখ খানি ছাইয়া অংশে উরসে ও পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। সে কেশরাশির অবসরে বিদ্যুতের সুগোল মুখমণ্ডলের ও শরীরের বর্ণ বিদ্যুতের মত ঝলসিতেছে। শান্ত, বিস্ফারিত, ছল ছল নেত্রদ্বয় আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি কাছে গিয়া আদর করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ললাট চুম্বন

করিয়া না আনিলে সে আসিত না। দুজনে প্রায়ই বারাণ্ডায় একখানি কৌচের উপর বসিতাম। আমার বাম হস্ত তাহার ক্ষীণকটি জড়াইয়া যেন কুসুম স্তবকের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। কটিখানি যেন ভাঙ্গিয়া আসিয়া আমার অঙ্গে লাগিতেছে—কি কমনীয়! কি নমনীয়! বিদ্যুত সমস্ত দিন তাহার অঙ্কস্থিত আমার বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি ধরিয়া বসিয়া আছে। কিছুতে ছাড়িবে না। সম্মুখে কয়েকটি গোলাপ গাছ। স্তরে স্তরে গোলাপ ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। দিবা দ্বিপ্রহর; গৃহ নীরব; সকলেই নিদ্রিত। কেন যে এরূপে বসিয়া আছি বালক বালিকা কেহই জানি না। কত কথা বলিতেছি। কেন বলিতেছি তাহা জানি না। আমি যে বহিখানি ভালবাসি সে তাহা পড়িত। আমি 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' ভালবাসিতাম। সর্ব্বদা আওড়াইতাম। সে দুখানিই কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। এই গভীর অনুরাগে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই, আবিলতা নাই। এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা—উভয় উভয়কে দেখি। উভয় উভয়ের কাছে বসিয়া থাকি। উভয় উভয়ের কথা শুনি। কথা আমিই বেশী কহিতাম, সে নীরবে অতৃপ্ত মনে আমার মুখের দিকে বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া শুনিত। হতভাগ্য সংসারে যাহা প্রেম বলিয়া পরিচিত ও নিন্দিত, এই ভালবাসায় সে প্রেমের গন্ধ মাত্র ছিল না। এরূপ বালক বালিকার মধ্যে থাকিবার কথাও নহে। এই অনুরাগ কি সুন্দর, কি সরল, কি স্বর্গ!

এরূপে চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিদ্যুতের এখন পনর, ষোল বৎসর বয়স। এবার শীতের সময়ে বাড়ী আসিয়াও বিদ্যুতকে দেখিতে গেলাম। কই আমার শিস্ শুনিয়া ত বিদ্যুত চঞ্চল চরণে চঞ্চলার মত ছুটিয়া আসিল না। গৃহে প্রবেশ করিলাম। ধীরে ধীরে হলে বিদ্যুত প্রবেশ করিল। মুখ গম্ভীর। বারি-ভরা মেঘের মত গম্ভীর, স্থির।

আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম—"কি বিদ্যুত! তুই আমাকে নমস্কার করিবি না?" সে তখন প্রণতা হইল। আমি তাহাকে উঠাইতে গেলে—এ কি? সে পশ্চাতে সরিয়া গেল। আমি একখানি চেয়ারে বসিলাম। দাঁড়াইতে পারিতেছিলাম না। সে স্থির ভাবে আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি অনেক বলিলে টেবলের অপর পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিল। ইতিমধ্যে তাহার বিবাহ হইয়াছে। আমি তাহাকে আমার সহপাঠী একটি সৎপাত্রের সহিত বিবাহ দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহা হয় নাই। গৃহপালিত জীবের মত 'ঘর জামায়ের' হস্তে সে সমর্পিতা হইয়াছে। আমি বলিলাম—"বিদ্যুত! তোমার বিবাহ হইয়াছে?" এতক্ষণ পরে মুখখানি তুলিয়া, একটুকু ঈষৎ হাস্য করিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে আমাকে চাহিয়া উত্তর করিল—"আপনার কি হয় নাই?" উত্তর আমার মরমের মরমে প্রবেশ করিয়া গুরুতর আঘাত করিল। তাহার পিতা একজন শিক্ষিত ও সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী লোক। আমি জানিতাম তিনি বিদ্যুতের অনভিমতে বিবাহ দিবার লোক নহেন। এ জন্য তাহাকে এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ দেন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার পিতা কি তোমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন না?" বিদ্যুত নীরব। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—"হাঁ"। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কেন এ বিবাহে মত দিলে? আমি যে পাত্রের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এই পাত্র কি তাহার অপেক্ষা ভাল?" আবার অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—"না"। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে কেন তুমি এ বিবাহে সম্মত হইলে?" এবার অনেকক্ষন অধোমুখে নীরবে রহিল। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলাম না। আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে দাঁড়াইলাম।

সে কাতর নয়নে চাহিয়া বলিল—"বসুন।" কিন্তু আবার নীরব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"সে কথা শুনিয়া কি হইবে?" আমি তখনই শুনিতে জিদ করিতে লাগিলাম। আবার অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে মুখ তুলিল। অধরে ঈষৎ কষ্টের হাসি। সজল চক্ষু দুটি আমার প্রতি স্থাপিত করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"এখন ত আপনাকে এক একবার দেখিতে পাইব। সেখানে বিবাহ হইলে তাহাও যে হইত না।" জগতের এই চরম সুখ দুঃখভরা, এই স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরা, এই উগ্র বিষামৃত ভরা, এই আত্মবলিদানের সংবাদ আমার মরমের মরমে পঁহুছিল। মরমের মরমে ঘোরতর আঘাত করিল। মরমের মরম চূর্ণ হইয়া গেল। তখন আমার বয়স বিংশতি বৎসর। আমি এই উত্তরের গভীর অর্থ, প্রেমের প্রথম তত্ত্ব, মরমে মরমে অনুভব করিলাম। এতদিন পুস্তকে পড়িয়াছি, হৃদয়ে অনুভব করি নাই। সুখে হৃদয় অধীর দুঃখে অস্থির; নয়নের আগে স্বর্গ খুলিয়াছিল। কর্ণে সে উত্তর স্বর্গ-সঙ্গীত বাজাইতেছিল; মর্ত্তের কণ্টকে ও কঠিনত্বে আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল। অমৃতে হৃদয় পরিপূরিত, বিষে হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছিল। আমি আত্মহারা হইলাম। টেবলের কিনারায় মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিলাম। কি ভাবিলাম কিছু মনে নাই। কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম বিদ্যুতের ফুল্ল কপোল বাহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বহিতেছে। সে অধোমুখ তুলিয়া আর একবার আমার দিকে চাহিল। দৃষ্টি কোমল, কাতর, করুণাময়। দৃষ্টি—সরল, সুন্দর স্বর্গ। আমি পাগলের মত ছুটিয়া আমার গৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে বক্ষ চাপিয়া দারুণ হৃদয়-ব্যথায় অধীর হইয়া পড়িলাম, আর সমস্ত দিন রাত্রি মাথা তুলিলাম না। তাহার দুই একদিন পরে হৃদয়ের সে দারুণ ব্যথা লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম।

কবিতানুরাগ।

আমি শৈশবে বড় পুথিভক্ত ছিলাম। যখন সাত আট বৎসর বয়স, গুরু মহাশয়ের বেত্রাঘাতের ও দন্তঘর্ষণসম্বলিত আতঙ্ক-সঞ্চারী তর্জ্জন তাড়না কৃপায় প্রাঙ্গণের ধূলাতে ক খ লিখিয়া রয়ে আকার রা, ও ম=রাম, পড়িতে শিখিয়াছি, তখন হইতেই সুর করিয়া "রাম রাম" বলিয়া রামায়ণ মহাভারত ঠাকুরমার কাছে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িতাম। হায়! হায়! তখনকার শিক্ষা প্রণালীতে ও এখনকার শিক্ষা প্রণালীতে কি শোচনীয় তারতম্য। তখন অক্ষর শিক্ষা হইলেই আপনার পূর্ব্বপুরুষদের ও আত্মীয় স্বজনের এবং দেবদেবীর নাম লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এক দিকে কুলজিখানি, অন্য দিকে দেবদেবীর পবিত্র নামাবলী মুখস্থ হইত ও তাঁহাদের পূজা দেখিতাম। তাহার পর এক দিকে সেবকাধীন সেবক পাঠে পিতা মাতা গুরুজনের কাছে পত্রাদি লেখা শিক্ষা দেওয়া হইত, অন্যদিকে দাতাকর্ণ ও চৌত্রিশ অক্ষরা স্তবমালা ও নীতিগর্ভ সুললিত শ্লোকমালা শিক্ষা দেওয়া হইত। এরূপে একদিকে আপনার গুরুজনের প্রতি ভক্তির, অন্যদিকে ধর্ম্মের, অঙ্কুর বালকের কোমল হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত হইত। তাহার পর রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির দ্বারা সে ধর্ম্মভাব তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি করা হইত। তৎসঙ্গে সঙ্গে এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় অঙ্ক ও দলিলাদি লিখিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। লেখা অধিকাংশই কলাপাতে, গৃহনির্ম্মিত কালিতে ও গ্রামের বাঁশের কলমে হইত। এমন সুন্দর, এমন সহজ, এমন স্বাভাবিক, এবং এমন দরিদ্রোপযোগী শিক্ষা-প্রণালী কি কোন দেশে কোন সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?

আর আজ তাহার স্থানে প্রাইমারি বা মহামারি স্কুলে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কি মহামান্য শিক্ষা বিভাগই কেবল জানেন। এখন বালকেরা পূর্ব্বপুরুষের ও দেবদেবীর কোন খবর রাখে না। ধর্ম্মশিক্ষার কোন ধার ধারে না। তাহাদের জীবনের উপযোগী কিছুই শিখে না। শিখে 'পদ্যাবলী,' 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' 'উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব,' ও শিক্ষা বিভাগের ও তস্য শালা সম্বন্ধীদের মাথা মুণ্ডের আমসত্ত্ব। দেশ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। অথচ কলাপাতের স্থান শ্লেট, পেন্‌সিল, ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদের ও তাহাদের শ্যালকদের অতিরিক্ত রজত মূল্যে বিক্রিত অদ্ভুত পুস্তকরাশি গ্রহণ করিয়াছে। শিশুর বয়সের সংখ্যা হইতে তাহার পুস্তকের সংখ্যা অধিক। তাহার উপর আবার সম্প্রতি কিণ্ডার-গার্টেন সুরু হইয়াছে। শিক্ষার অবস্থা দেখিলে মিল্টনের সয়তনের আক্ষেপ মনে পড়ে—

"Into what pit thou seest from what height fallen"

যাহা হউক আমি সুর করিয়া ও শব্দ যোড়াইয়া পুথি পড়িতাম। আর পিতামহী বুড়ী ও আমার মা খুড়ীরা সেই অপূর্ব্ব পাঠ শুনিয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের চক্ষে জলের ধারা বহিত। ইংরাজি বিদ্যালয়ে দাখিল হইবার পরও আমার এই পুথি পড়া রোগ ঘুচিল না। তখন বঙ্গ-সরস্বতী দেবীর দীনা ক্ষীণা মূর্ত্তিখানি বটতলায় স্থাপিতা। সেইখানে নিকৃষ্ট কাগজে অস্পষ্ট অক্ষরে জননী যন্ত্রমুখে যে সকল ছাই মাটি প্রসব করিতেন আমি সকলই পড়িতাম। ক্রমে ক্রমে ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দেবপ্রতিম ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গ সাহিত্যাকাশে উদয় হইতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই যে বাঙ্গালার পদ্য গদ্যের ঈশ্বর তাহা আজ সর্ব্ববাদী সম্মত। তখন গুপ্তজার 'প্রভাকরের' প্রভায় বঙ্গদেশ ঝলসিত।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচরে,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকরে।"

তাঁহার এই শ্লেষপূর্ণ গর্ব্ববাক্য সকলের কণ্ঠস্থ ও বেদবাক্যবৎ স্বীকার্য্য ছিল। ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল' 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' প্রভাকর-প্রদীপ্ত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। 'বেতাল' গুপ্তজার তাল কাটিল। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া নবাগত শিশুকে কতই বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' বাহির হইলে গদ্য রচনার সৃষ্টিতে বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ সঞ্চারিত হইল। আমাদের পণ্ডিত জগদীশ তর্কলঙ্কার ওরফে পাগলা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিষ্য ও পরম ভক্ত। তিনি জোর করিয়া এই অভিনব গদ্য গ্রন্থ সকল আমাদিগকে স্কুলে ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়াইতেন। কিন্তু পিতা গুপ্তজার বড় পক্ষপাতী! গুপ্তজা একবার দেশভ্রমণে চট্টগ্রাম আসিয়া প্রতিভায় সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। পিতা, বন্ধুদের লইয়া সর্ব্বদা প্রভাকর পড়িতেন, তিনি কবিতা পড়িতে বড়ই ভাল বাসিতেন। এমন কি এক এক দিন তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া পড়িতেন। তিনি এমন সুপাঠক ও সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি এমন মনোমোহন ছিল, তাঁহার কবিতা পড়া, বিশেষতঃ পুথি, যে একবার শুনিয়াছে সে ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ও কবিকঙ্কণ পাঠ এখন যেন আধ স্বপ্ন-বিস্মৃত সুদূর শ্রুত বীণা সঙ্গিতের মত শুনিতে পাই। মনসা পুথির 'দংশন' 'বিষ নামান' ও বিপুলা লক্ষিন্দরের 'সন্ন্যাস'—এই তিনটি অংশ তিনি নিজে বাড়ী গিয়া পড়িতেন। 'দংশন' ও 'সন্ন্যাসের' সুকোমল কণ্ঠোচ্ছ্বসিত করুণরসে শ্রোতাগণ চিত্রিতবৎ বসিয়া কাঁদিত; রমণীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইত। 'বিষ নামান' পাঠে তাঁহার সেই গগন-স্পর্শী গলার ঝঙ্কারে সমস্ত গ্রামখানি

যেন কম্পিত হইত। শ্রাবণ মাসে আমি এখনও যেন শুনিতে পাই পিতার কণ্ঠ-ঝঙ্কারে শ্রাবণের বারি-বজ্র-জলদপূর্ণ আকাশ কম্পিত করিয়া গাইতেছেন—

"মূলমন্ত্র পড়ি পদ্মা ছাড়িল হুঙ্কার,
লক্ষীন্দরের পঞ্চ প্রাণ দিল আওসার।"

পিতা সুগায়ক, সুরসিক, সুকবি। তিনি কবিতা রচনাও করিতেন। নিজে ও বন্ধুগণে মিলিয়া একটি যাত্রা রচনা করিয়া আপনারাই তাহা অভিনয় করেন। তাহাতে দেশ শুদ্ধ লোক মোহিত হয়। আমি তখন শিশু, কিন্তু একটি দৃশ্য আমার স্মৃতিতে সেই বয়সেও অঙ্কিত হইয়া যায়! যাত্রার মধ্যভাগে একটি যবনিকা অপসারিত হইলে, অকস্মাৎ সমস্ত মূর্ত্তি-পূর্ণ একখানি দশভুজার কাটাম ভাসিয়া উঠিল। তাহার সমুদায় মূর্ত্তি-গুলিন, অসুর সিংহ, পর্য্যন্ত সজীব, কারণ সকলই মানুষ। কাংস্য, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল, রমণীগণের সুমধুর হুলুধ্বনি শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, সুগন্ধ ধূপের ধূমে ও গন্ধে প্রতিমা ও আসর সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সংসারের স্বার্থে উদাসীন পিতা উদাসীন বেশে প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া ভক্তিতে বাষ্পাকুল-লোচনে গদগদ কণ্ঠে সুমধুর পঞ্চমে স্বরচিত ভগবতীর স্তব বেহালার সঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিতে লাগিলেন। শ্রোতাগণ প্রথমে ভক্তিতে রোমাঞ্চিত, পরে ভক্তিতে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা স্তবের একস্থানে "মা রাজরাজেশ্বরী" বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিতেছেন। আমার মাতার নাম 'রাজ রাজেশ্বরী'। প্রাচীনারা তাহা লইয়া অনেক সময়ে মাতাকে ঠাট্টা করিতেন।

কেবল পিতার নহে, কবিতানুরাগ আমার বংশগত। আমার পিতৃব্য মদনমোহন রোগশয্যায় শুইয়া চট্টগ্রাম প্রচলিত বাইশ জন কবি

রচিত একখানি মনসা পুথি নকল করিয়া, তাহার শেষভাগে নিজ নামে কবিতায় একটি ভণিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন।—

"গুজরানিবাসী দীন মদনমোহন,
বহু কষ্টে করিলাম গ্রন্থ সমাপন।"

আর একজন পিতৃব্য অতি সামান্য লেখা পড়া জানিয়াও একটি প্রকাণ্ড যাত্রা রচনা করিয়াছিলেন। পিতৃব্য ত্রিপুরাচরণ সঙ্গীতে মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পারসী জানিতেন। অতি সুপুরুষ, সুগায়ক, সুকবি এবং সকল বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাহার দুই একটি গান এখানে স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রকৃতি বর্ণনা।—

"বিশাল বট-বিটপি-কানন সুখ-সম্বল।
ইহার ছায়াতে হবে রাজসভা সুবিমল।
কি আশ্চর্য্য ফলগুলি,
লোহিত কমল কলি,
নীল নভে যেন শোভে আরক্ত তারামণ্ডল।
উড়ে প'ড়ে ঘু'রে ফিরে কোকিল কোকিলাদল।"

প্রেম বর্ণনা।—

"আমার কোথায় গেল রণ, কোথায় গেল মন,
কি হলো সখি?
শুনিয়ে তার গুণ উড়ে মন-পাখী!
নাচে হৃদয় অনুরাগে,
আঁখি বলে দেখি আগে,
মরমে মিলন জাগে হ'লো একি?
যদি পাই সে রতনে,
হৃদয়ে রাখি যতনে,
নয়নে নয়নে তারে সদায় রাখি।"

প্রেম ও প্রকৃতি—'পার্থ-পরাজয়' পালা হইতে—

"কোথায় কুসুম রথ মলয় মারুত রে!
মনোরথ মত্ত বেগে চল রে, চল রে!
কল কল কোকিল,
মৃদুরবে অলিকুল,
তরুদল ফুল ফলে সকলি সাজ রে!
অনুরাগে গুণময় ফুলধনু ধর রে!
মম পঞ্চ পরাণ সম,
পঞ্চ কোকিল স্বর,
কল কলে প্রমিলার হৃদয় ভেদ রে!"

গোষ্ঠ—

(১)

"বাছা রে! জীবন জুড়াণে! এস ব'সো কাছে!
বেঁধে দি ধড়া চুড়া, ও বাপ! গোঠের বেলা বয়ে গেছে।
বেণুর স্বরে ডাক্‌ছে বলাই,—
'আয়! আয়! আয়! রে কানাই!
তুই বিনা যে যায় না রে গাই
তোর পানে চেয়ে আছে।

(২)

বাছা রে! তোর মার মাথা খা,
গহন বনে যাস না একা,
তুই বিনা প্রাণ যায় না রাখা,
তোর পানে চেয়ে বাঁচে।

তিনি বলিতেন যাহার প্রাণে কবিতা, ও কাণে সুর লাগিয়াছে, তাহার আর সংসার নাই। এরূপ উদাসীনতায় তিনি অম্লান মুখে

একটি বিশাল সম্পত্তি ভাসাইয়া দিয়া অতি দীন হীন অবস্থায় সংসার পিশাচের হস্ত হইতে অপসৃত হন।

কেবল আমার বংশীয়েরা বলিয়া নন, চট্টগ্রামবাসী মাত্র কবিতা-প্রিয়। ৺ শ্যামাচরণ কাস্তগিরি পিতার পরম বন্ধু ও পুত্রবৎ ভক্ত। তাঁহার এবং পিতৃব্য ত্রিপুরাচরণের মত সঙ্গীতজ্ঞ বুঝি চট্টগ্রামে আর জন্মিবে না। শ্যামাচরণের কণ্ঠের তুলনা নাই। আগে পশ্চিম দেশীয় যাত্রার দল আসিয়া চট্টগ্রাম হইতে বৎসর বৎসর বহু অর্থ লইয়া যাইত। শ্যামাচরণ দেশে প্রথমতঃ সখের, তার পর ব্যবসায়ী, দল সৃষ্টি করিয়া স্বদেশীয় বহু লোকের একটি উপজীবিকার এবং সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলনের পথ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি দৃশ্য শৈশবে আমার হৃদয়ে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়াছিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, শীতকাল। শ্যামাচরণ পর্ব্বতোপরি হরচন্দ্র রায়ের দ্বিতল গৃহে বসিয়া স্বরচিত চণ্ডী-যাত্রার গীত পিতাকে ও হরচন্দ্র রায়কে শুনাইতেছেন। পরীক্ষা নিকট, আমরা পড়িতে উঠিলাম। শ্যামাচরণ ঢোলক বাজাইয়া একা গাইতেছেন। তাঁহার অমৃতবর্ষী ফুল্ল কণ্ঠ পর্ব্বত ভাসাইয়া নীরব নৈশগগনে মূর্চ্ছনা খেলিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে। আমরা খোলা পুস্তক ফেলিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ছুটিয়া সেই দ্বিতল গৃহের নীচে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম স্থানটি জনাকীর্ণ। যতদূর পর্য্যন্ত শ্যামাচরণের কণ্ঠ শুনা যাইতেছে, কেহ নিদ্রা যায় নাই। সকলে আমাদের মত সুপ্তোত্থিত হইয়া আসিয়া নীরবে এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শ্যামাচরণ গাইতেছেন—

> "অপরূপ অতি, শুন নরপতি !
>
> কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে।
>
> পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
>
> হেরিলাম কামিনী কমল বনে।

বঙ্কিম-নয়নী, জিনিয়া হরিণী,
কেশবেণী ফণি, বিদ্যুৎ বরণী,
ধরি করিবরে, ধনী গ্রাস করে,
ক্ষণেকে উদগার করিছে বদনে।
ক্ষণে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
চপলা চমকে ক্ষণে কুতূহলে,
ক্ষণে গজরাজে নিক্ষেপে গগনে।"

কি কবিত্বপূর্ণ গীত, কি কবিত্বপূর্ণ শ্যামাচরণের কণ্ঠ! আমি সেই যে শৈশবে একবার এই গানটি শুনিয়াছি আর ভুলি নাই।

এরূপ কত লোকের কত গীত, কত কবিতা, কত বারমাস, কত সারিগান দেশে এক সময়ে প্রচলিত ছিল! তাহার কারণ, আমার মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী। বনমাতার দিগন্তব্যাপী পর্ব্বতমালায় কবিতা তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাঁহার পাদস্থিত নির্ঝর-কণ্ঠে কবিতা অবিরল গীত হইতেছে, তাঁহার নীল ফেনীল সিন্ধু-গর্ভের তরঙ্গ-ভঙ্গে কবিতা লীলাতরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদ-নদী-স্রোতে রজত-ধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধুমুখে ছুটিতেছে। মাতার অধিত্যকায়, উপত্যকায়, বনে বনে কবিতা; বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায়, ফুলে ফলে কবিতা; পর্ব্বত-বিভক্ত পীত শ্যামল শস্যক্ষেত্রে কবিতা। মাতার সমুদ্র গর্জ্জনে কবিতা, নির্ঝরিণীর তর তর কণ্ঠে কবিতা; সংখ্যাতীত বন-বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কবিতা। যাহার এরূপ পিতা, এরূপ বংশ, এরূপ মাতৃভূমি, তাহার হৃদয়ে যে শৈশব হইতেই কবিতানুরাগ সঞ্চারিত হইবে কল্পনার অস্ফুট হিল্লোলমালা খেলিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

কবিতাপ্রকাশ।

"I rose one morn and found myself famous."

অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। বলিয়াছি আমি শৈশবে অতিরিক্ত অশান্ত ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলাম। আমার বয়স যখন দশ এগার বৎসর, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হইতেই গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম। বলা বাহুল্য, সে কবিতার ছন্দবন্দ কিছুই থাকিত না। সে যেন বিহঙ্গশিশুর প্রথম কাকলি। কলিকাতার ভাড়াটে গাড়ীর অপূর্ব্ব ঘোটকদ্বয়ের মত পয়ারের এক চরণ আর এক চরণ হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইত। তবে এখন বাঙ্গালায় তাহা আর দোষের নহে। সেই হিসাবে অভিধান, অর্থপুস্তক, এমন কি, কলিকাতা গেজেট, টি টমসনের বাড়ীর ক্যাটেলগও উৎকৃষ্ট কবিতা। কেবল সুর করিয়া আওড়াইলেই হইল। রসিকচূড়ামণি দীনবন্ধু বলিয়াছেন—"গদ্য কি পদ্য চৌদ্দয় পরিচয়।" এখন আর সে চৌদ্দেরও প্রয়োজন নাই। এখন গদ্য পদ্য হরি হর একাত্মা। জাতিভেদ নাই। শুধু তাহা নহে, পদ্য গদ্যে এবং গদ্য পদ্যে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর আবার সেই পুরাতন কথা—History repeats itself (ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়)। তখন যে গদ্য রচনার অর্থ করা যাইত না, তাহা চূড়ান্ত "মুন্সীয়ানা" বলিয়া পরিগণিত হইত, যে সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইত, তাহা চূড়ান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া

জয় জয়কার উঠিত; এখনও তাহাই হইয়াছে। কবিতাদেবী এখন কায়া ত্যাগ করিয়া ছায়া হইয়াছেন। কায়া সাকার, কাযে কাযে পৌত্তলিক ও অশ্লীল। ছায়া নিরাকার। কিন্তু আমরা মূর্খ পৌত্তলিকেরা নিরাকার ব্রহ্মকে যেমন বুঝিতে পারি না, এই নিরাকার কবিতাও কিছু বুঝি না। যখন দেশে 'মেঘনাদের' বড় প্রাধান্য, তখন গুরু গম্ভীর "দন্তভাঙ্গা" শব্দ যোজনা করিতে পারিলেই মহাকাব্য হইত। আমরা এরূপ একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি—

ত্বিষাম্পতি মহেষাশ সৌমিত্রী কেশরী,
দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত ইন্দুনিভাননা,
পরিবরতিলা, আর নমিলা গমিলা,
মেঘনাদ শবদে স্তবধে পৌরজন।"

এরূপ কাব্যের পরাকাষ্ঠা "দশস্কন্ধ বধ মহাকাব্য" এবং 'সাধারণীতে' তাহার মহা সমালোচনা। 'দশস্কন্ধ' গয়াতে পিণ্ড লাভ করিয়াও যেন আবার ছায়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বন্ধু ঈশান একদিন একজন বিখ্যাত নিরাকার কবির কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া "গঙ্গার জলে গঙ্গা পূজা" করিয়াছিলেন।

"ও সে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল না।
ও সে ব'য়ে গেল, ক'য়ে গেল না।"

ঈশান এ কবিতাটি আওড়াইয়া বলিলেন—"এখনকার ছায়াময়ী কবিতা ছুঁয়ে যায়, নুয়ে যায় না। ব'য়ে ত যায়ই, কিন্তু কিছুমাত্রই ক'য়ে যায় না।"

আমি সেই বয়সেই অনেক কবিতা লিখিতাম। বঙ্গ সাহিত্যের অদৃষ্ট ভাল যে তাহার ছায়াও নাই। থাকিলে একটা জাহাজ বোঝাই

হইত এবং অতি সুপ্রসিদ্ধ কবিতা বলিয়া বিকাইত। কারণ তাহার ছন্দ অওড়াইতে ও অর্থ বাহির করিতে বিজ্ঞ সমালোচকেরও মাথা ঘুরিত। সে সকল আমার সহপাঠীদের ও খেলার সঙ্গীদের পড়িয়া শুনাইতাম। তাঁহারা তাহার অপূর্ব্ব সমালোচনা করিতেন। দুঃখ, তখন বঙ্গদেশ মাসিকে ছাইয়াছিল না। তাহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই! চন্দ্রকুমার অতি বিজ্ঞতার সহিত বলিতেন, কবিতা অন্ধকার যুগে (Dark age) ভিন্ন প্রতিষ্ঠা লাভ (flourish) করে না! অতএব এই আলোকের যুগে এরূপ ব্রতে ব্রতী না হইয়া, যে অঙ্কের নামে আমার মনে ঘোরতর আতঙ্কের সঞ্চার হইত, তিনি তাহারই সেবা করিতে আমাকে বহু জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দিতেন। এরূপে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলে এক দিন ঘটনা-ক্রমে গোঁসাই দুর্গাপুরবাসী পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় আমার সে অপূর্ব্ব কবিতা একটি দেখিলেন। তিনি চন্দ্রকুমারের অন্ধকার যুগের লোকও ছিলেন না। এ ছায়া যুগের লোকও ছিলেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহ দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বুঝাইয়া দিলেন যে চৌদ্দের ত প্রয়োজন আছেই। তাহা ছাড়া কবিতার একটা সরল ও সহজ অর্থও থাকা চাই। কবিতা কেবল কাণ 'ছুইয়া' যাইবে না, হৃদয়ও তাবে 'নোয়াইবে'। কেবল মধুর স্রোতে বহিয়া যাইবে না, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পঁহুছিবে, প্রাণের প্রাণে তাহার প্রাণের কথা কহিয়া যাইবে, এমন কি গভীর রেখায় সেই কথা অঙ্কিত করিয়া যাইবে। তিনি নিজেও কবিতা লিখিতেন, আর সে কবিতা চোরের মত ছায়া দেখাইয়া লুকাইত না, উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে তোমাকে সকল কথা খুলিয়া কহিয়া যাইত। তাহাতে ঘোমটার ভিতর খেমটা থাকিত না। সকলই খোলা মেলা। গুপ্তজা গ্রীষ্ম বর্ণনায় লিখিলেন—

'হে জল, হে জল, বাবা! হে জল, হে জল,!'

সে বৎসর যেমন গ্রীষ্ম, তেমনই বর্ষা। এক পক্ষ যাবত্ চন্দ্র সূর্য্যের সাক্ষাত নাই, মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। দেশ ভাসিয়া যাইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার উত্তরে লিখিলেন—

"খা জল, খা জল, বাবা! যত পেটে ধরে।"

পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ ক্ষেপা হইলেও বড় সরল ও সহৃদয় লোক ছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার অতি সুন্দর অধিকার ও অনুরাগ ছিল। তিনি "বুড় বক্কেশ্বর" নামক 'হুতুমি' ধরণের হাস্যরসোদ্দীপক কাব্য' ও "বাসন্তিকা" নামক আর একখানি সুন্দর গদ্য কাব্যও লিখিয়াছিলেন। এমন শিক্ষক, যে ছাত্রগণকে পুত্রবৎ যত্ন করিয়া শিখায়, আজ কাল দুর্লভ। এখন শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। কোথায়ও বা শিক্ষক খাদক, কোথায়ও বা ছাত্র খাদক। মহামান্য শিক্ষা বিভাগের জয় হউক! দেখিতে দেখিতে যে শিক্ষার উপর মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে তাহার কি দুর্গতিই হইয়াছে। "অপরম্ বা কিং ভবিষ্যতি!" পণ্ডিত মহাশয় দুষ্টামির জন্য আমাকে যেমন ঠেঙাইতেন,—রোজ প্রায় গুরু শিষ্যের মধ্যে একটা scene (দৃশ্যাভিনয়) হইত—আমাকে তেমনি ভালবাসিতেন। প্রহার কার্য্যটাও তিনি এত রসিকতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, এক দিকে তাহা গলাধকরণ করিতাম, অন্য দিকে হাসিতাম। তিনি আমাকে এখন হইতে বড় যত্ন করিয়া কবিতা লেখা শিখাইতে লাগিলেন। তিনি এমন বিচক্ষণ শিক্ষক ছিলেন যে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমাদিগকে সমুদায় ব্যাকরণ অলঙ্কার পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। অতএব আমিও তাঁহার শিক্ষা সহজে গ্রহণ করিতে পারিলাম। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতেই আমাদের একটি সাপ্তাহিক সভা ছিল। শনিবার স্কুলের পর উহার অধিবেশন হইত। ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক চট্টগ্রামের ভুরসী নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ দত্ত এবং পণ্ডিত মহাশয় উহার প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের

নাম আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। সভার নাম "বিদ্যোৎসাহিনী।" ইহাতে আমিই অধিকাংশ লিখিতাম। প্রায় প্রত্যেক শনিবার আমি এক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রসব করিয়া ফেলিতাম। পৈ বেন—"I lisped in numbers and numbers came." পূজোপলক্ষে স্কুল বন্ধ হইতেছে। আহা! সে বন্ধের দিনটা কি সুখের দিনই বোধ হইত! আমি সে দিন এক দীর্ঘ কবিতায় শারদোৎসব বর্ণনা করিয়া সহপাঠীদের কাছে বিদায় লইতাম। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট দীক্ষালাভ করিবার পরের সভায় আমি যে কবিতাটি লিখিলাম পণ্ডিত মহাশয় তাহা পাইয়া একটা তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন। স্কুলে ত একটা হুলুস্থুলু করিলেনই। সবজজ হুগলী নিবাসী নবীনকৃষ্ণ পালিত মহাশয়দের এক সভা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় সেই সভায় আমার কবিতাটি পাঠ করেন। সেখানে আমার জয় জয়কার পড়িয়া যায়। নবীন বাবু আমার পিতার বড় বন্ধু। তিনি পর দিবস কাছারিতে গিয়া পিতার কাছে এ কথা বলেন, এবং আমার যশোধ্বনিতে জজ আদালত বিঘোষিত হয়। বাবা কাছারি হইতে আসিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, নবীন বাবু আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। আমার মাথায় বজ্রাঘাত। একে ত আমি ক্রীড়া ভিন্ন ইহ সংসারে কিছুরই ধার ধারি না। তাহার উপর এখন আবার অপরাহ্ণ, খেলার সময়। বেহারারা আমাকে পিতার তানযানে তুলিয়া রাবণসভাগামী পৌরাণিক বীরের মত লইয়া গিয়া নবীন বাবুর বৈঠকখানায় দাখিল করিল, সভা পদস্থ লোকে পূর্ণ। পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত। তাঁহার 'গরব' দেখে কে? তিনি আমাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। নবীন বাবু বুকে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কবিতাটি পড়িতে আদেশ দিলেন। শিক্ষকের কাণমলা খাইয়া শিশুরা যেমন পড়ে, আমিও সেইরূপ ভাবে পড়িলাম। সকলে ধন্য ধন্য

বলিলেন। নবীন বাবু আমাকে "মিতা, মিতা" বলিতে লাগিলেন। অবশেষে উৎকৃষ্ট আহার্য্য বস্তুতে উদর, এবং উৎসাহে হৃদয়, পূর্ণ করিয়া আমাকে সস্নেহে বিদায় দিলেন। হায়! সেকাল আর এ কাল! আমি কি বাইরণের মত বলিতে পারি না—"আমি এক দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিলাম, আর দেখিলাম আমি বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছি।" আর এক দিন পণ্ডিত মহাশয় আমার ও চন্দ্রকুমারের আঁকা একখানি মানচিত্র (Map) লইয়া নবীন বাবুকে দেখান। দুর্গাচরণ বাবুর কৃপায় আমরা অতি সুন্দর মানচিত্র আঁকিতে পারিতাম এবং তিনি আমাদিগকে এমন অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন, যে কোনও স্থানের চিত্র আমরা না দেখিয়া আঁকিতে পারিতাম। নবীন বাবু দেখিয়া এত ব্যগ্র হইলেন যে, তিনি আমাদিগকে দেখিতে স্কুলে আসিলেন, এবং তাঁহার কাছারির একটি নকসা আঁকিতে বলিলেন। তিনি ভাল ইংরাজি জানিতেন না, অথচ ইংরাজি বলিতে চাহিতেন। তাই অনেক সময়ে এক কথায় আর এক কথা বলিয়া সেরিডানের "স্কুল অফ স্কেণ্ডেলের" অভিনয় করিয়া ফেলিতেন। আমাদের দুই জনকে বলিলেন,—Draw a plant of my cachery. তাহা লইয়া স্কুলে একটা হাসি পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেজস্বী সদনুরাগী ও সুবিচারক ছিলেন। এই দুই দৃষ্টান্তেই তিনি কিরূপ সহৃদয় তাহা বুঝা যাইবে। তাই বলিতেছিলাম—"হায়! সেই দিন আর এই দিন!" এখন আমাদের উচ্চ পদবীস্থ ধর্ম্মাবতারেরা অঙ্গদের সিংহাসনস্থ। কোন বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে পাদপদ্ম নিক্ষেপ করেন না। দেশের কোন হিতব্রতে তাঁহাদের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে না। তাঁহাদের উপাস্য জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট। জীবনব্রত—প্রভুদের সুখতলায় তৈল মর্দ্দন। অভিমানে ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে

উদর স্ফীত, বদন পেচকবৎ গম্ভীর, আলাপও তুথৈবচ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও আগেকার মত কুকার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে প্রভুরা বিষচক্ষে দেখেন।

যাহা হউক আমার হৃদয় নবীন বাবুর উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। আমার স্বাভাবিক প্রবল কবিতানুরাগে জোয়ার ছুটিল। চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত কত বৎসর, কত শনিবার। প্রতি শনিবারে আমার এক এক কবিতা জন্মগ্রহণ করিত। তৃতীয় শ্রেণীতে এক শনিবার এক কবিতায় লিখিয়া ফেলিয়াছি—

"মুসলমানগণ ছুরি নিয়া হাতে,
বিস্মল্লা স্মরিয়া দেয় গরুর কল্লাতে।"

পণ্ডিত মহাশয় সে কবিতা অতি গম্ভীর ভাবে মুন্সী সাহেবকে শুনাইয়া তাঁহাকে ক্ষেপাইতেন। এই কবিতা দুই চরণে এমন ত কিছুই ছিল না। তথাপি মুন্সী সাহেব আমার উপর চটিয়া লাল। ক্রোধে তাহার খঞ্জপদ আরও খঞ্জ হইয়া পড়িল। তিনি ছুটাছুটি করিয়া লাইব্রেরীর অর্দ্ধেক পুস্তক আনিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, এই কবিতা দুচরণের দ্বারা আমি মাহম্মদীয় ইতিহাসের উপর এক চন্দ্রাদিত্যব্যাপী কলঙ্ক সন্নিবেশ করিয়াছি, এবং চন্দ্রাদিত্যব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আমার এই মহা পাপ ক্ষালন হইবে না। বলা বাহুল্য সে দিন আমাদের আর পড়া হইল না। তার পর এমন বিভ্রাটে আর কখনও পড়ি নাই।

My shame in public, my solitary pride.

কলিকাতায় আসিয়াও কবিতা সম্বন্ধে আমার কর-কণ্ডুয়ণ ঘুচিল না। অবসর পাইলে কি ঘরে, কি ক্লাশে, ছাই মাটি লিখিতাম।

ক্লাশে এ কার্য্য বড় ভয়ে, বড় গোপনে, করিতাম। বাঙ্গাল দেশের ছেলে, তাঁহার আবার কবিতা! একদিন সহপাঠী তারক একটি কবিতা জোর করিয়া দেখিল। পড়িয়া বিস্মিত হইয়া আমার গালে একটি ক্ষুদ্র চড় মারিয়া বলিল—"হাঁ রে বাঙ্গাল! তোর পেটে এত বিদ্যে আছে আমি ত জানিতাম না। এ তো বেশ হইয়াছে। তুই লিখিতে অভ্যাস কর্।" তারক কবিতাটি সহপাঠীদিগকে পড়িয়া শুনাইতে চাহিল, আমি কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বাঙ্গাল কবিতা লিখিয়াছে,—শুনিয়া খাঁটি ইয়ার সম্প্রদায় কতই হাসিলেন।

একজন ব্রাহ্ম 'ভ্রাতা' এক 'ভগিনীর' প্রেমে মোহিত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য আকুল এবং দেশাচার রাক্ষসকে বধের জন্য সশস্ত্র। ভগিনীর কাছে একখানি প্রেমলিপি লিখিবার ভার আমার স্কন্ধে পড়িল। লিপিখানি পদ্যে ব্রাহ্ম প্রেমে পূর্ণ করিয়া, দুই ছত্র কবিতা উপরে ও দুই ছত্র নীচে লিখিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিলাম। শেষ কবিতাটি স্মরণ আছে—

"ছিঁড়িয়াছে আশালতা মৃণালের সূত্র যথা
ছিঁড়ে মত্ত করি পদদলনে।
সংসারের সুখ যত, সকলই হয়েছে গত,
কি কায আর দুঃখ-ভার জীবনে!"

ভ্রাতা এই অমোঘ পত্র পড়িয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় ছিল। তিনি উহা একেবারে মাইকেলের দরবারে উপস্থিত করিলেন। একে মনসা, তাহাতে ধূনার গন্ধ। মাইকেল সেই ভ্রাতৃ প্রেম লইয়া "স্পেনস হোটেল" হাসিতে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কবিতা দুটির নাকি বড় প্রশংসা করিলেন, এবং লেখক তাঁহার একজন "চেলা" বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নে আমি কলেজ হইতে বাসায় আসিয়াছি। বাসায় আমরা তিন ব্রাহ্ম। তখন আর একজন মাত্র বাসায় আছে। সে একজন দিগ্‌গজ ব্রাহ্ম। মেডিকেল কলেজে পড়িত। এই "পটাস, পটাস" করিয়া পড়িতেছে। তখনই চোক বুঁজিয়া "হা নাথ!" বলিয়া ধ্যানস্থ। তাহার এক "ডায়রি" ছিল। তাহাতে মনে যখন যে আধ্যাত্মিক ভাব উদয় হইত, তাহা ভবিষ্যৎ মানব জাতির উপকারার্থে লিখিয়া রাখিত। এই দিন আমি কক্ষের এক দিকে বসিয়া পড়িতেছি। ভায়া অন্য দিকে, একবার সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ 'ডায়রি' খুলিতেছেন, বাঁধিতেছেন, পড়িতেছেন ও চোক বুজিয়া ভাবিতেছেন। আবার পড়িতেছেন, আবার ভাবিতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস; মুখ সেই ব্রাহ্মজাতীয় গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ; চক্ষু ছল ছল। ভায়ার 'দশায়' পড়িবার উপক্রম। আমার বড় কৌতূহল হইল। কাছে গিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"তুমি এত তদ্‌গদ চিত্তে কি পড়িতেছ?" ভায়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কিছুই না।"

আমি। কিছুই না?—এই প্রকাণ্ড ডায়রি সম্মুখে,—তোমার এই ভাব?

সে। তোমাকে বলিলে, তুমি ঠাট্টা করিবে?

আ। কি কথাটা বল না?

সে কিছুক্ষণ নীরবে শ্রীরামপুরী কাগজের ডায়রির দিকে চাহিয়া বলিল—"সত্য সত্যই ঠাট্টা করিবে না ত? তোমার পেটে কথা থাকে না। তুমি সকলকে বলিয়া ফেলিবে।" আমি গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলাম—"তুমি আমাকে এমন পাপিষ্ঠ মনে কর যে আমি একটা এমন serious matter লইয়া ঠাট্টা করিব, এবং তুমি নিষেধ করিলেও অন্যের কাছে বলিব?" "তবে বেশ স্থিরভাবে পড়"—বলিয়া

ডায়রিখানি আমাকে দিল। আমি পড়িলাম, পড়িতে পড়িতে আমি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিলাম। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে প্রথম ভাটা পড়িয়াছে। "পরম কারুণিক পরমেশ্বর"—"পাপ, তাপ, পরিতাপ, অনুতাপ,"—"ভ্রাতা", "ভগিনী", "পবিত্র প্রেম", "বিধবারি উদ্ধার"—"কুসংস্কার রাক্ষস," "নির্ম্মল দেশাচার", "দেশের নরপিশাচ কুসংস্কারাপন্ন আলোক বিহীন নরাধমগণ"—ইত্যাদি ইত্যাদি। চারি পৃষ্ঠা লেখা হইতে এ সকল ব্রাহ্মবুলি বাদ দিলে মূল কথাটা এই থাকে যে সে তাহার ভগিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া এক বিধবা চাকরাণী দেখিয়াছে; দেখিয়া ভ্রাতৃভাবে দেশাচার রাক্ষস হইতে হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছে। পড়া শেষ হইলে আমি অতি কষ্টে হাসি ও উদরস্থ উপহাসের তরঙ্গভঙ্গ চাপিয়া রাখিয়া গম্ভীর মুখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া করুণস্বরে বলিলাম—"a pathetic story!" সে বলিল—"বড় শোচনীয়, না? আমি স্থিরভাবে উত্তর করিলাম—"বড়।" কিঞ্চিৎ নীরবে থাকিয়া মনে করিলাম রগড়টা আরও একটুক পাকাইতে হইবে। বলিলাম—"তুমি যদি বল আমি একটা কবিতা লিখিব।" সে গম্ভীর স্বরে বলিল—"আমি বড় সুখী হইব।" যেই কথা, সেই কায। কবিতাদেবী আমার লেখনীর মাথায় চড়িলেন, এবং বাজিকরেরা যেমন বাঁশের মাথায় চড়িয়া বাঁশকে চালাইয়া থাকে, তেমনি আমার লেখনী তিনি চালাইতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে "কোনও এক বিধবা কামিনীর প্রতি" কবিতাটি লিখিয়া তাহাকে খুব গম্ভীরভাবে পড়িয়া শুনাইলাম। সে একেবারে ঢলিয়া পড়িল! বলিল—"কি চমৎকার! কি চমৎকার! তুমি অবিকল আমার হৃদয়ের কথা গুলিন লিখিয়াছ।" সে নিজে একবার দুইবার কবিতাটি পড়িল। এমন সময়ে বেলঘরিয়ার পাগলা উমেশ উপস্থিত। সে উমেশকে

বলিল—কারণ উমেশও ব্রাহ্ম—যে তাহার ডায়রি হইতে একটি ঘটনা লইয়া আমি অতি চমৎকার এক কবিতা লিখিয়াছি। উমেশ ঠাট্টা করিয়া বলিল—"বটে? এ পাগলের পেটে এত বিদ্যা আছে?" উমেশ জানিত না যে, আমি কবিতা লিখিতে পারি। উমেশ একজন সুপাঠক, সাহিত্যে ঘোরতর অনুরক্ত। সে সুর করিয়া অতি সুললিত কণ্ঠে কবিতাটি পড়িল। পড়িয়া গম্ভীর ও বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহার মুখখানি দেখিলেই হাসিতাম, এ গাম্ভীর্য্যে আরও আমার হাসি উথলিয়া উঠিল। উমেশ সেই বিস্মিত ভাবে বলিল—"হাঁ রে পাগলা! তোরে এত দিন আমি চিনি নাই। তুই যে একটি Genius।" তখন একে একে সহবাসী অন্য ছাত্রেরা কলেজ হইতে আসিতে লাগিলেন, আর সেই কবিতা লইয়া একটা তোলপাড় হইল। সকলে এক একবার পড়িলেন। চন্দ্রকুমার কবিতার নায়ককে বলিল—"বটে? এই তোমার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম?" চন্দ্রকুমারটি চিরকাল অব্রাহ্ম। তাহার যে কেমন বেজায় স্থির মাথা, কোন হুজুগে টলে না। ধর্ম্মের উপর আঘাত। নায়ক চটিয়া আগুন হইল। আমার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী ললিত ভৈরবে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি কবিতাটি কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া গবাক্ষপথে নিক্ষেপ করিলাম। আমার সমস্ত কবিতা সে পথে প্রেরণ করিলে এ জীবনে এত ঈর্ষা, এত শত্রুতা এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না।

তখন সঙ্গীরা বড় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। দুই এক জন, যাঁহারা কবিতাটির প্রশংসা শুনিয়া বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন,—পরের প্রশংসা শুনিয়া ও ভাল দেখিয়া, এ জগতে কয়জন মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারেন?—অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু উমেশ ধরিয়া পড়িল যে, কবিতাটি আবার লিখিতে হইবে। আমি এক দিকে অভিমান করিয়া

বসিয়া আছি। ব্রাহ্মভায়া আর এক দিকে গম্ভীর ভাবে বিভৎস রস পরিপূর্ণ 'মেডিকেল' পুস্তক তন্ময়চিত্তে পাঠ করিতেছেন। আমি বলিলাম সে না বলিলে আমি লিখিব না। উমেশ অনেক অনুনয় করিলে সে পুস্তক নিবিষ্ট গম্ভীর ভাবে বলিল—"আমার আপত্তি নাই"। কবিতাটি আমার প্রায়ই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। আমি তখনই লিখিয়া দিলাম। উমেশ উহা লইয়া চলিয়া গেল।

পর দিন কলেজের পর উমেশ তাঁহার একটি সহপাঠীকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। সহপাঠী ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকায়, শ্যাম বর্ণ; আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। মূর্ত্তিখানিতে সৌন্দর্য্য কিছুই নাই; ভাব-মাধুর্য আছে। মুখখানি হাসি হাসি, সরল, সুন্দর, স্নেহময়! দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়। ইনিই স্বনামখ্যাত পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা ছাত্র, সেই বয়সেই 'কবি' বলিয়া পরিচিত। উমেশ তাঁহার পরিচয় দিলে, আমরা তাঁহাকে যেন একজন ছোট 'কেষ্ট বিষ্ণুর' মত দেখিতে লাগিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন,—আমার কবিতাটি পড়িয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বড়ই আদর করিলেন, বড় বাড়াইলেন, বড় উৎসাহ দিলেন। তিনি সুরসিক, সুপাঠী ও মধুরভাষী। সংস্কৃত ইংরাজি, বাঙ্গালা কবিতা অমৃতধারায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন স্বচ্ছ সরোবর—তরল, কোমল, প্রীতিময়। তাঁহার সদ্‌গুণে, আলাপে, ও চরিত্রে আমরা মোহিত হইলাম। তিনি আমাদের মুখে আমাদের শৈল—সমুদ্র—নদ-নদী-নির্ঝরিণী-শোভিতা মাতৃভূমির শোভার বর্ণনা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত প্রাণে বলিলেন,—

"O Caledonia ! stern and wild
Meet nurse for a poetic child !"

তাঁহার ব্রাহ্ম শাস্ত্রীমূর্ত্তি আমি বড় একটা দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার সেই কিশোর কবি মূর্ত্তি আমি ভুলিতে পারি নাই। উমেশ ও শিবনাথ বলিলেন তাঁহারা আমার সেই কবিতাটি "এডুকেশন গেজেটে"—ছাপিতে দিবেন। সর্ব্বনাশ! আমার কবিতা মুদ্রিত হইবে ও কাগজে উঠিবে! এত বড় সম্মান!—এত বৃহৎ ব্যাপার!—আমার হৃৎকম্প হইল। এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, লুকাইয়া লুকাইয়া যে কবিতা লিখি, তাহার ছাপা হইবে ও কলিকাতার লোকে তাহা পড়িবে। 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার আমাদের প্রোফেসার। ভগবানের কি রহস্য তাহা বুঝিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারী বাবু, ও কৃষ্ণদাস পাল তখন বাঙ্গলার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনেরই চরিত্র দেবতুল্য, কিন্তু তিনেরই কদাকার। তিনি আমাদের শ্রেণীতে আসিয়া আমার নামে ছাত্র কে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"উমেশ শিবনাথ যে একটি কবিতা আমাকে দিয়াছে উহা কি তোমার লেখা?" আমি মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন,—"তোমার বেশ শক্তি আছে। তুমি ইহার অনুশীলন কর। তুমি সর্ব্বদা 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবে।" শ্রেণীস্থ ইয়ার অনইয়ার সকলের বিস্ময়পূরিত চক্ষু আমার উপর। এত বিদ্যুতাঘাত সহিতে পারিব কেন? আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"আরে! এ বাঙ্গাল ত কম পাত্র নহে।" কবিতা যথাসময়ে প্রকাশ হইল। Recreation সময়ে কবিতা পাইয়া ছাত্রেরা দলে দলে সে কবিতাটি পড়িতে লাগিল ও আমাকে ঘেরিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি উচ্চদরের সহপাঠীরা কত উৎসাহ দিলেন। "ইয়ারের দল" দুর্গতির

একশেষ করিল। তাহাদের মুখে পূর্ব্ববঙ্গের কত কবিতা কত রূপেই উচ্চারিত হইতে লাগিল। ক্রোধে অধির হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের সহপাঠীরা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের অমার্জ্জিত, ততোধিক ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হালারা বলছিলো কি?" আমি বলিলাম—"খুব প্রশংসা করিতেছিল।" তাঁহারা তখন মুরুব্বিয়ানা ভাবে একটুক হাসিয়া বলিলেন—"তুমি fool, তাই এ হালাদের কথা বিশ্বাস কর। যাহা কিছু বল্‌ছে সব maliciously।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ।

Religion! What treasure untold resides in
that heavenly word."

আমি শৈশবে বড় দেবদেবী ভক্ত ছিলাম। পুতুল না বলিয়া দেব দেবী বলিলে যদি "ভ্রাতারা" বিরক্ত হন, তবে না হয় বলিব আমি বড় পৌত্তলিক ছিলাম। তবে পৌত্তলিক শব্দটি শুনিয়াছি অভিধানবহির্ভূত, কারণ ঐ দেশে উহা নাই। এমন কি নিজের হস্তে কত দেবদেবী গড়িতাম,—ঠাকুর বলিতাম না বলিয়া পশ্চিম বঙ্গবাসীরা ক্ষমা করিবেন— নিজে পূজা করিতাম, নিজে বলিদানের কার্য্যটাও নির্ব্বাহ করিতাম। ব্যায়াম সুখটা বিশেষ তাহাতে ছিল। এই দেবদেবী পূজার জন্য সর্ব্বদা গালি খাইতাম, সময়ে সময়ে বেত্রাঘাতও দক্ষিণাস্বরূপ পাইতাম। কারণ এক দিকে গ্রামের সমস্ত ছেলে মেয়ে জড় হইয়া যে কোলাহল করিত তাহাতে কেবল পরিবারস্থের বলিয়া নহে, গ্রামস্থের পর্য্যন্ত দিবা-নিদ্রার ও সায়হ্ন গল্পের ব্যাঘাত হইত। তাহার উপর খড়্গাঘাতে ঘরের ভিত্তি পাতালে যাইত, এবং বলিদানের কলাগাছ ও এরেণ্ডায় বাড়ীর অপূর্ব্ব শোভা হইত। এই রোগ আমার এরূপ স্বভাবসিদ্ধ ও এত বেশী ছিল, যে শুনিয়াছি আড়াই বৎসর বয়সে আমি কচুর ডগা ধরিয়াছিলাম, আর আমার ছোট পিসী উহা বলিদান করিবার সময়ে আমার দক্ষিণ হস্তের মধ্য অঙ্গুলির অগ্রভাগ বলি দিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার সাক্ষী এখনও চিঙ্গড়ি মাছের চোকের মত নখের দুটি কোণা মাত্র অগ্রভাগ শূন্য অঙ্গুলিতে বর্ত্তমান আছে। দেবদেবীর প্রকৃত পূজারও অভাব ছিল না। গৃহে নিত্য স্থাপিত দেবতারা ত আছেনই। তাহার উপর ধাতুময়ী ছোট ও বড় দুই দশভুজা বংশের এ শাখার সন্তানদের

বাড়ীতে পালা খাটিয়া বেড়ান। তাহা ছাড়া দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ যথা সমারোহে নির্ব্বাহিত হইত। এরূপ প্রত্যেক মাসে হৃদয়ে কি আনন্দ, কি উৎসাহ, কি প্রীতি, কি নব-জীবন সঞ্চারিত হইয়া বাল-হৃদয়কে কি ধর্ম্মের, কি ভক্তির, কি পবিত্রতার দিকেই আকর্ষিত করিত! ক্রমে দেশ নিরন্ন ও বিজাতীয় শিক্ষার কল্যাণে অন্তঃসার শূন্য হইয়া এই অমানুষিক প্রতিভা কল্পিত উৎসব সকল প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আর আজ উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগকে চরিত্র শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের চির নিন্দুক সাহেবগণ ও তাঁহাদের পাদুকা বাহকগণ পাঠ্য পুস্তক সংকলন করিতেছেন! দুর্গতির আর বাকী কি?

যাহা হউক কেবল পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা চরিত্র শিক্ষা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এই দেবদেবীর ভক্তিতেই আমার বাল্য-জীবন জ্যোৎস্নাময় করিয়াছিল। আমি 'রঙ্গমতীর' বীরেন্দ্রের মত—

"মা! মা! ডাকিতাম দশভুজায় যখন,
ভাবিতাম সত্য সেই জননী আমার।
নিরখি হীরকোজ্জ্বল সেই ক্ষুদ্র মুখ
পাইতাম কত সুখ; কত ভক্তিভরে
নমিতাম, চাহিতাম লইবারে বুকে
সেই ক্ষুদ্র প্রতিমায়! গিয়াছে শৈশব;
জননী অভিন্ন জ্ঞান সেই প্রতিমায়
এখনো রহেছে বৎস! হৃদয়ে আমার।"

বীরেন্দ্রের মত আমারও—

"এখনো
সপ্তমি প্রভাতে যবে আনন্দ আরতি
বাজে কর্ণে করি স্নিগ্ধ সুধা বরিষণ,

"নিদ্রান্তে নিরখি নব প্রতিমার মুখ,
কাঁদি আমি অবিরল বালকের মত।"

আমিও বীরেন্দ্রের মত—

"নিশা পূজাকালে সেই অষ্টমী নিশীথে
মায়ের কোলেতে বসি শৈশবে বিস্ময়ে
দেখিতাম প্রতিমার শোভা অপার্থিব,
শত দীপালোকে গৌরী মৃণ্ময়ী কেমন
হাসিতেন চারু হাসি! হাসিত কেমন
তপ্ত কাঞ্চনের বিভা! কাঁপিত করের
কৃপাণ ত্রিশূল, চারু কিরীটের ফুল!
পাইতাম ভয় দেখি বিকট অসুর,—
কেশরী ভীষণতর; দেখিতাম যেন
ঘুরিছে নয়নতারা, ফাটিছে ধমনী।
নীরব মণ্ডপে সেই গভীর নিশীথে
পূজকের মন্ত্রধ্বনি কেমন গম্ভীর
মধুর ঝঙ্কার পূর্ণ, কত সুললিত,
লাগিত বালক কর্ণে! শঙ্কর এখনও
দেখিলে সে অপার্থিব দৃশ্য মনোহর,
শৈশব স্মৃতিতে ভরে উন্মত্ত হৃদয়;
কাঁদি বালকের মত।"

কিন্তু স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলে মাষ্টার আনন্দবাবু আমার হৃদয়ে এক বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। বিদেশীয় ইংরাজি-নবিশেরা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তিনি আমাকেও ব্রাহ্ম করিলেন। ইতর খৃষ্টান ও মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলিত—

"আসিলে আশ্বিন হিন্দু হয় পাগল।
গিড়ার কড়ি দিয়ে কেনে ছাগল।
কায়স্থে কাটে, বামনে খায়।
মাটির ঠাকুর হাঁ করে চায়।"

এতদিন উহা হাসিয়া উড়াইতাম। কিন্তু আনন্দবাবু বুঝাইয়া দিলেন এই মহাবাক্যের মধ্যে গভীর তত্ত্ব আছে। খড় মাটির দ্বারা মানুষের গঠিত ঠাকুর কি প্রকারে ঈশ্বর হইতে পারে? এরূপ পুতুল পূজা 'পৌত্তলিকতা',—কুসংস্কার,—ঈশ্বরের অবজ্ঞা। আর বুঝাইলেন যে ব্রাহ্ম হইলে গোপনে লাড়ু-গোপাল-সন্নিভ বিস্ফারিতাধর পাঁওরুটি ভক্ষণ করা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও সত্যতা হৃদয়ঙ্গম বা উদরস্থ করিতে, আমি পেটুকের জন্য আর অন্য যুক্তির আবশ্যক হইল না। গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া অবধি এই মণ্ডলাকার মহা পদার্থ পাঁওরুটিকে কলিযুগের অমৃত ফল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। দেশের প্রধান জমীদার হরচন্দ্র রায় শীত ঋতুতে তাঁহার বন্ধুদিগকে একটা ব্রাহ্মণ-পক্ক পাঁওরুটির ভোজ দিতেন। পাছে এই দুর্ল্লভ বস্তুর আস্বাদ পাইয়া বালকেরা জাতি দেয়, সে জন্য আমাদের সেই ভোজে যোগদান করিবার অধিকার ছিল না। পিতা উহার বড় প্রশংসা করিতেন। বাইবেলের ঈশ্বরের যে ভুল হইয়াছিল, শাস্ত্রকারদের যে ভুল হইয়াছিল, হরচন্দ্র রায়েরও সে ভুল হইল। ঈশ্বর যদি জ্ঞান-বৃক্ষের ফল "নিষিদ্ধ" করিয়া না রাখিতেন, শাস্ত্রকার যদি হিন্দুদিগকে পাঁওরুটি ও কুক্কুটমাংস খাইতে দিতেন, হরচন্দ্র রায় যদি আমাকে একবারও সেই ব্রাহ্মণ-পক্ক পাঁওরুটির আস্বাদ লইতে দিতেন, তবে আমি কেবল পাঁওরুটির খাতিরে ব্রাহ্ম হইয়া "বঙ্গবাসীর" হিন্দুধর্ম্মে পতিত হইতাম না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। এই মহা প্রলোভনে পড়িয়া ব্রাহ্ম হইতে স্বীকৃত হইলাম।

এক দিন অপরাহ্নে আনন্দ বাবুর বাসায় গেলাম। তিনি জবাকুসুম সঙ্কাশ মলাটে বাঁধা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" খুলিয়া, (দেবেন্দ্র বাবু তখনও মহর্ষি হন নাই) গম্ভীরভাবে পড়িলেন "নমস্তে সতেতে"। কিছুই বুঝিলাম না। "নারায়ণি নমস্তুতে"—মনে পড়িল। আনন্দ বাবু পড়িলেন—"আমাদিগকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও"—বড় চটিলাম। আমার পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু কেহ ত অসৎ নহে, সকলেই দেবতার তুল্য। আমি কোন অসৎ হইতে কোন সতের কাছে যাইব? আনন্দ বাবু পড়িলেন—"আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও"—হাসি পাইল, কিছুই বুঝিলাম না। অন্ধকারের পর আলোক ত আপনিই আসিয়া থাকে। অন্ধকার না থাকিলে ত ঘোরতর বিপদ, ঘুমাইব কি প্রকারে? যাহা হউক চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম পাঁঠার যেমন উৎসর্গ মন্ত্র আছে, এ সকলও বুঝি পাঁওরুটির উৎসর্গ মন্ত্র। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে পাঁওরুটি খাইলাম,—ব্রাহ্ম হইলাম। এইরূপেই দিগ্‌গজ ঠাকুর "আতপ চাউল, ঘৃতের পাক" খাইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। কিন্তু হায় রে হায়? এই পাঁওরুটিই কি জাগরণে ধ্যানে, এবং শয়নে স্বপনে দেখিতাম। ইহার জন্যই কি পেশাদারি হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মটা খোয়াইলাম। এ যে যথার্থই "দিল্লীকা লাড্ডু"! অতিরিক্ত শর্করার সাহায্য না পাইলে যে এই শুষ্ক স্বাদহীন বস্তু গলাধঃকরণ করিতেই পারিতাম না। সহপাঠী অধিক বয়স্ক ভগবান বলিলেন 'ফাউল কারি' না হইলে ইহাতে মজা হয় না। এই দ্বিতীয় পদার্থটা যে কি তাহা আমার কল্পনায়ও আসিল না। আমি ভাবিতে-ছিলাম এই প্রস্ফুটিত শ্বেত পুষ্পনিভ সুকোমল হৃদয় পাঁওরুটি কি প্রকারে হিন্দুর ধর্ম্ম ও জাতি ধ্বংসের বজ্ররূপে পরিগণিত হইল? উহা খাইয়া আমার জাতি ও ধর্ম্ম কোন্ দিক দিয়া কিরূপে বাহির হইয়া গেল তাহাও

কিছুই বুঝিলাম না। দেশে তখন হিন্দুধর্ম্ম ব্যবসার সাপ্তাহিক কি মাসিক কল কারখানা খোলে নাই, কথাটা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না।

কলিকাতায় আসিলাম। তখন মনস্বী রামমোহন রায়ের সদ্য-প্রসূত ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে কলিকাতা সহর বিধ্বস্ত। এই আন্দোলনের নেতা এক দিকে কিশোর কেশবচন্দ্র; অন্য দিকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লাল বিহারী। দুই জনের মধ্যে বক্তৃতায় কবির লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। বাগ্মীতায় কেশবচন্দ্র এবং বিদ্রূপে লালবিহারী অদ্বিতীয়। পরমজ্ঞানী রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে বেদ-উপনিষদ-মূলক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া সংস্থাপিত করেন, এবং তদ্দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের তরঙ্গ অবরোধ করিয়া দেশ রক্ষা করেন। 'পৌত্তলিকতা' পর্য্যন্ত তিনি নিম্ন অধিকারীর জন্য প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন। ইতিমধ্যেই দেশের উজ্জ্বল রত্ন কয়েকটি খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্রও সেই আকর্ষণে পড়িয়াছিলেন। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে আজ দেশ অর্দ্ধেক খৃষ্টান হইয়া যাইত। কিন্তু জ্ঞানে, মানসিক প্রতিভায়, এবং চিন্তাশীলতায় কেশবচন্দ্র রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ছিলেন না। বিশেষতঃ তখনও তিনি ইংরাজের শিষ্য; তাঁহার অপরিণত বয়স। তিনি revelation অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রচারিত শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না। বেদ উপনিষদও revelation মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে সরাইয়া, তাহার স্থানে intuition বা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার স্থাপন করিলেন। এই কেশবচন্দ্রই শেষে কুচবিহারী বিবাহের গরজে ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই revelation বা "আদেশ বাদ" দ্বারা আত্মসমর্থন করিয়াছিলেন। এই জন্যই বুঝি মহাজ্ঞানী শাস্ত্রকারগণ যুগ যুগান্তর ধ্যান করিয়া অবশেষে বলিয়া গিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

যাহা হউক যখন কেবল মনুষ্যের বিবেক-শক্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইল, তখন লালবিহারীর পোয়াবার! লালবিহারী শ্রোতৃবৃন্দকে হাসাইয়া বলিলেন,—যদি ব্রাহ্মধর্ম্মটা কি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিব—"যাহা কেশবচন্দ্র সেন বিবেচনা করেন, যাহা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবেচনা করেন। বিবেচনা ক্রিয়া পদ বর্ত্তমান কালে, সাধন করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মটা কি তাহা বুঝা যাইবে,—যাহা আমি বিবেচনা করি, যাহা তুমি বিবেচনা কর, যাহা তিনি বিবেচনা করেন, তাহাই "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।" কথাটা ঠিক। কেশবচন্দ্রের বিবেচনা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম গড়াইতে গড়াইতে আজ সাড়ে তিন সমাজে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সাড়ে তিন মূর্ত্তি হইয়াছে। অতএব সাড়ে তিন মূর্ত্তয়ে নমঃ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিরলি' হইলেও একেবারে হিন্দুর বেদ উপনিষদ, যজ্ঞোপবীত ও জাতিভেদ এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া intuition বা স্বতঃসংস্কার সম্বল করিতে নারাজ হইলেন। কেশবচন্দ্র গোপাললাল মল্লিকের অপদেবাশ্রিত ছাড়াবাড়ী কণ্ঠস্বরে কম্পিত করিয়া, এবং দেবেন্দ্রনাথের অব্রাহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া, সরিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্র নাথের পুত্র একজন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—"আমিও বক্তৃতা করিব।" অধ্যক্ষ বলিলেন, সেখানে বক্তৃতা করিবার তাঁহার অধিকার নাই। তিনি তখন চীৎকার করিয়া শ্রোতাদিগকে বলিলেন,—"অন্ত স্থানে আপনারা ঢালের অন্তদিক দেখিবেন।" তাহা আর বড় দেখিলাম না। বিশেষতঃ আমরা অজাতশ্মশ্রু বাগ্মিতা-বিমুগ্ধ বালকেরা বুঝিতাম কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্ম সমাজ। আমরাও তাঁহার দলভুক্ত হইয়া পিঠস্থান মেছুয়াবাজারস্থ সমাজ ছাড়িয়া তাঁহার কলুটোলা বাড়ীর সমাজে যোগ দিয়া কলুর বলদের মত ঘুরিতে লাগিলাম। ঈশ্বর গুপ্ত জীবিত ছিলেন না। না হইলে তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া আবার লিখিতেন,—

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
ব্রাহ্মদের দুই জাতি, বেজে গেল ঢোল।"

লাল বেহারী বগল বাজাইতে লাগিলেন। তাহার পর 'বেথুন সোসাইটিতে' কেশবের "Jesus Christ, Europe and Asia" বক্তৃতা। মিশনরিদের মধ্যে টি টি পড়িয়া গেল—কেশব খৃষ্টান হইয়াছে। কেশব যে একজন প্রকৃত কৈশবিক বিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

বলিয়াছি আমাদের বাসায় আমরা তখন তিন ব্রাহ্ম ছিলাম—নবীন, প্যারী ও আমি। তিন জনের ব্রাহ্মত্বের পর্য্যায়ক্রমে নাম লেখা হইল। ইংরাজী নিয়মে বলিতে গেলে—আমি ব্রাহ্ম, প্যারী ব্রাহ্মতর, নবীন ব্রাহ্মতম। প্যারী golden mean ছিল। তাহার অদৃষ্ট ভাল, তাই সে আজ এক জন 'নববিধানী' প্রচারক, আমরা দুই Extremes পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়াছি। আমি অব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলে, নবীন অব্রাহ্মতম। যেমন ক্রিয়া, তেমন প্রতিক্রিয়া! মাঘ মাসে দারুণ শীতে পাতকুয়ার বরফের মত জলে প্রত্যুষে স্নান করিয়া আমরা পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে উড়ানি মাত্র গায়ে দিয়া,—না হয় 'ত্যাগ-স্বীকার'—প্রত্যেক রবিবার কেশব বাবুর বাড়ীতে ছুটিতাম। রবিবার ব্রাহ্মদের উপাসনার দিন হইল কেন? রবি বাবুর এক গানে আছে—"নিশি দিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মতে বাসিও।" এ ও অবসর মতে উপাসনার জন্য কি? বর্ত্তমান ব্রাহ্মদের উপাসনার দিন, উপাসনার মন্দির, উপাসনার পদ্ধতি, আচার ব্যবহার, সকলই খৃষ্টানদের নকল। তবে না মাছ, না পক্ষী, অবস্থায় না থাকিয়া তাঁহারা সোজাসুজি খৃষ্টান বলিয়া স্বীকার করেন না কেন? কেশব বাবুর বৈঠকখানায় কথিত নূতন দলের সমাজ বসিত। এরূপে কিছু দিন গেল। আর এক দিন প্রভাত

হইতে বেলা এগারটা হইল, তথাপি উপাসনা শেষ হয় না। বড় বিপদের কথা। একে ত মানুষের মন। গোশৃঙ্গে সর্ষপ যতক্ষণ থাকিতে পারে ততটুক কালও অবলম্বন-হীন হইয়া মানুষের মন থাকিতে পারে না। তাঁহাতে বালকের মন। খাঁটি পাঁচ ঘণ্টা কাল নিরাকারের চিন্তা কিরূপে করিবে? আমি চক্ষু না খুলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। কি হাস্যকর দৃশ্য! ব্রাহ্মগণ চক্ষু বুঁজিয়া এত বিভিন্ন ও বিকট প্রকারে মাথা ঘুরাইতেছেন যে, তাহার আকৃতি কোন ক্ষেত্রতত্ত্ববিদের চৌদ্দপুরুষেও কল্পনা করিতে পারে নাই,—কত circle, semi-circle, ellipse, parabola, hyperbola! আমি আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও কার্য্যটা মুখে কাপড় দিয়া করিয়াছিলাম, তথাপি পার্শ্বস্থ পাগল উমেশের ধ্যান ভঙ্গ হইল। সে আমাকে একটা বিষম ভ্রূকুটি করিল। কিন্তু দৃশ্যটা দেখাইলে, সেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কেবল স্বয়ং কেশব বাবু মাত্র স্থির ভাবে শিব-নেত্র করিয়া, স্থাপিত দেবমূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন। কতক্ষণ পরে তাঁহারও উপাসনা শেষ হইলে, চক্ষু মেলিয়া চসমা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রচারকাঙ্কুরদের শিরঘূর্ণন আর থামে না। আমি শেষে জালাতন হইয়া শিষ্টাচারের খাতির না করিয়া উঠিলাম। উমেশও উঠিয়া আসিল। বলা বাহুল্য প্যারী নবীন রহিল। পথে আমি উমেশকে বলিলাম আমি আর ব্রাহ্ম সমাজে যাইব না। একে ত সে দিনের অব্রাহ্ম হাসি ও ব্যবহারে সে আমার উপর চটিয়াছিল, ইহাতে আরও চটিল। আমি বলিলাম—"আমি ভাই! নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনন্ত, অচিন্ত্য ব্রহ্মের চিন্তা করিতে এক মুহূর্ত্তও পারি না, পাঁচ ঘণ্টা ত অনেক দূর। আচ্ছা ভাই! মন খুলিয়া বল দেখি, তুমি কিসের উপর মন স্থাপিত করিয়া চিন্তা কর? একটা কিছু ত মনের অবলম্বন চাই?" উমেশ বলিল সে উপাসনার সময়ে একটা কালো

মহা বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি কল্পনা করে। পাপীর দণ্ডের জন্ত তাহার কাঁধে এক ভীষণ গদা। আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"তবে তোমার মত এমন জড় পৌত্তলিক ত ভূভারতে নাই। আমাদের এমন সুন্দর দেব দেবীর মূর্ত্তি ফেলিয়া, এই মহা দৈত্য মূর্ত্তির উপাসনা করি কেন?" পাগলের চক্ষু স্থির হইল। সে আমার স্কন্ধে হাত দিয়া আমার দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার আরও হাসি পাইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, চল এক কর্ম্ম করি। এখন ইহাতে আমরা সূর্য্যের মত একটা প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্মান পদার্থ কল্পনা করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া উপসনা করিব।" আমি বলিলাম—"তাহা হইলে আমরা সূর্য্য উপাসক, কি পার্শিদের মত অগ্নি উপাসক, হইয়া জড় পদার্থের উপাসক হইব।" উমেশ এবার একেবারে অবাক হইল। কিছুক্ষণ পরে হাসিয়া বলিল—"পাগল! তোর পেটে এত বিদ্যা আছে আমি ত জানিতাম না। আচ্ছা কথাটা কাল দুজনে কেশব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিব।" আমি বলিলাম, যেরূপ হইয়া থাকে, তিনি এক মহা দার্শনিক ব্যাখ্যা করিবেন, আমি তাহার কিছুই বুঝিব না। আমি যাইব না। উমেশ পরদিন কেশব বাবুর কাছে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তুই ঠিক বলিয়াছিলি। তিনি কি যে এক দার্শনিক ব্যাখ্যা করিলেন, আমি কিছুই বুঝিলাম না।" আমি সে দিন হইতে ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িলাম, এবং কর্ণহীন ক্ষুদ্র তরীর মত সংসার সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম।

"Hold., hold, my heart;"
And you, my sinews, grow not instant old,
But bear me stiffly up!"

ভাদ্র মাস। চারিটার পর কলেজ হইতে আমি ও চন্দ্রকুমার যেরূপ সর্ব্বদা আসিয়া থাকি, এক সঙ্গে আসিলাম। দেখিলাম সহপাঠীরা সকলে কেমন বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন, কেহ যেন পড়িতেছেন, কেহ যেন কি ভাবিতেছেন। দুই এক জন সকরুণভাবে আমার দিকে চাহিতেছেন, বাসাবাটী নীরব। কেহ একটি কথাও কহিতেছে না। আমি পুস্তক রাখিয়া আমার বড়বাজারের ছাত্রকে পড়াইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, দাদা বলিলেন,—"আজ তুমি কোথায়ও যাইও না।" বুক যেন ধড়াস্ করিয়া উঠিল। দারুণ ব্যথা অনুভব করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন? তিনি অধোমুখে সজল নয়নে নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া বসিয়া চন্দ্রকুমার একখানি পত্র পড়িতেছেন, তাঁহার মুখ মলিন, চক্ষু ছল ছল। আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। বসিয়া পড়িলাম। চন্দ্রকুমার উঠিয়া আমার কাছে সজল নেত্রে আসিয়া পত্রখানি আমার হাতে দিল। গৃহ নিস্তব্ধ, সহপাঠীদের যেন নিশ্বাস পর্য্যন্ত বহিতেছে না। হরকুমার ও আমার বন্ধু দ্বিতীয় চন্দ্রকুমারও সজল নয়নে আমার কাছে আসিয়া বসিল। আমার হাত কাঁপিতেছিল, শরীর কাঁপিতেছিল, প্রাণ কাঁপিতেছিল। আমি পড়িতে পারিতেছিলাম না। অতি কষ্টে বহুক্ষণে পড়িলাম,—আমার মাতৃপ্রতিম কোমল-হৃদয় করুণাসাগর পিতা তাঁহার পার্থিব দেবলীলা শেষ করিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। আর পড়িতে পারিলাম না। আমার মস্তক যেন বোমের মত বিরাট শব্দে শতধা ফাটিয়া গেল। আমার হৃদয়ে কি এক

প্রলয় ঝটিকা বহিয়া, হৃদয় উড়াইয়া লইয়া কি এক জলন্ত মহা মরুভূমির মধ্যে ফেলিল। তাঁহার আমার মনে নাই।

যখন সংজ্ঞালাভ করিলাম দেখিলাম আমার আজীবন সুহৃদ্ সহোদর-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রকুমারের স্নেহ ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছি। সহবাসীরা সকলে আমাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। দুই এক জন ছাড়া সকলের চক্ষু সজল। হরকুমার ও দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার আমার দুই হাত অতি স্নেহে ধরিয়া চন্দ্রকুমারের মত কাঁদিতেছে। আমার চক্ষে জল নাই। হৃদয়ের ও শরীরের ক্রীড়া যখন রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন চক্ষে জল কোথা হইতে আসিবে? তখনও আমার মস্তিষ্ক, কর্ণ, ও হৃদয় সাঁ। সাঁ। করিতেছিল। বিশ্ব-সংসারে যেন প্রকাণ্ড ঝটিকা বহিতেছিল। যেন পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহসকল কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। বন্ধুগণ অতি করুণকণ্ঠে আমাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। নানারূপ সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি কিছুই বুঝিতেছিলাম না। তাঁহারা যেন আমার অজানিত কোন ভাষায় কি দুর্জ্ঞেয় কথা বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সে ঝটিকা-গর্জ্জন কিঞ্চিৎ থামিয়া আসিল। পত্রখানি আবার শুষ্ক নয়নে পড়িলাম। জনৈক পিতৃব্য পত্রখানি দাদার কাছে লিখিয়াছেন। আমার করুণাময় পিতা হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে, চলিয়া গিয়াছেন।

স্বভাবতঃ তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, সবল, সরল ও সুন্দর ছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। কিন্তু তিনি কঠোর তপস্যায় সে শরীর ধ্বংস করিতেছিলেন। কার্য্যস্থানে যে পাঁচ ছয় ঘণ্টা থাকিতেন, তদ্ভিন্ন সমস্ত সময় পূজায় ও আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন। আহারের নিয়ম মাত্রও ছিল না। নিদ্রা প্রায় ঘটিত না। সমস্ত রাত্রি পূজা করিয়া শেষ রাত্রিতে অতি সামান্য আহার করিয়া দুই ঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতেন।

কোনও দিন তাহাও হইত না, পূজায় রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। এত অত্যাচার শরীর সহিবে কেন? তন্নিবন্ধন বৎসর বৎসর এ সময়ে "জররোগগ্রস্ত" হইতেন। তাহার উপর ডাব ও আনারস ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না। তাঁহার দূর সম্পর্কে খুড়া এবং অভিন্নহৃদয় কালী কিঙ্কর সেন কবিরাজের ভিন্ন অন্য কারও ঔষধ খাইতেন না। তিনি অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। এত অত্যাচারের, এত কুপথ্য ব্যবহারের, পরও তাঁহাকে বৎসর বৎসর বাঁচাইয়া তুলিতেন। এবারও সেরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া গ্রামের বাড়ীতে আসেন। রোগ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পায়। কবিরাজ মহাশয় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোধান হয়। তিনি যে এবার বাঁচিবেন না, তিনি নিজে বুঝিয়াছিলেন। বাড়ী যাইবার সময়ে তাঁহার বন্ধুদিগের কাছে এ কথা বলিয়া ইহজীবনের মত বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন। যে দিন পৃথিবী ত্যাগ করিলেন, সেই দিন প্রাতে আমাদের গোমস্তার কাছে বলিয়াছিলেন—"আমি সকলকে দেখিলাম, আমার নবীনকে দেখিলাম না।" না পিত! এই আসন্ন সময়ে তোমার চরণ সেবা করিবে, নয়ন ভরিয়া একবার দেখিয়া লইবে, চরণ দুখানি বক্ষে ও শিরে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে প্রক্ষালন করিয়া তাহার অকৃতিত্বের জন্য ক্ষমা চাহিবে ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবে, তাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছিলেন না। তোমার সন্তানদের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী। সে তোমার কি মাতার অন্তিম সময়ে দর্শনলাভ করিবে, তাহার এমন পুণ্য ছিল না। একবার ইহজীবনের জন্য প্রাণ ভরিয়া বাবা ও মা বলিয়া ডাকিয়া লইবে, তাহাও তাহার কপালে ছিল না। আটত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। তথাপি আজ তাহার হৃদয়ে এই কাতরতা, এই দুঃখ, এই শোক, সজীব রহিয়াছে।

বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিলে বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল, বাহিরে বারাণ্ডায় বিছানা করিয়া দিতে পিতা ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। মাতা তাহাতে অসম্মতা হইলেন। পিতা বলিতেন, এবং মাতাও বিশ্বাস করিতেন, যে তাঁহার কক্ষে থাকিলে পিতাকে কখনও মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারিবে না, কারণ সে কক্ষে পিতার পূজার বেদী স্থাপিত আছে। মাতা সেজন্যই বিছানা বারাণ্ডায় লইতে দিবেন না। সত্য সত্যই এখানে থাকিলে আমার সাবিত্রী মাতার অঙ্ক হইতে মৃত্যু আমার সত্যবান পিতাকে বুঝি লইয়া যাইতে পারিত না। পিতারও সেরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তবে কঠোর সংসার যন্ত্রণায় তাঁহার কোমল হৃদয় এত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল যে তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। তিনি কিন্তু মাতার কাছে সে ভাব গোপন করিতেন। মাতা সংসার চিন্তায় অস্থিরা হইলে, পিতা আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন—"তোমার ভয় নাই। আমি আশা-লতা রোপণ করিয়াছি। তোমার কোন দুঃখ হইবে না।" সে দিন যদিও তিনি জানিতেন উহা তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ দিন, তথাপি মাতাকে স্থির রাখিবার জন্য মধ্যাহ্নে আহারের সময় তাঁহার বালিকা পুত্রবধূকে বলিলেন—"মা! মাছের ব্যঞ্জন বড়ই ভাল হইয়াছে। আধা আমার রাত্রির আহারের জন্য রাখিয়া দেও।" তাহার রান্না তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। মাকে বলিলেন—"তুমি দেখিতেছ না, কত লোক আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। এখানে তাহাদের বসিবার স্থান হইবে কেন?" মা আর আপত্তি করিলেন না। তিনি জানিলেন না যে পিতা তাঁহার কক্ষ হইতে এক্ষণে সজ্ঞান স্থিরভাবে ইহজীবনের মত বিদায় হইয়া চলিলেন। জানিলেন না যে, সেই দিন তাঁহার জীবন-দুর্গোৎসবের 'বিজয়া দশমী। জানিলেন না যে, তাঁহার গৃহ কক্ষের, তাঁহার হৃদয় কক্ষের, অধিষ্ঠিত দেবতা কক্ষ শূন্য করিয়া চলিলেন।

বারাণ্ডায় শুইয়া প্রসন্নমুখে সমবেত পিতৃব্য ও আত্মীয় ও গ্রামবাসী-দের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ মধুর সম্ভাষণ করিতে ও গল্প করিতে লাগিলেন। কেহ ঘুণাক্ষরেও বুঝিল না যে তাঁহার আসন্ন সময়। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া চলিলেন; ভৃত্য ধরিতে চাহিল, নিষেধ করিলেন। যষ্টি ভর করিয়া ছুই চারি পা গেলে, মস্তক হেলিয়া পড়িল। পড়িয়া যাইতে-ছিলেন, ভৃত্য ও পিতৃব্যেরা উঠিয়া ধরিলেন। দেখিলেন সময় উপস্থিত, একবারে প্রাঙ্গণে তুলসি তলায় লইয়া গেলেন। অকস্মাৎ বাড়ীতে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। সেই হাহাকার গ্রামময় হইল। সমস্ত গ্রামের লোক হাহাকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। সে হাহাকারের মধ্যে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, তাঁহার স্নেহ-পাত্র, ভাগ্যবান ভ্রাতষ্পুত্র, বালক রমেশ নির্ব্বাহ করিল। পিতা হাসিতে হাসিতে প্রসন্নমুখে যেন নিদ্রিত হইলেন। সে অনিন্দ্য সুন্দর বদনের একটি রেখাও বিকৃত হইল না। সেই সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ কিঞ্চিৎমাত্র বিবর্ণ হইল না। পিতা পূজার সময়ে যেরূপ শিবনেত্র হইয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন, ঠিক সেইরূপ হইয়া রহিয়াছেন। আমার চারটি কনিষ্ঠা ভগিনী,—ছুইটি বিবাহিতা, ছুইটি অবিবাহিতা, এবং তাহাদের ছোট ছয়টি শিশু ভ্রাতা। তাহার মধ্যে একটি ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়া পিতার অপেক্ষা করিতেছিল। তাহা না হইলে এতাদৃশ সন্তান-বৎসল পিতার স্বর্গেও বুঝি তৃপ্তি হইত না। ভাদ্র মাস। প্রাঙ্গন এখনও কর্দ্দমময়। অনাথ শিশু পুত্রকন্যাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি দিয়া শরীর কর্দ্দমময় করিতেছিল, এবং পিতাকে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরও কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিল। মাতার ও অন্য আত্মীয়গণের শরীরও কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিল। তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। যে পিতা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সোনার শরীর কর্দ্দমে শোয়াইয়া রাখিয়াছে দেখিয়া

তাহারা সকলে গালি দিতে লাগিল, এবং টানাটানি করিয়া ঘরে লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আত্মীয়েরা কিছুতেই বারণ করিতে পারিতেছে না। কেই বা বারণ করিবে? এই দৃশ্য দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারিতেছ! কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া পিতা প্রকৃত সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়াছেন। ভ্রাতা ভগিনীগণ ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী শিশু সাজিয়াছে। পিতা আজীবন সন্ন্যাসী; সংসার কি চিনেন নাই। ভ্রাতা ভগিনীগণ! তোরা তাঁহাকে উপযুক্ত বেশে বিদায় দিয়াছিস। কেবল তোদের এই হতভাগা দাদা পিতার সে পবিত্র বেশ দেখিল না। পিতাকে সেই পবিত্র বেশে সাজাইতে পারিল না, পিতার সেই পবিত্র অঙ্গলিপ্ত কর্দ্দম একবার আপনার অঙ্গে মাখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিল না।

এ সকল বৃত্তান্ত পত্রে লেখা ছিল না। আমি পরে বাড়ী গিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পত্র পাঠ শেষ করিয়া এই শোক দৃশ্যের অভিনয় আমি কল্পনার চক্ষে পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। এতক্ষণে আমার চক্ষে জল আসিল। সে অশ্রুস্রোত এ জীবনে রুদ্ধ হইবে না। আটত্রিশ বৎসর পরে আজ ঠিক সেইরূপে এই কাগজ সিক্ত করিল।

অকূল-সাগর।

"A shipwrecked Sailor hast thou been,—
misfortune's mark ?"

আমার এমন পিতা! দুইদণ্ড প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া, শোকের আবেগ অশ্রুধারায় প্রবাহিত করিয়া, শান্তি লাভ করিব, বিধাতা তাহাও আমার কপালে লিখিয়াছিলেন না। পিতা যে আমাদিগকে কি অকূল-সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাহার ভাবনায় নয়নের বারি নয়নে নিবারিত হইল। পিতার যে কোনওরূপ পীড়া হইয়াছিল, আমি তাহার সংবাদ মাত্রও পাই নাই। এক মুহূর্ত্ত মধ্যে যে মানুষের অদৃষ্টে এমন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, এক মুহূর্ত্ত মধ্যে মানুষ যে এরূপ অকূল অনন্ত বিপদসাগরে আকাশ হইতে অকস্মাৎ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা প্রথমতঃ আমি ধারণাই করিতে পারিলাম না। আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে, আমার পিতা নাই, এক মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার এ অবস্থা ঘটিল। পিতা যাবজ্জীবন যাহা বলিয়া আমাকে শাসাইতেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়া গিয়াছেন; তিনি বাক্সে একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। তাহার উপর বহু সহস্র ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। একটি প্রকাণ্ড পরিবার—পাঁচটি শিশু ভ্রাতা, এবং দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী, একটির বিবাহকাল উপস্থিত, বিধবা মাতা, বিধবা খুড়ী ও এক খুড়তুত ভ্রাতা। তাহার পর আমার শাশুড়ী ও তাঁহার অনাথ শিশুপুত্র। মাতুলের একটি অনাথ পরিবার। অনাথা মাসী। দুই পিসী ও তাঁহাদের দুটি পরিবার। এতগুলি পরিবার আশ্রয়হীন হইয়াছে। ফলতঃ আমার রক্ত যতদূর গিয়াছে সর্ব্বত্র দরিদ্রতা। সকলেই এক বজ্রাঘাতে আশ্রয়হীন, উপায়হীন, হইয়াছে। পৈতৃক জমীদারির

স্বত্বাংশ যাহা মোকদ্দমার পর পিতৃব্যেরা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাও আবার তাঁহাদের বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বয়বাদ সিদ্ধ করিয়া তাহাও লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য ইঁহারা পিতার সহোদর ভ্রাতা নহেন। সহোদর ভ্রাতা তিনজন ইতিপূর্ব্বেই পার্থিব যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা আমার বংশ সম্পর্কে পিতৃব্য মাত্র। অন্য এক পাপিষ্ঠ তাহার ঋণের তিনগুণ পাইয়াও অবশিষ্ট টাকার জন্য ডিক্রি জারি করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি, ভদ্রাসন বাড়ী খানি পর্য্যন্ত, পিতার শ্মশানের অগ্নি নির্ব্বাণ না হইতে নিলামে তুলিল। মাতা অতি সরলা। সংসারের কিছুই বুঝেন না। পিতৃব্যেরা বুঝাইলেন এমন সম্পত্তি আমি হাইকোর্টের জজ হইলেও মাতা পাইবেন না। হতভাগিনী মাতার, এবং তাঁহার অভাগিনী বালিকা পুত্রবধুর যাহা অলঙ্কার ছিল, তাহাও বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিলেন। আর আপনারা বণ্টক করিয়া সকলে কিনিয়া লইলেন। সে টাকার দ্বারা নিলাম ডাকিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট টাকা মা কোথা হইতে দিবেন? সে টাকাটা পিতৃব্য একজন দিয়া নিজে সম্পত্তিটা কিনিয়া লইলেন। সম্পত্তি ত গেলই, এ কৌশলে মাতার ও স্ত্রীর যাহা অলঙ্কার ছিল, তাহাও গেল। শুনিয়াছি বালিকা পুত্রবধুর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতে স্নেহময়ী মা বড় কাঁদিয়াছিলেন। পিতা সংসারে এত বীতরাগী ছিলেন, অর্থ প্রতি তাঁহার এত অশ্রদ্ধা ছিল যে, কখনও মাতা কোন অলঙ্কার গড়াইয়া দিতে বলিলে বরং মহা বিরক্ত হইতেন। মাতা গৃহস্থি খরচ চালাইয়া যাহা বাঁচাইতে পারিতেন, তাহার দ্বারা এ সকল অলঙ্কার গড়াইতেন। অম্লানবদনে আপনার ও আপনার সন্তানদের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্রবধুর অলঙ্কার খুলিয়া দিতে মাতার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। পিতার শোকের

উপরে এই দারুণ আঘাতে আহা ! মা আমার যে অসহনীয় দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারও অকাল মৃত্যু ঘটিল। এত দুঃখের অলঙ্কারগুলিও শেষে পিতৃব্যেরা বণ্টন করিয়া লইলেন। বহু বৎসর পরে মাতার নিদর্শন স্বরূপ রাখিবার জন্য একখানি গহনা, উচিত মূল্যেরও অধিক দিয়া আমি তাঁহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম ! পাইলাম না। সরলা মাতা শেষ সম্বলও এইরূপে হারাইলেন। এখন এতগুলি পরিবারের উপায় কি ? এ দারুণ চিন্তায় আমার চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইয়া গেল। এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে ? ইহার উত্তর যে মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। নিরুপায়ের উপায় ভগবান ভিন্ন ইহাদের উপায় কি আছে ? সেই অনাথের নাথকে ডাকিলাম। তাঁহার চরণে ইহাদিগকে সমর্পণ করিলাম।

পিতৃব্যগণ আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া, আমার উপর ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে আমার শিক্ষার ঘোরতর প্রতিকূল ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন বিধাতা তাঁহাদের প্রতিকূলতার পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহারা যুক্তির উপর যুক্তি খাটাইয়া আমার সরলা মাতার নামে পত্র লিখিয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ শিক্ষার আশা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী যাইতে লিখিলেন। কখন বা লিখিলেন তোমার যে সম্পত্তি চলিয়া যাইতেছে, তুমি হাইকোর্টের জজ হইলেও তাহা পাইবে না। কখন বা ঘোরাল বর্ণে আমার নিরাশ্রয় পরিবারের দুরবস্থার ছবি চিত্র করিয়া পাঠাইলেন। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় আমি পিতার কাছে সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, পিতা সে সকল পত্র তাঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহারা আজ আমারই ভাষার দ্বারা শাণিত অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এক এক খানি পত্রে আমার দেবী

মাতার ও দেব-শিশু ভ্রাতা ভগিনীদের এমন হৃদয়বিদারক বর্ণনা অঙ্কিত হইত যে, আমি মাটিতে বুক রাখিয়া কাঁদিতাম। এ দিকে কলিকাতার দুই চন্দ্রকুমার ও হরকুমার ভিন্ন আর সকলেই, দাদা পর্য্যন্ত, বাড়ী যাওয়া উচিত বলিতে লাগিলেন। যাইতেছি না বলিয়া কেহ কেহ তিরস্কার, কেহ মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ পর্যান্ত, করিতে লাগিলেন। নির্ম্মম সংসারের চারি দিকের অস্ত্রাঘাতে আমি ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি বাড়ী যাইয়া কি করিব? সম্পত্তি রক্ষা করা দূরে থাকুক, এক মুষ্টি অন্নও ত দুঃখিনী মাতাকে দিতে পারিব না। বি, এ পরীক্ষার আর তিন মাস মাত্র বাকী। এ সময়ে বাড়ী গেলে পরীক্ষা আর দিতে পারিব না। ভবিষ্যতে বিদ্যাভ্যাসের আশা গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে কুড়ি পঁচিশ টাকার কেরানিগিরি কি অন্য কোন চাকরি ভিন্ন আর কিছু যুটিবার সম্ভাবনা নাই। তদ্দ্বারা এ পরিবার কি প্রকারে প্রতিপালন করিব? পিতা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন, আমি কুড়ি পঁচিশ টাকা দ্বারা কি করিব? অথচ কলিকাতায় থাকিয়াই বা কি করিব? থাকিবই বা কি প্রকারে? পিতার মামাত ভাই কাশী বাবু কলিকাতায় আমাদের বাসায় থাকিয়া হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। পিতা কতবার আপনার পদ ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহার ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল। তিনি দেশের মধ্যে একজন প্রধান জমীদার ও সহৃদয় লোক বলিয়া পরিচিত। তিনি পিতাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলে শত টাকা ব্যয় করিতেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ যখন কলিকাতায় পঁহুছে, তখন তিনি আমাদের বাসায় ছিলেন। কিন্তু তিনি যেরূপ শোকাতুর হইবেন, মনে

করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই দেখিলাম না। আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। আমি দেখিয়াছিলাম পিতার সাংসারিক অবস্থা যত মন্দ হইতেছিল, তত তাঁহার আত্মীয়তাও কিছু কমিয়া আসিতেছিল। আমরা মনে করিতাম তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা আমাদের জমীদারি মোকদ্দমার আপীল করিয়াছিলেন না বলিয়া তিনি এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার দারুণ জিদ ও মোকদ্দমা প্রিয়তা দেশ খ্যাত। আদালত-কুরুক্ষেত্রে তিনি একজন ভীষ্ম মহারথী। আমার অদৃষ্ট-আকাশ হইতে পিতৃসূর্য্য অস্তমিত হইলে, আমি ধ্রুব নক্ষত্রের মত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলাম। এ বাসায় থাকিয়া আমার সাহায্য না করিলে লোকে নিন্দা করিবে, কেন না পিতার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা, এবং পিতার কাছে তিনি যে অশেষরূপে উপকৃত। পিতা না থাকিলে তাঁহার যে, গৃহের ভিটার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না, তাহা সকলেই জানে। অতএব তিনি ম্লানমুখে আমাকে পাঁচটি টাকা মাত্র ভিক্ষা দিয়া পিতার মৃত্যু-সংবাদ আসিবার চারি পাঁচ দিন পর খিদিরপুর গিয়া এক বাসা করিলেন। হায় রে সংসার! অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যে এক ভেলার উপর বক্ষঃ রাখিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহাও ভাসিয়া গেল। তখন সম্পূর্ণরূপে উপায়হীন হইয়া ধরাতলে বক্ষঃ রাখিয়া অশ্রুজলে মাতা বসুন্ধরার বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলাম—"মাতা তোমার বক্ষঃই দীন হীনের একমাত্র আশ্রয়।" স্বর্গীয় পিতাকে ডাকিলাম। দেখিলাম পিতা পূজায় যেরূপ পদ্মাসনে বসিতেন, সেরূপ ত্রিদিবে পুণ্যালোকে বসিয়া সুপ্রসন্ন মুখে সস্নেহ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি পিতার এ প্রসন্ন মূর্ত্তি সর্ব্বদা স্বপ্নে দেখিতাম। পিতা জপ করিতেছেন, ললাট চুম্বন করিতেছেন। আর সেই অলৌকিক শান্তিভরা হৃদয়ে বলিতেছেন—"বৎস! শান্তি!" আর ডাকিলাম সেই দীনবন্ধু

কৃপাসিন্ধু বিপদ-ভঞ্জন হরিকে। অনাথের প্রার্থনা অনাথনাথ শুনিলেন। কলিকাতার পথের ভিখারী পিতৃহীন যুবকের মনে অপরিমেয় সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত হইল, এত উৎসাহ একটি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর মনেও সঞ্চারিত হইতে পারে না। স্থির করিলাম বাড়ী যাইব না। জীবন্ত উৎসাহে মাতার কাছে এরূপ ভাবে লিখিলাম—"মা! ভয় নাই। তুমি তিনটা মাস কোন মতে দুঃখে কষ্টে কাটাও। আমি তিন মাস পরে বি, এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিব। পিতা সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই; আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এত পুণ্য, আমাদের কখনও কোন কষ্ট হইবে না। তাঁহার পুণ্যে তাঁহার "আশালতায়" সুফল ফলিবে। দুর্গতিহারিণী দুর্গা আমাদের কুলমাতা। তুমি তাঁহার চরণে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাক; কুলমাতা আমাদিগকে কূল দিবেন।" প্রত্যেক পত্রে আমার সহৃদয় পিতৃব্যগণ লিখিতেন—"তোমার পিতা এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশ রাখিয়া গেলেও তোমার আজ লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকিত। তিনি তোমাদিগকে একেবারে ডুবাইয়া গিয়াছেন।" এরূপ প্রত্যেক পত্রে পিতার প্রতি কত শ্লেষ লেখা থাকিত। এই পিতৃ-নিন্দা আমার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটার মত লাগিত। এই দারুণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিত। আমি তীব্রস্বরে তাহার উত্তর লিখিতাম—"আমার পরম ভাগ্য যে পিতা আমাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না করিয়া অশেষ পুণ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। আমার জন্য সম্পত্তিরূপ তৃণগুচ্ছ রাখিয়া গেলে আমি এ বংশের আর সকলের মত একটি প্রকাণ্ড গরু হইতাম।" পিতৃব্যগণ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। দেশশুদ্ধ লোক বিস্মিত হইল। এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস, এত অহঙ্কার! আমার নিন্দায় দেশ পরিপূর্ণ হইল।

আমার কত কুৎসা, কত নিন্দার সৃষ্টি হইল। দুই একটির নমুনা পরে দিব।

এ দিকে কলিকাতায়ও বাসাশুদ্ধ লোক আমার সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বিস্মিত। দুই একটি ইতর বংশসম্ভূত সহবাসী ঘোরতর মর্ম্মাহত হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ইহাদের কাছে কখনও ম্লানমুখ কি নতশির দেখাইব না। সাহস দেখিয়া চন্দ্রকুমার পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"নিতান্ত যদি বাড়ী না যাওয়া স্থির করিয়া থাক, তাহা মন্দ নহে। তবে আমার পিতার কাছে তোমার কলিকাতার খরচ দি, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠাইতে লিখি।" চন্দ্রকুমারের পিতা আমার পিসা, তাহার বিমাত্র আমার পিসি। আমার পিতার সহোদরা ভগ্নী। তিনিই বলিদান করিতে গিয়া আমার আঙ্গুল একটা বলিদান করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারের পিতা তখন মুনসেফ কি সবজজ। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলাম তাহার প্রয়োজন নাই। আমার দুই private tuition আছে, তাহাতে ২০ টাকা পাই, তাহার দ্বারা আমার কলিকাতার খরচ চলিবে। আমার খরচের জন্য আমার ভাবনা নাই। চন্দ্রকুমার বলিলেন পরীক্ষার তিন মাস মাত্র বাকী। এখন সকালে বিকালে দুই বেলা চার মাইল করিয়া আট মাইল হাঁটিয়া ছাত্র পড়াইতে গেলে, তোমার আপনার পড়া চলিবে কেন? আমি বলিলাম,—"ভাই! ইহা আমার অতি সামান্য ক্লেশ। আমার হতভাগিনী মাতা, ভার্য্যা, শিশু ভাই ভগিনীরা অর্দ্ধাহারে কি অনাহারে দিন কাটাইতেছে। আমি কি এই ক্লেশটুকুও সহ্য করিব না? হাঁটা আমার সহিয়া গিয়াছে। আর পড়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িব। যদি নিতান্ত না পারি, তবে অবশ্য তোমার পিতার কাছে সাহায্য চাহিব। তিনি আমার পিতৃতুল্য, তাহাতে আমার

লজ্জা নাই।” দুই এক দিন পরে চন্দ্রকুমার বলিলেন দাদা বি, এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমার কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে চাহিতেছেন। অনেক চিন্তা করিয়া স্বীকৃত হইলাম। কেন, পরে বলিব।

পিতৃব্যগণ তখন মাতাকে এই কুপুত্রের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কাছে ভিক্ষা করিবার পরামর্শ দিলেন। সরলা মাতা উপায়ান্তর না দেখিয়া উত্তরীয় গলায় শিশু পুত্রগণ লইয়া তাঁহাদের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিলেন। সুখে, সোহাগে, গৌরবে, বিলাসে, বেশবিন্যাসে পিতৃব্যপত্নীগণ, কেহ এত দিন মাতার দুয়ারেও আসিতে পারেন নাই। আজ তাঁহাদের সুদিন। সে সব কথা ভুলিয়া মাতার উপর তীব্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন—“শূকরীর মত ইহার কত সন্তান দেখ। এতগুলিকে কে ভিক্ষা দিবে?” কেহ বলিলেন—“তোমার ত দাঁড়াইবার স্থানটুকুও নাই। আমার স্বামী বাড়ী ভিটা পর্য্যন্ত কিনিয়া লইয়াছেন। থাকিতে দিয়াছি ইহা যথেষ্ট! তাহার উপর আবার ভিক্ষা কি দিব?” যাহা হউক পিতৃব্যেরা জমীদারি হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিয়া পিতার এক “অন্নজল” শ্রাদ্ধমাত্র করাইলেন। আমি মাতাকে লিখিয়াছিলাম আমি গঙ্গাতীরে পিতার শ্রাদ্ধ করিব। তিনি কেবল তিলমাত্র স্পর্শ করাইয়াই আমার ভ্রাতাদের কাচা কাটাইবেন কিন্তু পিতার যে গৌরবে আমার হৃদয় উল্লাসিত হইয়াছিল, মাতার তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ছিল না। ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা দানসাগর করার অপেক্ষা এরূপ তিলস্পর্শ করা শ্রেষ্ঠতর শ্রাদ্ধ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মহাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন শ্রাদ্ধের অর্থ দানসাগর কি বৃষোৎসর্গ নহে। শ্রাদ্ধের [illegible] শ্রদ্ধার কার্য্য। অতএব তাঁহারা তিল স্পর্শ হইতে দানসাগর পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া সকল অবস্থার লোকের স্বর্গ সুবিধার পথ করিয়া দিয়াছেন। বিরলে শ্রদ্ধাযুক্ত

হইয়া তিল স্পর্শ করিলে যে শ্রাদ্ধ হয়, শ্রদ্ধাহীন একটা প্রকাণ্ড দান-সাগরে তাহার বিপরীত হয় মাত্র। কিন্তু মুর্খ ধর্ম্মযাজকের কল্যাণে আজ আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়াছি। আজ পিতৃশ্রাদ্ধ শোকের কার্য্য না হইয়া সুখের কার্য্য। প্রাণের শোকোচ্ছাসের কার্য্য না হইয়া উহা উৎসবের কার্য্য। আবার ভিক্ষা করিয়া হইলেও এ উৎসব করিতে হইবে! না হয় ধর্ম্ম যায়, জাতি যায়। হরি হরি! এ জাতির অধঃপতনের আর বাকী কি আছে? আমি কলিকাতায় কাশী বাবুর ভিক্ষাদত্ত ৫৲ টাকায় বিগলিত পবিত্র অশ্রুধারায় মাতা ভাগিরথীর পবিত্র স্রোত বৃদ্ধি করিয়া যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা কুবেরের ভাগ্যেও ঘটে না। তাহার স্মৃতিতে এখনও আমার হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠে, নয়নে পবিত্র শ্রদ্ধার ধারা বহিতে থাকে। আমার পুত্র যেন আমার জন্য এমন পিতৃশ্রাদ্ধ করে।

ভেলা ভগ্ন।

"There would have been a time for such a word."

Macbeth.

নয়নের অশ্রু মুছিয়া বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নয়নের অশ্রু জোর করিয়া মুছা যায়, কিন্তু হৃদয়ের অশ্রুর উপর জোর চলে না। বুঝিয়াছি বি, এ পরীক্ষা আমার জীবনের শেষ পন্থা। ইহার উপর আমার জীবন খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছে। অনন্ত বিপদার্ণবে ইহাই আমার শেষ তৃণ। অতএব সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িতেছি। রাত্রি প্রভাত হইল। চমকিয়া দেখিলাম যে পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম, সেই পৃষ্ঠাই এখনও পড়িতেছি। সমস্ত রাত্রি জড় পুতুলের মত পুস্তকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি সত্য, কিন্তু কিছুই পড়ি নাই। পুস্তকের একটি অক্ষরও দেখি নাই। দেখিয়াছি আমার অনাথ পরিবারের মুখ। দেখিয়াছি অনাথিনী মাতা অনাথ শিশুটিকে বুকে লইয়া অনাহারে সমস্ত রাত্রি আমার দিকে চাহিয়া জাগিতেছেন, এবং অবিরল অশ্রুধারায় শয্যা ভিজাইতেছেন। দেখিয়াছি—

"এই খানে মা দুখিনী পড়ে ধরাতলে,
বাতাহত সুবর্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রায়,
স্থিরনেত্র, স্থির গাত্র; বদন মণ্ডলে
নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কায়।
দুগ্ধপোষ্য শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া,
কাঁদিছে অভাগা! আহা! মা মা মা বলিয়া।"

ভাবিয়াছি—

"পিতার সে শান্তমূর্ত্তি দেখিব না আর
শুনিব না আর সেই মধুর বচন।
নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার।
শুনিব না আর আমি যাবত জীবন।
মধুমাখা 'বাবা' কথা বলিব না আর।
শ্রদ্ধার আলয় মম হইল আঁধার।"

আমি কলিকাতার মাদুর বিছানায় বুক ও মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলে অবস্থা কি বলিলাম। চন্দ্রকুমার বলিল,—"এরূপ হইলে তুমি কেমন করিয়া পরীক্ষা দিবে? তুমি যে পাগল হইবে। তখন তোমার পরিবারের উপায় কি হইবে?" আমারও সেই ভাবনা। কিছুতেই পড়িতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া পরীক্ষা দিব? তাহার উপর আবার চন্দ্রকুমার ও জগবন্ধুর বই লইয়া তাহাদের পড়ার অবসর মতে পড়িতে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি সম্যক্ বহি কিনিতে পারি নাই।

এরূপে দিন কাটিতে লাগিল। ঈশ্বর দয়াময়, দুঃখীর দিন দীর্ঘ হইলেও কাটিয়া যায়। দাদা আহার দিতেছেন। চারিটা ভাত খাইতেছি মাত্র। দুধ ও জল খাওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছি। কেন দাদার দয়ার অপব্যবহার করিব? তবে চন্দ্রকুমার হরকুমার জল খাওয়ার যাহা খাইবে তাহার তৃতীয়াংশ আমার জন্ম রাখিত। আমাকে জিদ করিয়া খাওয়াইত। কাহারও সহোদর ভাইও কি এতদূর করিয়া থাকে? তাহাদের যত্ন দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিতাম, এখনও ভাবি, ইহারা দুটি পূর্ব্ব জন্মে আমার সহোদর ছিল। আমি তাহাদের যোগ্য ছিলাম না বলিয়া এই জন্মে আমার সেই ভাগ্য হয় নাই, এবং

যোগ্য সহোদর আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহারা দুই ভাই ও দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার ছাড়া সহবাসীদের মধ্যে গরীব মহেশও আমাকে কত শ্রদ্ধা করিত। সে আমার জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিত। উমেশের ভালবাসা এ সময়ে আরও দ্বিগুণ হইল। এক দিন সে তাহার উড়ানির মধ্যে লুকাইয়া আমার জন্য এক হাঁড়ি সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে। আমাকে নীচের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গোপনে দিল। আমি খাইব কি; তাহার স্নেহ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সেও কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোর সুন্দর শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোর সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। একে ত এই বিপদ, তাহার উপর কিছুই খাইতে পাইতেছিস্ না। তুই এ সন্দেশগুলি খা।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে খাইতে লাগিলাম। উমেশ গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার হাতে তুলিয়া দিতে লাগিল। সন্দেশ ত নহে স্নেহামৃত। এইরূপ স্নেহামৃত কেবল দরিদ্র বালক দরিদ্র বালককে দিতে পারে। দরিদ্রতানলে গলিয়া কোমল বিষ্ণুপদসন্নিভ পবিত্র শিশুহৃদয় তরল হইলেই কেবল এরূপ অমৃতময়ী ভাগিরথীর উদ্ভব সম্ভবে। উমেশ নিজেও তখন একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালক। অতি কষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। না জানি কত কষ্টে কত অসীমস্নেহে এ সন্দেশের মূল্য সংগ্রহ করিয়াছিল।

এরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল। বি, এ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দুঃখের দীর্ঘ দিবস আমাদের হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া শেষ হইল। তখন যদি বিশ্ববিদ্যালয় ও তজ্জ অদ্ভুত পরীক্ষা ও অপূর্ব্ব পরীক্ষক সকল থাকিত তবে নিশ্চয় চাণক্য ঠাকুর এই সকল পরীক্ষাকেও তাঁহার "সদ্য প্রাণহরাণি ষটের" মধ্যে গণ্য করিতেন। ছাত্র মাত্রেরই জন্য এ পরীক্ষা, প্রকৃত অগ্নি পরীক্ষা হইলেও আমার পক্ষে উহা জীবন্ত তুষানল স্বরূপ হইয়াছিল। কারণ ইহার উপর আমার সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছিল। পরীক্ষা গৃহে

যাইবার সময়ে যে দারুণ হৃৎকম্প হইত, তাহা মনে হইলে আমার এখনও সীতাদেবীর মত রাবণভীতি উপস্থিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়দের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বের সকলেই অনিত্য। সকলেরই আদি অন্ত আছে। এ হেন পরীক্ষাও শেষ হইল। শেষ দিন পরীক্ষা গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতে হৃদয় যে কি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, যাহারা পরীক্ষা দিয়াছে কেবল তাহারাই জানে। পিতার পরলোক গমনের পর এই প্রথম হৃদয়ে একটি আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল। কিন্তু উঠিবা মাত্রই মিশাইয়া গেল।

গাড়ী হইতে নামিয়া উপরের ঘরে গিয়া বসিয়া আছি। চন্দ্রকুমার নীচের ঘর হইতে বিষণ্ণ মুখে ছল ছল নেত্রে উঠিয়া আসিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। আমি মনে করিলাম আমার আর কোন সর্ব্বনাশের সংবাদ আসিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পিতার শোকে আমার সাধ্বী সরলপ্রাণা মাতা অধিক দিন বাঁচিবেন না। হতভাগ্যের এ বিশ্বাসও অমূলক হয় নাই। আমি ব্যস্ত হইয়া চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম যে, তাহার মুখ এরূপ হইয়াছে কেন? সে আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া "কিছুই না, কিছুই না" বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে আমি অধিকতর ব্যাকুল হইতেছি দেখিয়া বলিল—"তুমি ব্যস্ত হইও না। তোমার বাড়ীর কোন অমঙ্গল সংবাদ আসে নাই। অন্য কথা। এস জল খাবার খাই। পরে বলিব।" কিন্তু আমার হৃদয়ের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল, আমি এরূপ বিপদজালে বেষ্টিত যে, উচ্চ শব্দে বাতাস বহিলেও আমি ভয় পাইতাম। আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমার বোধ হইল নিশ্চয় কোন নূতন বিপদ ঘটিয়াছে। চন্দ্রকুমার তাই খুলিয়া বলিতেছে না। আমি ইহা জানিবার জন্য আরও ব্যাকুল হইয়া জিদ করিতে লাগিলাম।

তখন চন্দ্রকুমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"অখিল বাবু আমাকে এই মাত্র নীচের ঘরে বলিতে বলিলেন যে তিনি তোমাকে বি, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন। আজ বি, এ পরীক্ষা শেষ হইল। অতএব কাল হইতে তিনি আর তোমার ব্যয় বহন করিবেন না।" তাই বলিয়াছি পরীক্ষা শেষ হইবে বলিয়া আমার আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠিবা মাত্র মিশাইয়া গিয়াছিল। আমি ও চন্দ্রকুমার উভয়ে অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম। চন্দ্রকুমারের অশ্রু প্রতিরোধ না মানিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আমার চক্ষে জল আসিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার পিতৃদেবের অগম্য হৃদয়বল ও অতুল সাহস আমার হৃদয়ে যেন তাড়িৎরূপে সঞ্চারিত হইল। আমি স্থির ধীর কণ্ঠে একটুক করুণাপূর্ণ ঈষদ হাসির সহিত বলিলাম—"চন্দ্রকুমার! তুমি ইহার জন্য কাঁদিতেছ কেন? দাদা দয়া করিয়া আমাকে এ পর্য্যন্ত যে সাহায্য করিয়াছেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি ইহার জন্য তাঁহার কাছে চিরঋণী থাকিব। আমি কাল হইতে আমার ছাত্র দুটিকে পড়াইতে যাইব। তাহা হইলে আমার মাসে কুড়ি টাকা আসিবে এবং পূর্ব্ববৎ খরচ চলিবে।" চন্দ্রকুমার আবার গদ গদ কণ্ঠে বলিল—"আমি তাহার জন্য দুঃখিত হই নাই। তোমার private tuition না থাকিলেও আমরা ত আছি। আমার পিতা কি দুই এক মাস তোমার খরচ চালাইতে পারেন না? আমার দুঃখ এই, অবসন্ন হৃদয়ে পরীক্ষা ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ, এ সময়ে এ নিষ্ঠুর কথাটা না বলিলে কি হইত না? দুদিন পরে ত বলিতে পারিতেন? আর দুদিনের খরচে কি তিনি মারা যাইতেন?" আমি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"তুমি তাহার জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি জান দাদা আমার অস্থিরমতি লোক। তিনি নিষ্ঠুরতা করিয়া যে এরূপ করিলেন তাহা নহে। তাঁহার চরিত্রই এরূপ অস্থির।" চন্দ্রকুমার

দাদার ভগ্নীপতি হইলেও তাহার বিবাহের যৌতুক লইয়া উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনান্তর ছিল, এবং সদা সর্ব্বদা উভয়ের মধ্যে, বিশেষতঃ স্পষ্টবাদী "খাতির নদারত" পাগলা হরকুমারের সঙ্গে, সর্ব্বদা ঘোরতর কলহ হইত, এবং হরকুমার তাহাকে শিষ্টাচার সাহিত্যের বহির্ভূত ভাষায় সম্ভাষণ করিত। হরকুমার এ সময়ে আসিয়া এ কথা শুনিয়া একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং দাদার প্রতি অজস্র শব্দভেদী অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

যদিও আমি তাহাদিগকে এরূপ বুঝাইলাম বটে, ফলতঃ দাদা যে কেন এরূপ ব্যবহার করিলেন, আমি নিজেও বড় বুঝিলাম না। দুই একজন বিচক্ষণ সহবাসী আমাকে যেরূপ বুঝাইলেন, সত্যের অনুরোধে তাহা বলিব।

আমাদের বংশের চারি শাখা। এক শাখার সন্তান দাদা, অন্য এক শাখার সন্তান আমি। তাঁহার পিতামহ এরূপ দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন যে, দেশের লোক তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নৌকা ডুবাইয়া মারিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দোধারা অসি। পরের প্রতি সঞ্চালিত করিলে আপনাকেও পুরুষানুক্রমে, জন্মজন্মান্তরে, প্রতিঘাত পাইতে হয়। জগতে কিছুরই ধ্বংস নাই। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিরও ধ্বংস নাই। মানুষ কেবল আপনার পূর্ব্বজন্মের দুষ্প্রবৃত্তির পরজন্ম প্রাপ্ত হয় ও তাহার ফলভোগ করে, এমত নহে, তাহার পুত্র পৌত্রদিগকেও তাহার ভাগী করিয়া যায়। দাদার পিতামহের বংশ-বিদ্বেষ ও লোক-বিদ্বেষ তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া ঘোরতর ভ্রাতৃ-বিরোধে পরিণত হইল। ভ্রাতৃ-বিবাদে ঘরখানি যায় যায় হইয়াছে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবার উপায় দেখিতেছেন। বংশের সকলে তাঁহার পিতৃব্যের পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছেন। কারণ তাঁহার পিতা নিতান্ত অসামাজিক লোক ছিলেন। কাহারও সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাৎও ছিল না। এমন সময়ে তিনি এক দিন আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে আমরা কখনও দেখি নাই। তাঁহার নাম ধূর্জ্জটি, দেখিতেও একটি যেন জীবন্ত ধূর্জ্জটি। বিরাট ভীষণ মূর্ত্তি, শরীরে অপরিমিত বল। আমার ছোট ভাই ভগ্নীরা দেখিয়া চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া পলাইতেছে। বাড়ী শুদ্ধ হাসিয়া আকুল। তিনি ঘোরতর তান্ত্রিক, পিতাও তান্ত্রিক। দুজনে একত্রে আহ্নিকে বসিলেন। এ সময়ে তিনি পিতার পায়ের উপর পড়িয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পিতার তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, জজ আদালতের তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। পিতা প্রথমতঃ তাঁহাদের ভ্রাতৃ-বিরোধে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনার সমস্ত বংশের প্রতিকূলে যাইতে অসম্মত হইলেন। তাঁহাকে আবার বুঝাইলেন। অনেক প্রকারে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার করুণ হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি পিতার হস্তে আহ্নিকের জল দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, পিতা তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন। দাদা তখন ঢাকা কলেজে পড়িতেছেন। আমি মাতার বুকে বসিয়া এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পিতা ঘোরতর বিপদস্থ হইলেন। সমস্ত বংশ আমাদের উপর খড়্গহস্ত। তিন বৎসর কাল পিতা তাঁহাকে লইয়া একঘ'রে হইয়া রহিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও তৎপক্ষীয়েরা পিতার নামে বিনামা কত দরখাস্তই দিল। তখন দুরন্ত, অথচ বিচক্ষণ, সেণ্ডিস সাহেব চট্টগ্রামের জজ। পিতা সেরেস্তাদার। পিতা একদিন কাছারি হইতে যেরূপ চিন্তাকুল ও মলিন মুখে ফিরিয়া আসিলেন, যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া যাইতেছিলেন তখনও আমি তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখি নাই। দেশ শুদ্ধ লোক বলিতে লাগিল—"তুমি এই ধূর্জ্জটি বাবুর পক্ষ

ত্যাগ কর।” এই উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও পিতা অম্লান মুখে বলিতেন তিনি আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। সেই মহাভারতক্ষেত্রের অর্জ্জুন সারথীর ন্যায় অবিচল চিত্তে নিরস্ত্রভাবে শত্রুপক্ষের শত অস্ত্রাঘাত সহিয়া এমন কৌশলে ধূর্জ্জটি বাবুর বিজয়-সাধন করিলেন যে তিনি সকল মোকদ্দমাতে জয়ী হইলেন, অথচ উভয়ের ঘর রক্ষা হইল, এবং সকল বংশ তাঁহাকে আবার গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য পিতার ও তাঁহার মধ্যে নিতান্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। একবার আমাদের বাড়ী পুড়িয়া গেল। আমরা বাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বে তিনি নিজে কিন্তু টাকা দিয়া বাড়ী প্রস্তুত আরম্ভ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি না চাহিলেও পিতা এ টাকার তমঃসুক লিখিয়া দিলেন। টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করিলেন। বহুদিন পরে ধূর্জ্জটি বাবুর মৃত্যু হইল। দাদা বাড়ী গিয়া দেখিলেন যে তমঃসুকে আসল টাকা উশুল আছে, কিন্তু শুদ ৭৫৲ টাকা বাকী আছে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বলিলেন,—“তোমাদের আমাদের মধ্যে মোকদ্দমা হওয়া উচিত নহে। এ ৭৫৲ টাকা দিতে তোমার পিতার কাছে লেখ।” সহবাসীদের সাক্ষাৎ এ কথা বলাতে আমি বড় অপমানিত হইয়া পিতাকে ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি সে টাকা দিয়া তাহার রসিদ আমার কাছে পাঠাইয়া তমঃসুকের ইতিহাস লিখিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে জিদ করিয়া এ তমঃসুক দিয়াছিলেন, এবং সুদের কথা দূরে থাকুক, আসল টাকা পর্য্যন্ত ধূর্জ্জটি বাবু অনিচ্ছায়, কেবল পিতা ছাড়িতেছেন না বলিয়া, লইয়াছিলেন। যাহা হউক কলিকাতায় আসিয়া আমাকে অপমানিত না করিয়া টাকাটা তাঁহার কাছে চাহিলেই তিনি পাঠাইয়া দিতেন। দাদা বড় অপ্রতিভ হইলেন; হরকুমার তাঁহার প্রতি এ ঘটনা লইয়া শাণিত অস্ত্র সকল প্রহার করিতে লাগিল। দেশেও তাঁহার বড় নিন্দা হইল। অতএব

কেহ কেহ আমাকে বুঝাইলেন, যে, তিন মাসের বাসা-খরচ ৪৫৲ টাকা ও বি এ পরীক্ষার ফিস ৩০৲ টাকা দিয়া, দাদা সেই ৭৫৲ টাকা আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন মাত্র। সহৃদয়তা নহে, সাংসারিকতা। এই জন্যই বি এ পরীক্ষার শেষ দিন এরূপ জবাব দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করি নাই। আমার বিশ্বাস তিনি কেবল দয়া করিয়া আমার এরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ঘোরতর বিপদের সময়ে এই দয়ার জন্য আমি তাঁহার কাছে চিরঋণী রহিয়াছি। নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর মতভেদ হইলেও আমি তাঁহাকে আমার পিতার মত ভক্তি করিতাম। সেই ভ্রাতৃ-বিদ্বেষানল তাঁহার ও তাঁহার পিতৃব্য ভ্রাতার মধ্যে দাবানলের মত জ্বলিয়া আমৃত্যু তাঁহাদের জীবন ভস্মীভূত করিয়াছিল। হরি! হরি! মানুষের কর্ম্মফল কি অলঙ্ঘনীয়! কি সুদূরস্পর্শী!

'But ever and anon of griefs subdued
There comes a token like a scorpion's sting
Scarce seen, but with fresh bitterness imbued
And slight withal may be the things
which it is so flung aside for ever
it may be a sound, a tone of music
summer's eve or spring —
A flower, the wind, the ocean
which shall wound, striking the
Electric chain wherewith we are darkly bound'

Childe Harold; Byron

নর-নারায়ণ।

"যদ্ যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
ত ত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্।"

গীতা।

যে এক ভেলার ভরসা করিয়া ভাসিতেছিলাম তাহাও ত ডুবিয়া গেল। এখন কি করি? অবস্থার ঘোর ঘটায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। মস্তকের উপর ঝটিকা গর্জ্জিতেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ঘোরতর অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতেছি না। একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ, একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রও কোন দিকে দেখিতেছি না যে উহাকে উপলক্ষ করিয়া ভাসিয়া থাকি। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া এরূপ আহত ও নিমজ্জিত করিতেছে যে, আর ভাসিয়া থাকিবার আশা দেখিতেছি না। একটি কিশোর বয়স্ক কলিকাতার পথের কাঙ্গাল কেমন করিয়া কূল পাইবে? সকল অবলম্বন ভাসিয়া গিয়াছে, সকল আশা নিবিয়া গিয়াছে। একমাত্র আশা সেই বিপদভঞ্জন হরি। ভক্তিভরে, অবসন্ন প্রাণে, কাতর অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি প্রহ্লাদের মত আমাকেও তাঁহার নর-মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। সেই নর-নারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সম্প্রতি স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। সেই ভগবদ্বাক্য—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—মানবের একমাত্র সান্ত্বনার কথা। "পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পর পীড়নে"—এই মহাধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অবতার। সেই মহাব্রত সাধন করিয়া, তাঁহার অবতারে বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়া তিনি তিরোহিত হইয়াছেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি চিরজীবী। তিনি চিরদিন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই থাকিবেন।

আমরা প্রথম কলিকাতা আসিয়া কিছু দিন পরে আমাদের মাতৃভূমির বরপুত্র খ্যাতনামা ডাক্তার ৺ অন্নদাচরণ কাস্তগিরি এম ডি পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। ইঁহারা বংশপরম্পরা কাস্তগিরি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি যে কেন তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া কর্কশ ও কষ্ট-উচ্চারিত খাস্তগিরি উপাধি শেষ জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানি না। তিনি আমার পিতার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। আশৈশব আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং যখন কার্য্যস্থান হইতে দেশে আসিতেন, আমার শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। তখন কলিকাতায় কেবল আমি ও চন্দ্রকুমার মাত্র আছি। তিনি বলিলেন—"তোমারা দুটি বালক কলিকাতায় এরূপ অভিভাবক ও আশ্রয়শূন্য হইয়া কিরূপে থাকিবে। চল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়া দিব।" আমাদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। আমরা তাঁহার সঙ্গে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলনে দেশ তখন প্রকম্পিত হইতেছে। ডাক্তার অন্নদাচরণ এ সমাজ-যুদ্ধে তাঁহার একজন দক্ষ সেনাপতি। তখন তিনি বরিশালে, এবং বরিশালের একজন খ্যাতনামা লোকের বিধবা বিমাতার পর্য্যন্ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ও আমাদিগকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু—ও হরি! এই কি খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর? সমস্ত বঙ্গদেশ যাঁহার বেতালে আমোদিত, শকুন্তলায় মোহিত, এবং সীতার বনবাসে আর্দ্রিত হইতেছে, এই কি বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই বিদ্যাসাগর? যাঁহার নাম প্রত্যেক নর নারীর মুখে, যিনি মৃত হিন্দু সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিই কি সেই বিদ্যাসাগর? এই খর্ব্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিত মস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ণ নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধর ভঙ্গি, গগনোপম উচ্চ প্রশস্ত ললাট,

প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুক্তাহারসন্নিভ যজ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি সামান্য হুকা, মুখে হাসি, মূর্ত্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি,—আমাদের ন্যায় বালকের সঙ্গে পর্য্যন্ত সমানভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত সস্নেহ আলাপ করিতেছেন—এই কি সেই বিদ্যাসাগর? আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, মোহিত হইলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁহার পরম বন্ধু প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে থাকিতেন। দুই বন্ধুর মূর্ত্তিতে কি অপূর্ব্ব তারতম্য! আমি রাজকৃষ্ণ বাবুকে যখনই দেখিতাম তখনই আমার পরম প্রেমাস্পদ অনিন্দ্য-সুন্দর পিতাকে মনে পড়িত। রাজকৃষ্ণ বাবুর সেইরূপ মাধুর্য্যপূর্ণ গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেব-অবয়ব, প্রীতিপূর্ণ প্রসন্ন মুখ। রাজকৃষ্ণ বাবুও সেইরূপ মূর্ত্তিমন্ত সন্তানস্নেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী গিয়া আমাদিগকে দেখিয়া আসিবেন বলিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, কোন অসুখ হইলে সংবাদ দিতে, আমাদিগকে বলিলেন। এ সকল কথা এরূপ সরল ও সস্নেহভাবে বলিলেন যে শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছিল। আমার বোধ হইল কোন দেবতা আমাদের উপর তাঁহার পদছায়া প্রসারিত করিলেন। আমাদিগকে তাঁহার অভয়বরদ দুই করপদ্ম দেখাইলেন। আমরা বাস্তবিকই সে দিন হইতে নির্ভয় হইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে আমার একজন খুল্ল পিতামহ কালীঘাট আসিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন খ্যাতনামা ডেপুটি কালেক্টর। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিলে আমাদের

স্বদেশীয় ভৃত্যটি বলিল, যে একটি লোক আমাদের বাসায় আসিয়া আমাদের তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় তখন "সিংহি মহাশয়" ভিন্ন আমাদের পরিচিত দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। অতএব লোকটি কে কিছুই বুঝিলাম না। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আমি বলিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় নহে ত? চাকরটি দোহাই কুটিয়া বলিতে লাগিল যে এমন কদাকার পুরুষ কখনও বিদ্যাসাগর হইতে পারে না। পোষাকও সেরূপ। সে কোনও দরিদ্র সামান্য লোক হইবে। অহো। ইহার অপেক্ষা তাঁহার দেবত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? দরিদ্রের জন্য এরূপ দরিদ্রতার দৃষ্টান্ত, এরূপ সংসারে সন্ন্যাস, জগতে আর কে দেখাইয়াছে? চাকরের বর্ণনায় আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। কেবল একটা সন্দেহ। যদিও তিনি বলিয়াছিলেন বটে, তথাপি কি চট্টগ্রামের দুইটি দরিদ্র বালককে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতে আসিবেন —ইহা কি সম্ভব? আমি পরদিন তাঁহার কাছে গেলাম। সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। তিনিই আসিয়াছিলেন। আমার হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। আমাদের ঘরখানি পশ্চিম দুয়ারি ছিল। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"পশ্চিম দুয়ারি ঘর এত কষ্টকর যে রামরাজ্যে তাহার টেক্স ছিল না। চল, তোমাদের জন্য আর একটি বাড়ী দেখিয়া আসি!" এই বলিয়া মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়া উঠিলেন, এবং চটি পায়ে চটাস্ চটাস্ করিয়া চলিলেন। আমি প্রথমে স্তম্ভিত হইলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের জন্য বাড়ীর অন্বেষণে চলিলেন! পরে পুতুলের মত পশ্চাতে ছুটিলাম। আমি ছাতাখানি খুলিলে তিনি ছাতার নীচে আসিয়া আমার হাতের উপর হাত দিয়া বাঁটটি ধরিলেন। লজ্জায় আমার পা উঠিতেছে না। কত বলিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার হাত সরাইলেন না। যেন চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত এরূপে আমার সঙ্গে

চলিলেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে তখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাপা হইত, তাহার উপরের ঘরগুলি খালি ছিল। স্থানটি বেশ ভাল, ঘরগুলি অতি পরিষ্কার, এবং আয়তনবিশিষ্ট। তিনি বলিলেন এ ঘরগুলি আমাদের ভাড়া করিয়া দিবেন। তাঁহার আদেশ মতে দুই দিন পরে আমি আবার গেলে আমাকে বলিলেন—"ঘরগুলির বড় অতিরিক্ত ভাড়া চাহিতেছে। অতএব অন্য একটি বাড়ী আমি দেখি। আপাততঃ তোমরা এ বাড়ীতে থাক।" পরে আমরা ১১ নং পটুয়াটুলি বাড়ীতে যাই। আমি ইহার পর মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। কখনও বা তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর দ্বারা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে সংবাদ দিতেন। তিনি এ সময় কলিকাতায় বড় একটা থাকিতেন না।

আজ এই উত্তাল বিপদার্ণবের ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে সেই নর-নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিলাম। দেখিলাম এ সংসারে আমি দীনহীনের আর কেহ নাই। আছেন কেবল সেই দীনবন্ধু। পর দিন প্রাতে তাঁহারই স্মরণ লইতে চলিলাম। রাজকৃষ্ণ বাবুর বৈঠকখানাভরা লোক। কিন্তু আভূতল নত হইয়া প্রণাম করিবা মাত্র তাঁহারা দুইজনে আমার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম আমি পিতৃহীন, ঘোরতর বিপদগ্রস্ত। তখন দুজনে পিতার মৃত্যুর ঘটনা সকল জিজ্ঞাসা করিয়া অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইলেন। আমি কাঁদিতেছিলাম, তাঁহারা চক্ষের জল পুছিতেছিলেন, দর্শকগণ করুণ-নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে নির্জ্জন বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বিপদ কি? আমি তখন অতি কষ্টে অশ্রু ও কণ্ঠবাষ্প অবরোধ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁহার কাছে নিবেদন

করিলাম। তিনি অধোমুখে নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কপোল যুগল বহিয়া ধীরে ধীরে গোমুখী হইতে সুরধুনী ধারার মত দুটি সন্তাপহারিণী প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। আমার শোকের আখ্যান শেষ হইলেও অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তুমি এখনও বালক, আর তোমার উপর এ বিপদ! কিন্তু ভাই! তুমি কাতর হইও না। আমিও একদিন তোমার মত দুঃখী ছিলাম। সংসারে দুঃখীই অধিক। তোমার পিতা আর কিছু দিয়া না যান, তোমাকে ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মোট কথা, তোমার এখন বাড়ী যাওয়া হইবে না। এখানে কিছুদিন থাকিয়া বি এ পরীক্ষার ফল প্রতীক্ষা ও চাকরির চেষ্টা করিতে হইবে। তোমার মাসিক খরচ কি লাগে?" আমি বলিলাম কুড়ি টাকা। আমার দুটি 'প্রাইভেট টুইসন' আছে তাহার দ্বারা, আমার বাসা-খরচ চলিবে। ভাবনা কেবল পরিবারের জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তাহাদের কিরূপে চলিতেছে। আমি বলিলাম বলিতে পারি না। মাতা আমার কাছে সে কথা কিছু লিখেন নাই। তিনি আবার কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন,—"তোমার মাতার কাছে সে কথা জিজ্ঞাসা কর। কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না জান। আর তোমারও এখন 'প্রাইভেট টুইসন' রাখিলে কর্ম্মের চেষ্টার ত্রুটি হইবে।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। একখানি চিঠি লিখিয়া আনিয়া তাহা সংস্কৃত লাইব্রেরীতে দিতে, ও কিছু দিন পরে কলিকাতায় তিনি ফিরিয়া আসিলে দেখা করিতে বলিলেন। চিঠিখানি সংস্কৃত লাইব্রেরীতে দিলে তাঁহারা আমাকে ৪০টি টাকা দিলেন। আমি অবাক হইলাম। বলিলাম আমি ত কোনও টাকা চাহি নাই। তাঁহারা বলিলেন তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না; তাঁহারা উক্ত

অবসর-

স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পত্রের আদেশ মতে টাকা দিয়াছেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ছল ছল নেত্রে এ দয়ার উপাখ্যান চন্দ্রকুমারকে বলিলাম এবং টাকা চল্লিশটি হরকুমারকে দিলাম।

এ সময়ে আমাদের দেশের একজন সঙ্গতিপন্ন যুবক গোপীমোহন ঘোষ কলিকাতায় বেড়াইতে, কি কোন কার্য্য উপলক্ষে আসেন। আমার সহবাসীরা কেহ প্রায় বাসাবাটীর বাহিরে যাইতেন না। দেশস্থ কলিকাতা যাত্রী মাত্রেরই পাণ্ডাগিরি আমাকে করিতে হইত। আমি তাঁহাকে কলিকাতা প্রদর্শন করাইলাম, এবং তাঁহার সকল দ্রব্যাদি কিনিয়া দিলাম। দেশে ফিরিয়া যাইবার দিন তিনি আমাকে নীচের ঘরে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া একখানি ৫০৲ টাকার নোট দিলেন, এবং স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আমার হাতে এখন আর টাকা নাই। তুমি এই নোটখানি নেও। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিতেছে। দুর্ভাবনায় তোমার সুন্দর শরীরের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তুমি এ টাকার দ্বারা একটুক খাওয়া দাওয়া ভাল করিয়া করিও।" আমি কাঁদিতে লাগিলাম। দেখিয়া আমাকে জড়াইয়া বুকে লইয়া গোপীও কাঁদিতে লাগিলেন। গোপী স্কুলে আমার কয়েক ক্লাশ উপরে পড়িতেন। আমি তাঁহাকে চিনিতাম, তিনি আমাকে চিনিতেন মাত্র। আমার প্রতি তাঁহার অকস্মাৎ এই দয়া! তাঁহার যে এরূপ দেবতুল্য হৃদয় ছিল আমি জানিতাম না। তাঁহাকে চিরকাল আমোদপ্রিয় যুবক বলিয়াই জানিতাম। আমি এই দয়ার কি উত্তর দিব? আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ৪০৲ টাকা দিয়াছেন। তাহাতে আমার খরচ চলিতেছে।" তিনি বলিলেন—"তাহাতে কি। তুমি এ টাকাটা না রাখিলে আমি বড় দুঃখিত হইব। ইহার পরও টাকার প্রয়োজন হইলে তুমি আমার কাছে লিখিও।" তাঁহার সেই

স্নেহ, সেই দয়া, সেই দয়া-বিগলিত অশ্রু! আমি নীরবে নোটখানি লইলাম, এবং আরও কিছুক্ষণ তাঁহার সেই দয়ার্দ্র বক্ষে মস্তক রাখিয়া কাঁদিলাম,—পিতৃহীন নিরাশ্রয় বালক যেরূপ কাঁদিতে পারে সেরূপ কাঁদিলাম,—কাঁদিয়া পিতার পরলোক গমনের পর এই প্রথম শান্তিলাভ করিলাম। এই ৯০৲ টাকার উপর নির্ভর করিয়া আমার জীবন যুদ্ধে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবং এই ৯০৲ টাকার উপর নির্ভর করিয়া আমার জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলাম। এই ৯০৲ টাকা আমার জীবনের ভিত্তি ভূমি। আজ আমার অবস্থা যাহা, এই ৯০৲ টাকা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি এই ৯০৲ টাকা এবং দাদার সাহায্যের টাকা প্রত্যর্পণ করি নাই। প্রত্যর্পণ করিবার কথা মুখেও আনি নাই। কারণ এরূপ দানের প্রতিদান নাই, এই দান সামান্য হইলেও ইহার তুলনা করিতে পারে জগতে এমন কি আছে? ইহার একমাত্র প্রতিদান ভক্তির অশ্রু। আমি যাবজ্জীবন তাঁহাদিগকে তাহাই উপহার দিয়া পূজা করিব। গোপীমোহন আজ আমার একজন পরম বন্ধু। গোপীমোহন নামই বুঝি আমার জীবনের প্রেম-মন্ত্র। গোপীর হৃদয়ের তুলনার স্থল আমি আমার দেশে দেখি নাই। ঈশ্বর তাঁহার শেষ জীবন শান্তিময় ও সুখময় করুন!

ভীষণ সমস্যা।

"To be, or not to be : that is the question :—
Whether 't is nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them ?—To die—to sleep—
No more :—and by a sleep, to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to—'t is a consummation
Devoutly to be wish'd." Hamlet.

সমুদ্রের প্রবল স্রোতে তরঙ্গাভিঘাতে তৃণগাছটি ভাসিয়া যাইবার সময়ে যেমন সময়ে সময়ে তীরস্থ কোন পদার্থকে অবলম্বন করিয়া এক একবার তিষ্ঠিতে চেষ্টা করে, আবার স্রোতবেগে তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া যায়, আমারও সে দশা হইল। আমি কলিকাতারূপ মহাসমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া কত লোকের কাছে গেলাম, কত লোককে অবলম্বন করিয়া আশ্রয় পাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলাম না। অবস্থার খরস্রোতে ও তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া চলিলাম। এই অন্ধকারের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশার আলোক দেখিলাম। আমি বি. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম। যেরূপ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়াছিলাম, উত্তীর্ণ হইবার আমার কিছুমাত্র আশা ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণী দূরের কথা। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাহা যাহা করিয়াছি সকল বলিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন নিজেও চেষ্টা করিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ রামকৃষ্ণ বাবু এক পত্র দিয়া খ্যাতনামা বাবু দিগম্বর মিত্রের

কাছে পাঠাইলেন। তিনি তখনও রাজা হন নাই। অনেকক্ষণ তাঁহার গোমস্তা মহাশয়ের কাছে নীচের ঘরে বসিয়া তাঁহার কৃপা ভোগ করিয়া, শেষে উপরের ঘরে যাইতে আদেশ পাইলাম। দিগম্বর বাবুর 'কাছা খোলা, হাতে দৈনিক সংবাদ পত্র, অন্ত সজ্জিত কক্ষ হইতে একটি সামান্ত ফরাস বিছানার কক্ষে আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। আমাকে একখানি সংবাদ পত্র ফেলিয়া দিয়া নিজে একখানি পড়িতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে অন্তমনস্ক হইয়া এক আধটা কথা কহিতে লাগিলেন। শেষে যখন শুনিলেন আমার বাড়ী চট্টগ্রাম, তখন বিস্মিত হইয়া আমাকে আপাদমস্তক দেখিলেন। বোধ হয় চট্টগ্রামের মানুষ একটা স্বতন্ত্র প্রকারের জীব বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। যখন সে সন্দেহ ঘুচিল, তখন বলিলেন,—"তুমি ত বড় Enterprising lad, তুমি চট্টগ্রাম হইতে এত দূরে পড়িতে আসিয়াছ?" তখন চট্টগ্রাম সম্বন্ধে এবং তাহার সমুদ্রপথ সম্বন্ধে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার উত্তর শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বাঙ্গালের তস্ত বাঙ্গাল হইয়া যে আমি খাঁটি কলিকাতার ভাষায় কথা কহিতেছি তাহাতে বড় বিস্মিত হইলেন। অবশেষে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে সকলই বলিলাম। তাঁহার হৃদয় ভিজিল। তিনি সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন—"আমার মতে তোমার পড়া ত্যাগ করা উচিত নহে। আমি খরচ দিব, তুমি বি. এল. পাশ কর। তুমি যেরূপ ভাল ছেলে দেখিতেছি, অবশ্য পাশ করিতে পারিবে। আর তাহা হইলে সকল দুঃখ ঘুচিবে। নিশ্চয়ই তোমার বেশ পসার হইবে।" আমি বলিলাম আমার নিজের পড়ার জন্ত ভাবনা নাই। 'প্রাইভেট টুইসন' অবলম্বন করিয়াও পড়িতে পারিব, কিন্তু আমার বিশাল অনা

পরিবারের উপায় কি হইবে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম তাঁহাদের জন্য আমার মাসিক অনুমান ১০০৲ টাকা প্রয়োজন। তিনি বলিলেন তবে আমার কলিকাতার খরচ শুদ্ধ আমার মাসিক ১৫০৲ টাকা চাহি। তিনি কিঞ্চিৎ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন—"যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় কি অন্য কেহ অর্দ্ধেক খরচ দেন, তবে তিনি অর্দ্ধেক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।" আমার আর কথা সরিল না। তাঁহার এরূপ অসাধারণ দয়া পাইব, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বাবুর কাছে গিয়া এ কথা বলিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"বেশ কথা। নিতান্ত না হয় তাহাই করা যাইবে। কিন্তু বি. এল. পাশ করিয়া উকিল হইলেই যে তুমি টাকা পাইবে তাহার বিশ্বাস কি?" আমিও তাহা বুঝিলাম। তাহার উপর ভগ্নী একটির বিবাহ এখন না দিলেই হয় না। কোন্ প্রাণে সেই ব্যয়ও তাঁহাদের কাছে চাহিব। পুণ্যবান পিতার কোন কথাই প্রায় ব্যর্থ হয় নাই। আমি আমার ভগ্নীদিগকে আদর করিতে দেখিলে তিনি সর্ব্বদা হাসিয়া বলিতেন—"দুজনকে আমি বিবাহ দিয়া যাইব, আর দুজনকে তোমায় দিতে হইবে।" ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। আমার দুই ভগ্নী অবিবাহিতা রাখিয়া গিয়াছেন। দেবপ্রতিম কেশব বাবুর পত্র লইয়া হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ দ্বারিকানাথ মিত্রের কাছে গেলাম। তিনি তখন কাশীপুরে থাকিতেন। কৃষ্ণবর্ণ বীরমূর্ত্তি। উচ্চ ললাটগগন ও তীব্র নয়ন যুগল হইতে যেন প্রতিভা ফুটিয়া পড়িতেছে। তাঁহারও কাছা খোলা, একটি তাকিয়ার উপর পেট রাখিয়া উপুর হইয়া বসিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছেন। কেশব বাবুর পত্র-খানি পড়িয়া সংক্ষেপে আমার অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন—"ইংলিস ডিপার্টমেণ্ট জেকসন সাহেবের হাতে। তাহার সঙ্গে আমার বড় সম্প্রীতি নাই। তথাপি কোন কার্য্য খালি হইলে আসিও, আমি তোমার জন্য

অনুরোধ করিব।" বেঙ্গল অফিসের কার্য্যবিভাগের 'হেড এসিসটেণ্ট' রাজেন্দ্র বাবু। বেঁটে; পেট মোটা, বেশ সদাশয় লোক। তাঁহার সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছে। তিনিও অত্যন্ত স্নেহ করিতেছেন ও আশা দিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ যদিও ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষার পর ছাড়িয়াছি, তথাপি তাহার প্রাতঃস্মরণীয় প্রিন্সিপেল সাটক্লিফ সাহেবও বড় অনুগ্রহ করিতেছেন। তিনি প্রথমতঃ আমাকে ডাকিয়া লইয়া আসাম শিবসাগর স্কুলের ৪০৲ টাকা বেতনের এক শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহবাসী সকলে পরামর্শ দিলেন। দাদা জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম ৪০৲ টাকাতে আমার কোনও মতে কুলাইবে না। আমার নিজের অন্ততঃ ২০৲ টাকা লাগিবে। বাকী ২০৲ টাকাতে এত বড় একটা পরিবারের অন্ন নির্ব্বাহ হইবে না। আমি অস্বীকার করিলাম। দাদা চটিলেন; বাসাশুদ্ধ সকলেই চটিল। দুই এক জন ইতর বংশীয় সহবাসী আমি তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল সার জন লরেন্স হইব বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। আমার এ দুরবস্থায় তাহারা বরং তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। রক্তের এমনি যে অপূর্ব্ব মহিমা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। কিন্তু সাটক্লিফ সাহেব আমার আপত্তি সঙ্গত মনে করিয়া কিছুদিন পরে গোয়ালপাড়া স্কুলের হেড মাষ্টারের পদের জন্য সুপারিস করিয়া ডিরেক্টার এটকিনসন সাহেবের কাছে পাঠাইলেন। সাহেব মহোদয় ধূলা-বিজড়িত, ধুতি চাদর পরিহিত, একটা বালক দেখিয়া বলিলেন—এরূপ একটা "green lad" (কাঁচা যুবককে) তিনি একটা হেড মাষ্টারি দিতে পারেন না। আজ যে শ্মশ্রু ও গুম্ফের বাড়াবাড়িতে অস্থির হইয়াছি, তাহার অভাবও একদিন এরূপে আমার অদৃষ্টের উপর ক্রীড়া করিয়াছিল! সাটক্লিফ সাহেব এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি মনে

করিলেন আমি ইচ্ছা করিয়া গেলাম না। আবার কিছুদিন পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া এক মাসের জন্য হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে একটিঙ্গ নিযুক্ত করিলেন। আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি বলিলাম আমি চট্টগ্রামের লোক, আমি কি হেয়ার স্কুলের বড় মানুষের দুরন্ত ছেলেদের পড়াইতে পারিব ? তিনি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন—"কেন পারিবে না! অবশ্য পারিবে। আমি হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার গিরিশ বাবুকে বলিয়া দিব।" হায়! হায়! ছাত্রদিগের এরূপ পিতৃ-তুল্য দেবমূর্ত্তি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার পবিত্র স্থান "Monumental liar" মহাশয়ের মত কি ছাত্রদ্বেষীগণই কলুষিত করিতেছেন! মিঃ সাটক্লিফের খর্ব্বাকৃতিতে এত কার্য্যদক্ষতা, তেজস্বিতা, ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ছিল, যে প্রেসিডেন্সি কলেজের দুরন্ত বালকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার কথার অবাধ্য হইত না। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থায় গিরিশ বাবুর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে লইয়া সে অবস্থায় তৃতীয় শিক্ষকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। আমার বোধ হইল যেন ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, না জানি ভগবান কি দুর্গতিই কপালে লিখিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে ছাত্রদিগের কৃপা ভিক্ষা চাহিয়া বলিলাম—"আমি কেবল এক মাসের জন্য আসিয়াছি মাত্র। আমি তোমাদিগকে খুব ভাল-বাসিব, এবং আশা করি যে তোমাদের ভালবাসা লইয়া যাইতে পারিব।" বালকেরা যত দুরন্ত হউক না কেন, তাহাদের হৃদয় কোমল। এই কোমলতা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহারা সকলে একবাক্যে মহা উৎসাহ সহকারে বলিল তাহারা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করিবে। যাহারা কেবল শাসনের দ্বারা বালককে শিক্ষা দিতে চাহে তাহারা বড়

মুর্খ। আমি সাহিত্য পড়াইতে লাগিলাম। তাহারা বড় সন্তুষ্ট হইল, সকলে একবাক্যে বলিল যে তাহাদের শিক্ষক অঙ্ক খুব ভাল জানেন। অতএব তাহারা অঙ্ক বেশ শিখিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য ভাল শিখে নাই। আমি যত দিন থাকি তাহারা আমার কাছে কেবল সাহিত্য পড়িবে। তাহারা গিরিশ বাবুকেও এরূপ বলিল। তিনিও আমাকে তদনুযায়ী আদেশ দিলেন। অঙ্ক শিখাইতে হইবে না শুনিয়া আমারও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। কারণ অঙ্কশাস্ত্রে আমি এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত! এক দিন স্বনামখ্যাত ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয়ের একটি পুত্র বড় জ্বালাতন করিতে লাগিল। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলাম। সে রাগে গর্‌ গর্‌ করিয়া পুস্তক লইয়া ক্লাশ হইতে চলিয়া গেল। ছাত্রেরা বলিল—"সার! (Sir) আপনি হেডমাষ্টারের কাছে রিপোর্ট করুন।" আমি কিছুই করিলাম না, একটুক হাসিয়া পড়াইতে লাগিলাম। ছেলেটি পড়াশুনায় ভাল। বারান্দায় গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বহি খুলিয়া শুনিতে লাগিল। অন্য ছেলেরা তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া আমার পায়ে আসিয়া পড়িল, এবং বলিল—"অন্যায় দেখিলে সার! জুতা মারিবেন, তথাপি মিষ্ট ভর্ৎসনা করিবেন না। বড় গায়ে লাগে।" আমি তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম—"আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি এখন তোমার স্থানে গিয়া বস।" সে আমার এই স্নেহ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপন স্থানে বসিল। ছাত্রেরা সকলে বলিতে লাগিল—"এমন 'সারের' সঙ্গে কি এরূপ করিতে আছে?" তাই বলিতেছিলাম যাহারা শিক্ষার জন্য বালককে কঠোর শাসন করে তাহারা বড় মুর্খ। দেখিতে দেখিতে এক মাস ফুরাইয়া গেল। এ অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিল যে মাস ফুরাইয়া আসিলে তাহারা বলিল যে তাহাদের

শিক্ষক বুড়া হইয়াছেন, শীঘ্র পেনসন লইবেন। আমি যদি সম্মত হই তবে আমাকে রাখিবার জন্য তাহারা প্রিন্‌সিপেলের কাছে আবেদন করিবে। আমি বলিলাম তাহাতে তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন মাত্র। তাহার পর তাহারা বলিল তাহারা আমাকে একটি ঘড়ি ও চেন অভিনন্দন স্বরূপ দিতে চাহে। আমি গিরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। শেষ দিন উপস্থিত। আমি তাহাদের কাছে বিদায় হইয়া গিরিশ বাবুর কাছে বিদায় হইতে গেলাম। তাহারা ক্লাশ ভাঙ্গিয়া সজলনেত্রে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্য শিক্ষক মহাশয়েরা ঈর্ষা কষায়িত নয়নে এ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"আরে! ছেলেগুলো এক মাসের মধ্যে কি এ বাঙ্গালটার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল।" তাঁহারা অধিকাংশ ছাত্রদিগেকে গালি দিতেন ও গালি খাইতেন। মারিতেন ও পথে ঘাটে মার খাইতেন। গিরিশ বাবুও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেছিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলে তিনি বলিলেন—"তুমি কি যাদু করিয়াছ, ছেলেরা ত তোমার জন্য ক্ষেপিয়াছে। তাহারা বলে তাহারা আর তাহাদের পূর্ব্ব মাষ্টারের কাছে পড়িবে না। তোমাকে ঘড়ি চেন দিতে চাহে। কিন্তু সাটক্লিফ সাহেব বলেন এরূপ অভিনন্দন লওয়া নিষিদ্ধ। যে পর্য্যন্ত তৃতীয় শিক্ষক পেন্‌সন না লন, আমি তোমাকে অন্য একজন শিক্ষকের পদে রাখিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন তুমি শিক্ষকতা করিবে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা উচ্চ রকমের।" আমি সেই 'গ্রিন্ লেডের' গল্পটা তাঁহাকে বলিলাম, এবং বিদায় হইলাম। স্কুলের পর পটুয়াটলী লেন গাড়ি যুড়িতে ভরিয়া গেল। সমুদায় ছাত্র আমার বাসায় আসিল। তাহাদের সেই ভালবাসা আমার জীবনের প্রারম্ভভাগে কি একটি পবিত্র আলোক রেখা নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছে! তাহাদের দুই চারি জনের চেহারা

আমার এখনও মনে আছে। একটি বড় লোকের ছেলে বলিল—"মাষ্টার মহাশয়! আপনি ত আশুর 'প্রাইভেট টিচার' ছিলেন। আমি বাবাকে বলিয়াছি। আপনি আমার 'প্রাইভেট টিচার' হউন, আমি ডবল বেতন দিব।" আর একজন বলিল—"তাহা হইলে তিনি বি, এল, পড়িতে পারিবেন কেন? আচ্ছা, সার! আমরা আপনার এক বৎসরের খরচ চাঁদা করিয়া তুলিয়া দি, আপনি বি, এল, পাশ করুন। আপনি নিশ্চয় একজন বড়লোক হইবেন। এখনই ত একজন poet (কবি)।" তাহাদের কেহ কেহ "এডুকেশনে" আমার কবিতা সকল পড়িতেছিল। এরূপ সরল শিশু-হৃদয়-নিসৃত স্নেহামৃতে আমার সন্তপ্ত হৃদয় ভাসাইয়া তাহারা চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই। এ শেষ জীবনেও তাহাদের একবার দেখিতে পাইলে কত সুখী হই! ভরসা করি তাহারা সকলে সংসারে সুখে ও উন্নত অবস্থায় আছে।

তাহাদের স্নেহে আমি এই এক মাস কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলাম ও আপনার বিপদ ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু আবার—"যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" কেবল তাহারা বলিয়া নহে, আমার পিতার পুণ্যে এ দুরবস্থার সময়ে যাহার কাছে যাইতেছিলাম আবালবৃদ্ধ সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেছিল। আবার কলিকাতা সহর প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এমন বড় আফিস নাই, যেখানে একজন মুরুব্বি না জোটাইলাম। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, এ বিপদ সাগরের ত কূল পাইলাম না। হৃদয় দিন দিন নিরাশার অতল জলে ডুবিতে লাগিল।

"প্রতিদিন ত্যজি শয্যা মুদিয়া নয়ন
বেড়াই মনের দুঃখে কত শত স্থানে!

কত পাষাণের কাছে করেছি রোদন,
চাহিয়াছি দীনভাবে কত মুখপানে !
মধ্যাহ্ন রবির করে দহি কতবার
স্বেদ সহ অশ্রুধারা ঝরেছে আমার।

প্রভাকর তীব্রকরে অনাবৃত শিরে,
নিশির শিশিরে, ডুবি ধূলির সাগরে,
বেড়াইয়া পথে পথে প্রাচীরে প্রাচীরে,
যে ফল লভেছি ভেবে হৃদয় বিদরে।
প্রতিদিন প্রাতে যাই আশাভর ক'রে,
প্রদোষে নিরাশ হয়ে ফিরে আসি ঘরে।"

ঘরে সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেই প্রথমতঃ সেই ইতরজন্মা ইতরমনা সহবাসিগণের বিদ্রূপ,—"আজ কি গবর্ণর জেনেরালের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? তাঁহার কাযটি যুটিবে ত?" তাহার পর মাতার হৃদয়-বিদারক পত্র। আমার পিতৃব্যগণ আবার আমার প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক এক দিন পরিবারদের সেই উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ কাহিনী আসিত। এক এক দিন মা লিখিতেন যে আমি বাড়ী না গেলে তিনি পরের ষ্টিমারে অনাথ পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় আসিবেন। কোন পিতৃব্য আমাকে সাংসারিক যোগ বুঝাইয়া লিখিতেন দেশে গিয়া ২০৲ টাকার চাকরি পাইলেও ত এ দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইবে। সময়ে সময়ে অবিবাহিতা ভগ্নীর দশারও উল্লেখ করিতে ছাড়িতেন না। তথাপি দেশে যাইতেছি না দেখিয়া কেহ কেহ আমার খুড়োকে স্বতন্ত্র হইতে পরামর্শ দিলেন। সম্পত্তিতে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর যে অংশ আছে তাহা পিতার ঋণের জন্য বিক্রয় হয়

নাই, এবং তাহার দ্বারা কোনমতে অন্ন সংস্থান হইতেছে। তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার জন্য তাঁহারা পরামর্শ দিলেন। তিনি কেন আমাদের জন্য ডুবিবেন? তাঁহার মনও ফিরিয়াছিল। কেবল তাঁহার ভ্রাতার তীব্র ভৎসনায় তিনি বিরত হইয়াছিলেন। মাতা গোপনে এক পত্রে এ কথা জানাইলেন।

এ সকল পত্র পড়িয়া অন্ধকার ছাদের উপর গিয়া বসিতাম। চন্দ্রকুমার, হরকুমার, কখন বা দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিত। খুব কতক্ষণ বসিয়া কাঁদিতাম। দুঃখীর হৃদয়গত অতিরিক্ত দুঃখবাষ্প এরূপে নির্গত করিতে না পারিলে অতিরিক্ত বাষ্পে বাষ্পযন্ত্রের মত, বোধ হয় তাহার হৃদয়ও শতধা হইয়া যাইত। শোকবেগ কিঞ্চিৎ থামিলে, দিবসের পর্য্যটন কাহিনী ও মাতার পত্রের কথা তাহাদিগকে বলিতাম। ইহারা তিন জন ভিন্ন আর সে সকল কথা কেহ জানিত না। তাহাদের সান্ত্বনায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে কতক্ষণ চিন্তাকুলহৃদয়ে বাঁশি বাজাইতাম, এবং মনে মনে পর দিবসের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতাম।

"প্রিয়তম বংশী মম প্রাণের দোসর,
আলিঙ্গিয়া দুই করে কহি তার কাণে
বিরলে দুঃখের কথা ; যথা পিকবর
কহে ঋতু কুলেশ্বরে মোহিয়া সুতানে।
সন্তাপের স্রোত তবু মানে না বারণ,
উচ্ছ্বসিত হয় দুঃখে, ভাসে দুনয়ন।"

তাহার পর নয়নের অশ্রু মুছিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিতাম, এবং বিদ্রূপের প্রতি-বিদ্রূপ করিয়া সেই ইতর সহবাসীদের ক্ষত বিক্ষত করিতাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে এই নীচ কুল-সম্ভবদের কাছে কখনও নতশির কি ম্লানমুখ দেখাইব না। কক্ষে হাসির তুফান ছুটিত।

কিন্তু আমার এ বাহ্যিক আমোদে ও বিদ্রূপে যে অজ্ঞাতসারে এক শোচনীয় ফল ফলিতেছিল তাহা আমি জানি নাই। আমাদের দেশের মুনসেফির উকিল পালে পালে আমার পিতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার একজন এ সময়ে কলিকাতা হইয়া গয়াশ্রাদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেশে গিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে আমার শরীরের পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও কোনরূপ চিন্তার কি দুঃখের চিহ্ন নাই। দিন রাত্রি বাঁশি বাজাইয়া ও বেড়াইয়া বেড়াইতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক কন্যা বিবাহ করিব স্থির হইয়াছে। দেশে আর যাইব না। এই উপাখ্যান আমার সরলা বুদ্ধিহীনা মাতার মৃত্যু অস্ত্র হইল। বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। মাতা তাঁহার ইষ্টদেবতার নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিলেন আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী না গেলে তিনি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিবেন।

আমি জানিতাম আমার সরলা মাতার যেই কথা সেই কার্য্য। এই পর্য্যন্ত সকল বিপদ বুক পাতিয়া সহিয়াছিলাম! কিন্তু এ আসন্ন মাতৃহত্যার আশঙ্কায় সেই বুক ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উনবিংশ বৎসরের যুবক আর কত সহিব? আমি পাগলের মত হইলাম। চন্দ্রকুমারেরা আমার আত্মহত্যার আশঙ্কা করিতে লাগিল। আমার মনেও এ আকাঙ্ক্ষা এবার প্রথম হয় নাই।

"উত্তরীয় যেই দিন করিনু ছেদন
জাহ্নবি! তোমার তীরে বিষাদিত মন,
ভেবেছিনু একেবারে কাটিব তখন
উত্তরীয় সহ এই সংসার বন্ধন।
সংসারের মায়া কিন্তু না জানি কেমন,
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন।"

আজ আমার সেই দুঃখিনী মাও আমাকে ছাড়িয়া চলিলেন। আর কাহার জন্য বাঁচিয়া থাকিয়া এ দুর্গতি ভোগ করিব। এক দিন সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যার পর নিরাশ হইয়া ভাগিরথীর তীরে গিয়া বসিলাম। সেই অসংখ্য লোক-কোলাহল আমার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে না। সেই অসংখ্য তরী ও সেই ঘন অর্ণবপোতারণ্য আমার নয়নে দেখা যাইতেছে না। শুনিতেছি কেবল মাতার রোদনধ্বনি। আর দেখিতেছি—

"দুঃখের আবর্ত্তশ্রেণী আসিতেছে বেগে
ডুবাইতে জীর্ণতরী ভীষণ প্রহারে।
ঢেকেছে হৃদয়-কাল চিন্তারূপ মেঘে,
নিশ্চয় উঠিবে ঝড়, কে রাখিতে পারে?
ডুবাবে নিশ্চয় যদি তবে কেন আর?
ডুবিব জাহ্নবি! আজি সলিলে তোমার।"

* * * *

"কোথায় জননী মাগো! র'লে এ সময়ে
তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরিবে না আর।
চিত্রিবে না দূর দেশে তোমারে হৃদয়ে,
মা মা বলে মা! তোমারে ডাকিবে না আর।
জননি! জন্মের মত হইনু বিদায়।
হৃদয় কাঁদিলে আর কি হইবে হায়!"

"দীননাথ! তুমি মাত্র অনাথ আশ্রয়
তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিনু অর্পণ
পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন দীন নিরাশ্রয়
প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ।

বল নাথ! ইহাদের কি হবে উপায়?
অভাগার পরকালে কি হইবে হায়?"

আর লিখিতে পারিতেছি না। সেই দুঃখ স্মৃতিতেও আজি আমার চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে। আমার সেই জীবনের ছবি আমার "পিতৃহীন যুবক" কবিতা! আমিই সেই "পিতৃহীন যুবক", এবং আমার হৃদয়ের রক্তে ও নয়নের অশ্রুতে উহা সেই সময়েই লিখিত হইয়াছিল। উহা হইতেই উপরে কবিতা সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মরিলাম না। পিতার পুণ্য এ মহা-পাতক হইতে রক্ষা করিল।

"কে আমার কাণে কাণে বলিল তখন—
যুবক! নিরাশ এত বল কি কারণ?
জান না কি সুখ দুঃখ নিশার স্বপন?
সুখ চিরস্থায়ী কবে? দুঃখ বা কখন?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী।
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী।"

পিতা তাঁহার বল ও উদাসীনতা হৃদয়ে সঞ্চারিত করিলেন। বুঝিলাম—

"কি ছার বিষয় চিন্তা, কি ছার সংসার!
কি ছার সম্ভোগ লিপ্সা, অর্থই কি ছার!
মরিব কি তারি তরে করি হাহাকার?
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখ পারাবার।
কি ভাবনা?—গেছে সুখ, ফিরিবে আবার।
কিবা চিন্তা?—আছে দুঃখ, রহিবে না আর।"

"নাহি কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয় ভাণ্ডারে ?
যুঝিব একাকী আমি, ত্যজিব না রণ।
দেখিব নিষ্ঠুর ভাগ্য কি করিতে পারে ;
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে, করিলাম পণ—
'মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন।"

All suffering doth destroy or is destroyed
Even by the sufferer, and in each event
Ends. - Some with hope replenished & rebuoyed
Return to whence they came with like intent
And weave their web again. Some bowed & bent
Wax grey & ghastly, withering ere their time
And perish with the reed on which they leant,
Some seek devotion, toil, war, good or crime,
According as their souls were formed to sink or climb

Childe Harold. Byron

অকূলে কূল।

"In the broad field of battle,
In the bivouac of life
Be not like a dumb driven cattle
But be a hero in the strife."

Longfellow.

অমিত উৎসাহে আবার জীবনযুদ্ধে প্রবেশ করিলাম। আমার স্মরণ হইল চট্টগ্রাম জজের হেড ক্লার্ক আমাদের দেশের সুগায়ক শ্যামাচরণ বাবু একবার লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি, তাঁহার পাণ্ডা হইয়া, তাঁহাকে বেলভিডিয়ারে লইয়া গিয়াছিলাম, এবং জানিয়াছিলাম যে লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইলে আগে "প্রাইভেট সেক্রেটরির" কাছে পত্র লিখিতে হয়। কি সামান্য ঘটনায় অজ্ঞাতে মানুষের জীবন অচিন্ত্য পথে লইয়া যায়! মনে মনে স্থির করিলাম একবার বঙ্গের সেই বিধাতাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছে আমার দুঃখ নিবেদন করিব। যিনি বঙ্গের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত তিনি কখনও হৃদয়হীন লোক হইতে পারেন না। দুঃখীর দুঃখ শুনিলে অবশ্য তাঁহার দয়া হইবে। পিত! তুমি ভিন্ন কলিকাতায় একটি ভিখারী বালকের হৃদয়ে এ সাহস কে সঞ্চারিত করিবে? প্রাইভেট সেক্রেটরির কাছে ডাকে পত্র লিখিলাম। ডাকে যথাসময়ে উত্তর পাইলাম আমি কি জন্য লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করিতে চাহি তাহা তিনি জানিতে চাহেন। আমি উত্তর লিখিলাম আমি একটি দরিদ্র দুঃখী বালক, তাঁহাকে আমার দুঃখের কথা বলিতে চাহি মাত্র। পত্রখানি নিজে [illegible] লইয়া গেলাম, এবং একজন চাপরাশি বা রক্তপোষী দ্বারা

'প্রাইভেট সেক্রেটরির' কাছে পাঠাইলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কত বড় বড় লোক আসিলেন ও লাটসাহেবকে সেলাম বাজাইয়া চলিয়া গেলেন। বঙ্গের বড় লোকদিগের জন্যই এজন্য। বহুক্ষণ পরে একজন চাপরাশি মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি নবীনচন্দ্র সেন ?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—হাঁ। তিনি তখন খুব মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিলেন—"তুমি এতক্ষণ বলনাই কেন ? আমি কোন্ কালে তোমার সঙ্গে সাহেবের সাক্ষাৎ করাইয়া দিতাম। তুমি চল, সেক্রেটরি সাহেব তোমাকে তলব দিয়াছে।" আমি আরও বিস্মিত হইলাম। আমার পরিধান সামান্য ময়লা ধুতি, ময়লা লাল ফেলালিনের পিরাণ, ও ময়লা চাদর। পায়ে একজোড়া ছেঁড়া জুতা। সের পরিমাণে না হউক, অন্ততঃ ছটাক পরিমাণে প্রত্যেক পাটির মধ্যে ধুলার চড়া পড়িয়া আছে। আপাদমস্তক কলিকাতা সহরের মসৃণ আরক্ত ধুলারাশিতে রঞ্জিত ও সমাচ্ছন্ন। আমি বলিলাম আমি এ বেশে কেমন করিয়া সাহেবের কাছে যাইব ? মুরুব্বি বলিলেন—"ভয় নাই। সাহেব বড় ভাল মানুষ। তোমার ভাল করিবে। তুমি চল, আর দেরী করিও না।" আমি সেই স্বর্গের সোপানের মত বিস্তৃত, সজ্জিত, এবং বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত সোপানাবলী বাহিয়া সশরীরে সেই পার্থিব স্বর্গে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু চরণ উঠিতেছে না। হৃদয় ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া যেন খসিয়া পড়িতে চাহিতেছে। স্বর্গদূতের ইঙ্গিত মতে গুরু বহুমূল্য পর্দা ধীরে ধীরে কম্পিত করে সরাইয়া আমি একটি বৃহৎ কক্ষে সেক্রেটরির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। সেক্রেটরি কেপ্টেন ষ্টানস্ফিল্ড (Captain Stansfield)। লেঃ গবর্ণর তখন সার উইলিয়ম গ্রে। সেক্রেটরি সাহেব যুবক, সুন্দর, সুপুরুষ। মুখে যেন হৃদয়ের সহৃদয়তা প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তিনি আমাকে মুহূর্তেক আপাদমস্তক দেখিয়া

একটি অতি সুন্দর, শীতল, স্নেহমাখা হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক! তুমি লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে কেন দেখা করিতে চাহ?" সে হাসিতে এবং সেই স্নেহকণ্ঠে আমার ভয় তিরোহিত হইল। আমি কোমল করুণকণ্ঠে বলিলাম—"আমার পত্রে ত তাহা লিখিয়াছি। আমি তাঁহার কাছে আমার দুঃখের কথা নিবেদন করিতে চাহি।" তিনি করুণকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি আমাকে বলিবে কি তোমার কি দুঃখ?" আমি বলিলাম—"আমি কৃতজ্ঞতার সহিত বলিব, কিন্তু আমার এ দীর্ঘ দুঃখ-কাহিনী আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শুনিবেন কি?" তিনি বলিলেন—"আমি শুনিব।" কি একটুক লেখা শেষ করিয়া লেখনী রাখিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"বল।" আমি ধীরে ধীরে ছল ছল নয়নে অধোমুখে আমার বিপদের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস বলিলাম। তিনি অনিমিষ নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিলেন। তার পর নখ কাটিতে কাটিতে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন—"You are a brave boy! তুমি একজন সাহসী ছেলে। তুমি আর এক দিন একখানি দরখাস্ত লইয়া আমার কাছে আসিতে পার কি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরূপ দরখাস্ত।" তিনি আবার সেই সুন্দর ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"সাধারণ দরখাস্ত। তুমি গবর্ণ-মেণ্টের কোনও চাকরি চাও, এই মাত্র। যদি তৎসঙ্গে কোনও বিশিষ্ট লোকের দুই একখানি সার্টিফিকেট আনিতে পার তবে আরও ভাল হয়। তাহাতে কেবল এই মাত্র থাকিবে যে তুমি ভদ্র বংশের সন্তান। তোমার চরিত্র ভাল।" আমি অধোমুখে চিত্র-পুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই আশাতীত কল্পনাতীত দয়াতে আমার চক্ষু ভিজিয়া গিয়াছে। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি যে তাঁহার কাছে আমার খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু মুখে কথা সরিতেছে না। আমি অতি কষ্টে

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—"একটি বিপন্ন বালকের প্রতি আপনার এই দয়ার জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।" তিনি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"Poor boy!" তাহার পর বলিলেন—"তুমি দরখাস্ত লইয়া আসিও। আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি দেখিব।" আমি ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা হইল তাঁহার বুট-মণ্ডিত পা দুখানি বক্ষে লইয়া তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করি।

আজ হৃদয় আনন্দে উৎসাহে পরিপূর্ণ। আমার মাটিতে পা পড়িতেছে না। অবসন্ন শরীরে যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়াছে। নক্ষত্রবেগে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পটুয়াটোলার বাসায় আসিলাম। আজ আর দৈনিক বিদ্রূপকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে ছাদে গেলাম। দুই চন্দ্রকুমার ও হরকুমারকে আজিকার আনন্দ সংবাদ বলিলাম। শুনিয়া তাহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার বলিল—"তোমার যে সুন্দর মুখ, এবং যেরূপ কহিবার শক্তি, স্বয়ং লেঃ গবর্ণরও মোহিত হইত। আর কি তুমি বড় লোক হইতে চলিলে। আমাদিগকে তখন চিনিতে পারিবে ত?" আনন্দে সকলের চক্ষু ভিজিয়াছিল। সেই সন্ধ্যা কি সুখের সন্ধ্যা! সে দিনের বাঁশিতে সেই ইতর সহবাসীরা গৃহত্যাগ করিয়া নীচের ঘরে পড়িতে গেলেন।

পর দিন প্রাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলাম। শুনিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইলেন। বলিলেন—"বিপদে এরূপ সাহস চাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেপ্টেন ষ্টানসফিল্ড আমার কি করিতে পারেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"পাগল, লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারি, কি করিতে না পারেন? তোমাকে ডেঃ মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত

করিয়া দিতে পারেন। তিনি একটি কথমাত্র বলিলে তুমি অন্ততঃ বেঙ্গল আফিসের এসিস্‌টেণ্ট একটিও অনায়াসে পাইতে পারিবে। তুমি একখান দরখাস্ত লিখিয়া কাল আমার কাছে লইয়া আসিও।” বেঙ্গল আফিসে কয়েকজন এসিস্‌টেণ্ট নিযুক্ত হইবে; আমিও দরখাস্ত করিয়াছি। আশা হইল তবে তাহার একটি পাইব। দাদা একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন। তিনি ভিতরের কথা কিছুই জানেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে তাহা লইলে তিনি একখানি পত্রসহ আমাকে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের কাছে পাঠাইলেন।

কৃষ্ণদাস বাবুর নক্ষত্র তখন বঙ্গের আকাশে উদিত হইতেছে মাত্র। কে জানিত যে অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিতে না করিতে তাহা অকালে কালগর্ভে খসিয়া পড়িবে? তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটরি পদে তখন অধিষ্ঠিত, এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘পেট্রিয়ট’ পড়িতে পড়িতে বলিতেছিলেন—“কৃষ্ণদাস ক্রমে ক্রমে কাগজখানি একরূপ চলনসহি করিয়া তুলিল। সুদক্ষ লেখক হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ‘পেট্রিয়ট’ যেন এত দিনে একটুক মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।” খুঁজিতে খুঁজিতে বারাণশী ঘোষের ষ্ট্রীটের একটি ক্ষুদ্র গলিতে একখানি ক্ষুদ্র একতল বাড়ী শুনিলাম কৃষ্ণদাস বাবুর বাড়ী। বাড়ীর ভিতরে কি বাহিরে আস্তরের চিহ্ন নাই। কোনও কালে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোণাধরা ইটগুলি দাঁত বাহির করিয়া নিতান্ত দরিদ্রতা প্রকাশ করিতেছে। এ বাড়ী কৃষ্ণদাস বাবুর, আমার সহসা বিশ্বাস হইল না। কিন্তু একজন, দুইজন, তিনজনে বলিল ইহাই তাঁহার বাড়ী। তখন অগত্যা প্রবেশপথে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র ময়লা ঘরে একখানি camp-bed কি তক্তপোষের উপর পড়িয়া সামান্ত ধুতিমাত্র পরিহিত একটি কদাকার

পুরুষ একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছেন। আমি মনে করিলাম একজন চাকর হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কৃষ্ণদাস বাবু বাড়ী আছেন?" উত্তর—"কেন?" বলিলাম—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি চিঠি আছে।" তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"কই? দেখি।" আমি বলিলাম—"পত্রখানি কৃষ্ণদাস বাবুর হাতে দিতে বলিয়াছিলেন।" আমার ইচ্ছা আমি একবার নিজে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় করিব। তিনি প্রসারিত হস্ত কুঞ্চিত না করিয়া বলিলেন—"দেও না?" আমি লজ্জিত ও বিস্মিত হইলাম। তবে এই কি সেই কৃষ্ণদাস বাবু! আমি পত্রখানি দিলাম। তিনি খপ করিয়া লেফাফাটি ছিঁড়িয়া চক্ষের নিকটে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার সন্দেহ ঘুচিল, এবং এ অবসরে তাঁহার মূর্ত্তি আমি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কৃষ্ণদাসের সেই স্থূল কৃষ্ণ কলেবরের, সেই স্থূল গণ্ড ও অধরোষ্ঠের, সেই প্রতিভা-পূর্ণ বিশাল ভাসমান নেত্রদ্বয়ের, সেই প্রকাণ্ড মস্তকের, এবং সেই দরিদ্র বেশের, আমি আর নূতন করিয়া কি বর্ণনা করিব? আজ এমন শিক্ষিত বাঙ্গালি কে আছে যে তাহা দেখে নাই। দেখিলাম বঙ্গের তিন জন বড় লোকই—বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস ও প্যারীমোহন—তিনটি কুরূপের আদর্শ। ভগবান নিজেও কি এজন্য কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এককালে বিকৃত বামন হইয়াছিলেন? তিনি পত্র পড়িয়া দরখাস্তখানি চাহিলেন। পড়িয়া দরখাস্ত কে লিখিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদার নাম বলিলাম। প্রশ্ন—"তিনি কি গ্রেজুয়েট?" বলিলাম—"এম এ"। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি কি?" উত্তর—"বি এ।" প্রশ্ন—"তোমার বাড়ী কোথায়?" উত্তর—"চট্টগ্রাম।" তাঁহার বিশাল চক্ষু বিস্ময়ে বিস্তৃত হইল। প্রশ্ন—"টানসুক্লিজের সঙ্গে তোমার কিরূপে পরিচয় হইল?" আমি সংক্ষেপে

আত্মকাহিনী বলিতে লাগিলে তিনি আবার বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—“তোমার ভাষায় ত বাঙ্গাল দেশের কোনও গন্ধ নাই; তুমি না বলিলে আমি তোমার বাড়ী নিশ্চয় কলিকাতায় মনে করিতাম।” তাহার পর আমার আত্ম-বিবরণ শুনিয়া বড় প্রীত হইয়া বলিলেন—“You are a wonderful young man! (তুমি একজন আশ্চর্য্য যুবক!)” তাহার পর চট্টগ্রাম সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলাপ করিয়া আমাকে বলিলেন—“এ দরখাস্তে হইবে না। তুমি কাল আসিও। আমি নিজে তোমার জন্য একখানি দরখাস্ত লিখিয়া রাখিব।” পর দিন গেলে তিনি তাঁহার লিখিত দরখাস্তখানি পড়িয়া শুনাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন হইয়াছে ত?” আমি ধন্যবাদ দিলাম। তিনি বলিলেন—“এ দরখাস্তের কি ফল হয় তুমি আমাকে জানাইবে। আমি নিজে যদি তোমার কোনও উপকার করিতে পারি, অত্যন্ত সুখী হইব। আমি তোমাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছি। নিরাশ্রয়ের ঈশ্বর অবশ্য তোমার ভাল করিবেন।” তাঁহার স্নেহে আমার বড় ভাসা চক্ষু দুটি ছল ছল হইল। আমি ভাবিলাম বুঝি বন্ধু দ্বিতীয় চন্দ্রকুমারের কথা ঠিক। আমার মুখখানিতে বুঝি কিছু আছে। না হইলে সকলে আমাকে এত দয়া করিবে কেন?

শুরু চন্দ্রকুমার দরখাস্ত নকল করিয়া দিল। আমি যথাসময়ে আবার বঙ্গের ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। কার্ড কোথায় পাইব? একখানি কাগজে নাম লিখিয়া পাঠাইবা মাত্র কেপ্টেন ষ্টান্সফিল্ড আমাকে ডাকিলেন। কি শুভক্ষণে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ! তিনি দেখিয়াই সেই সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিলেন—“Well boy! what is the news? (ভাল, বালক! কি খবর?”) আমি দরখাস্ত ও তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি বলিলেন—“তুমি আমার কাছে

আইস।” কি আদর। আমি চেয়ারের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম. সম্মুখের প্রাচীরের বিরাট আয়নাতে উভয়ের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বঙ্গেশ্বরের ঘনিষ্ঠ সচীবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একটা ধূলাবিমণ্ডিত বাঙ্গালি দরিদ্র বালক! সাহেব আয়নাতে এ ছবি দেখিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন। আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, দিগম্বর বাবুর, কেশব বাবুর, দ্বারিকানাথ মিত্রের, এবং জেনেরেল এসিম্বিলির প্রিন্সিপেল পুণ্যাত্মা অগিলভি (Rev Ogilvi) সাহেবের সার্টফিকেট লইয়াছিলাম। রাজকৃষ্ণ বাবু মিঃ সাট্‌ক্লিফ সাহেবের কাছে সার্টফিকেট চাহিলে, তিনি রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—“ও! সে লেঃ গবর্ণরের কাছে পর্য্যন্ত যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার কি দুরাকাঙ্ক্ষা! আমি সার্টফিকেট দিব না।” মিঃ ষ্টান্সফিল্ড পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“তুমি ত বড় কম পাত্র নহ। তুমি বঙ্গের এতগুলি সর্ব্বপ্রধান বড় লোকের কেমন করিয়া এমন প্রিয়পাত্র হইলে?” তাহার পর দরখাস্তের উপর আমার বয়স খুব বড় ছাঁদে নীল পেনসিলে লিখিয়া বলিলেন—“তুমি এখন যাও! আমি তোমার অভিভাবক বিদ্যাসাগরের ঠিকানায় তোমাকে ইহার ফল জানাইব। তুমি আর এ রৌদ্রে কষ্ট করিয়া এতদূর হাঁটিয়া আসিও না।” আমি ভাবিলাম—“ইনি মানুষ, না দেবতা?” ইংরাজদের মধ্যে এরূপ দেব-চরিত্র আছে আমি জানিতাম না। মাতার কাছে এই দেব-দয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইলাম। মাতা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। আজ সেই সকল দেবতুল্য ইংরাজ কোথায় গেল?

অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।"

দিন গেল। দিন দিন গণিয়া পক্ষ গেল। কই, কৃপাময় কেপ্টেন ষ্টান্সফিল্ড হইতে কোনও খবর পাইলাম না। আবার হৃদয় নিরাশায় ডুবিয়া গেল। বুঝি ষ্টান্সফিল্ড এ দরিদ্র বালকের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজ সচীব; গুরুতর কার্য্যভারে প্রপীড়িত; ভুলিয়া যাইবারই কথা। অথচ তাঁহার কাছে আর যাইতে সাহসও হইতেছে না। তিনি আর যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যদিও আমাকে এত পথ হাঁটিয়া যাইতে হয় বলিয়া দয়া করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি কি জানি আর বার গেলে যদি তিনি বিরক্ত হন? এ বিপদসাগরে তিনিই যে একমাত্র ধ্রুবতারা। অথচ এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায়ও ত আর থাকা যায় না। অতএব অস্থির হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় আসিয়াছেন কি না দেখিতে গেলাম। তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তিখানি দেখিয়াই মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। তিনি বলিলেন এরূপ অস্থির হইলে চলিবে কেন? আমি বলিলাম এত চেষ্টা করিলাম, এখন পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। তিনি বলিলেন—"চেষ্টা করিলেই যদি মানুষের দুঃখ দূর হইত, তবে এ সংসারে দুঃখ থাকিত না। চেষ্টা না করে কে? তুমি ত চেষ্টার আর ত্রুটি কর নাই। এত লোক যখন তোমার সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, স্বয়ং ষ্টান্সফিল্ড তোমাকে এরূপ আশা দিয়াছেন, তখন অবশ্যই কিছু না কিছু একটা হইবে। তবে কিছু দিন আগে আর পরে, এইমাত্র।" আমি বলিলাম—"আপনি একবার ষ্টান্সফিল্ডের কাছে যদি অনুগ্রহ করিয়া কোনও কার্য্য উপলক্ষ করিয়া যান।" তিনি বলিলেন—"আমি তাহা অনায়াসে পারি। প্রাইভেট

সেক্রেটরি কেন, আমি লেঃ গবর্ণরের কাছেও তোমার জন্য বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হইবে যে তাহা নহে। এখন কি ভাই! আর সে দিন আছে? একদিন এমন ছিল যে আমি কাহারও জন্য একটুক ইঙ্গিত করিলে লেঃ গবর্ণর তাহাকে ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ সরল সহৃদয় ইংরাজ নাই। আমি কি সাধে এত বড় চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছি। ইহাদের সকলেরই মুখ এক, মনে আর। আমাদের প্রতি দিন দিন ইহাদের সহানুভূতি উঠিয়া গিয়া খাদ্য খাদক সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে। আমি যদি সঙ্গে করিয়া লেঃ গবর্ণরের কাছে লইয়া যাই, এবং বলি বড় ভাল ছেলে, সদ্বংশজাত। তিনি একেবারে মধুর হাসি হাসিয়া তোমাকে বেশ দু চার মিষ্ট ফাঁকা কথা বলিয়া হাতে স্বর্গ দিবেন। কিন্তু সেই মাত্র। কাজে [illegible] করিবেন না। এখনকার দিনে ষ্টান্সফিল্ডের কটাক্ষে যাহা হইবে কলিকাতার সমস্ত বড় লোক একত্র হইলেও তাহা করিতে পারিবে না। অতএব তুমি তাঁহারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাক। আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া দেখ। তথাপি যদি কোনও খবর পাওয়া না যায়, তখন যাহা হয় একটা করা যাইবে।” তাহার পর প্রায় দুই ঘণ্টা কাল তিনি কত গল্প করিলেন। এমন সুন্দর প্রাণভরা গল্প আর কাহারও মুখে শুনি নাই। শেষে অনেক আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।

কিন্তু বাসায় যাইতে ইচ্ছা হইল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে ত্রৈলোক্য দাদার কাছে গেলাম। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে আর ত্রৈলোক্য দাদার পরিচয় দিতে হইবে না। যে তাঁহাকে চিনে না, সে আপনাকে চিনে না—"argues himself unknown." দাদা আমাকে অনেক মুরুব্বিয়ানা কথা বলিলেন।

আমি অন্যমনস্ক হইবার জন্য পড়িতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু একে একে কত বহি পড়িতে চাহিলাম, কিছুতেই মন লাগিল না। শেষে দেখিলাম—"মনে মানে না বারণ।" তখন 'যা থাকে কপালে' বলিয়া 'বেলভিডিয়ার' মুখে যাত্রা করিলাম। বেলা ৫টার সময়ে সেখানে পদব্রজে গিয়া পঁহুছিলাম। আমার সেই আর্দালি মুরুব্বি দেখা দিলেন। তিনি কিছুতেই আমার নাম ষ্টাপ্লফিল্ডের কাছে লইবেন না। তিনি বলিলেন ৩টার পর সাহেব কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না। তিনি মিস বিবিকে লইয়া বসেন। পরে তিনি সেই মিস বিবির, গ্রে সাহেবের কন্যার, পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"আমি এতদূর হাঁটিয়া আসিয়াছি। তুমি কাগজখানি লইয়া যাও। সাহেব দেখা না করেন চলিয়া যাইব।" অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, চাকরি হইলে মবলক দক্ষিণায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া শেষে তিনি নাম লইয়া গেলেন। আর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"উঃ! সাহেব নিশ্চয় তোমাকে একটা চাকরি দিবে। তুমি চল, তোমাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু দেখিও আমার বক্‌সিসের কথা ভুলিও না।" আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলাম। আমি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সুপ্রসন্ন হাসিতে তাঁহার মুখ রঞ্জিত হইল।

প্র। Well boy, why do you come again? ভাল, বালক! তুমি আবার কেন আসিয়াছ?

উ। আমার কি করিলেন, তাহা জানিতে আসিয়াছি।

তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া—"কি তুমি ইতিমধ্যে কিছুই পাও নাই?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কই না।" তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া—"আজও না?" উত্তর—"না।" "তুমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলে?" উত্তর—"আমি এইমাত্র তাঁহার কাছ

হইতে আসিতেছি।” “Poor boy! অভাগা বালক! তুমি কলিকাতার সেই উত্তর সীমা হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছ?” তিনি বিস্ময় ও দয়ার্দ্র-চিত্তে এ কথা বলিয়া একখানি স্লিপে বড় অক্ষরে লিখিলেন—“প্রিয় ডেম্পিয়ার! নবীন কি ‘নমিনেশন’ পায় নাই?” আমাকে পূর্ব্ববৎ আদরে ডাকিলে আমি তাঁহার চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলাম। ভাবিলাম তবে বেঙ্গল আফিসে চাকরি হইয়াছে। ডেম্পিয়ার তখন চিফ সেক্রেটরি। তিনি লেঃ গবর্ণরের কাছে বসিয়াছিলেন। তখনই সেই কাগজখানির নীচে উত্তর আসিল—“আমার স্মরণ হয়, হাঁ। তুমি রেজিষ্টার দেখ।” তিনি আমাকে wait a bit (কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর) বলিয়া পার্শ্বের কক্ষে উঠিয়া গেলেন। পরে শুনিয়াছিলাম রেজিষ্টরিতে প্রথম নাম আমারই ছিল। সেখান হইতে হাসিতে হাসিতে আসিয়া খস্ খস্ করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া আমার নাক সিদা ছুড়িয়া মারিলেন। কার্য্যটিতে কত নীরব স্নেহ! বলিলেন—“তুমি আণ্ডার সেক্রেটরি মিঃ জোনস্‌কে চেন?” আমি বলিলাম—“চিনি। তিনিও আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন।” আমি ইতিমধ্যে প্রথম হেড এসিষ্টেণ্ট রাজেন্দ্র বাবুর দ্বারা জোনস্ সাহেবকে মুরুব্বি ধরিয়া বেঙ্গল আফিসে চাকরির উমেদারি করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন—“তুমি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিতে বড় পটু। মিঃ জোনস্‌কে কেমন করিয়া পটাইলে? এ চিঠিখানি তাঁহাকে দিলে, তিনি তোমাকে কিছু দিবেন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“সে কিছুটা কি?” তিনি হাসিয়া বলিলেন—“তুমি বড় কুতূহলী। আমি তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করিব না। তাহা বলিব না। এখন তোমার ভবিষ্যৎ তোমার হাতে।” আমি ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া নামিয়া আসিলে মুরুব্বি মহাশয় গ্রেপ্তার করিলেন—“সাহেব কি বলিল?” আমি বলিলাম কিছুই না। কেবল আশা

দিলেন মাত্র। কিন্তু মুরুব্বি মহাশয়ের "তদপি নমুঞ্চত্যাশা বায়ু।" তিনি বলিলেন—"তোমার নিশ্চয় চাকরি হইবে। দেখিতেছ তোমার জন্য কত পরিশ্রম করিতেছি। তুমি আমার বক্‌সিস ভুলিবে না ত?" আমি বলিলাম—"তাও কি হয়?"

অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া আমার আর সহিল না। আমি পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার আঠা তখনও ভিজা ছিল। তাহাতে লেখা ছিল—"প্রিয় জোনস্! ডেঃ মাজিষ্ট্রেটি পরীক্ষার জন্য নবীনকে যে নিয়োগপত্র পাঠান হইয়াছিল তাহা ভুলবশতঃ অন্যত্র গিয়াছে। তুমি তাহাকে আর একখানি নিয়োগপত্র দিবে।" পড়িলাম, পড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার পা চলিতেছে না। সমস্ত বেল্‌ভিডিয়ার যেন চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমি অতি কষ্টে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলাম। ডেঃ মাজিষ্ট্রেটি! ডেঃ মাজিষ্ট্রেটি কি? কোনও দিন প্রলাপ স্বপ্নেও ত আমার আশা এতদূর উঠে নাই। ওকালতি, মুন্‌সেফি, সবজজি, এ সকল আশৈশব শুনিয়াছি। উকিল হইব, এ আশা উচ্চতম আশা ছিল। ডেঃ মাজিষ্ট্রেটি ত কখন মনেও ভাবি নাই। উহা কি জানিতামও না। তবে জানিতাম একটা বড় চাকরি। কিন্তু তাহার পরীক্ষাত কখনও শুনি নাই। কিরূপ পরীক্ষা? যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি? তাহাই খুব সম্ভব, কারণ এরূপ বিপন্ন অবস্থায় কি পরীক্ষা দেওয়া যায়? হা ভগবান! হা ষ্টান্‌ফিল্ড! এরূপে আকাশ কুসুম আমার হাতে দিয়া কি আমাকে বঞ্চিত করিলে?" দর দর ধারায় অবলম্বিত বৃক্ষে আমার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। এমন সময় দ্বারস্থ অস্ত্রধারী প্রহরী হাঁকিলেন—"কোন্ হায়! চলে যাও।" যন্ত্রের মত চলিলাম। বেল্‌ভিডিয়ার, পৃথিবী, আকাশ, সকলই ঘুরিতেছে। আমি চলিতে পারিতেছি না। কেমন করিয়া এতদূর পথ যাইব। সেই পিতৃব্য

মহাশয় খিদিরপুরে বেলভিডিয়ারের কিঞ্চিৎ দূরে বাসা করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্ত তাঁহার বাসায় গেলাম। তিনি দেখিবা-মাত্র মুখখানি মলিন করিলেন। মনে করিলেন বুঝি কিছু সাহায্য চাহিতে গিয়াছি। নিতান্ত মামুলি ধরণে আমার নমস্কার লইয়া বসিতে বলিয়া কোথায় গিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম—লাট সাহেবের বাড়ী গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইল ? আসল কথা কিছু না বলিয়া বলিলাম—"যেমন দিয়া থাকেন তেমনি আশা দিয়াছেন মাত্র।" তখন বাড়ী না গিয়া কলিকাতায় অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছি, আমার পিতার মত আমিও সংসার-জ্ঞানহীন, ইত্যাদি তীব্র ভর্ৎসনা অবনত মস্তকে শুনিলাম। ক্ষুধায় উদর জ্বলিতেছিল, পিপাসায় বুক ফাটিতেছিল। আমি অতি কাতর করুণকণ্ঠে বলিলাম—"বড় পিপাসা হইয়াছে, এক গ্লাশ জল দিতে বলুন।" ভাবিলাম তাহা হইলে শুধু জল আর দিবেন না। কিছু জলখাবারও দিবেন। কিন্তু হায়! ভগবান! মানুষ কি সময়ের দাস! যাঁহার বাড়ীতে আমি গেলে এক দিন একটা দুর্গোৎসব হইত, আজ তিনি আমাকে এক গ্লাশ গঙ্গোদক মাত্র দিলেন। অন্তরে অশ্রুপাত করিলাম; বাহিরে জল পান করিয়া উঠিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পটুয়াটোলা লেনের মোড় ফিরিতেই দেখিলাম দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার রাস্তার উপর দ্বিতল বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। আমাকে দেখিবা মাত্র হাসিয়া নীচে ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আজ ষ্টাজকিন্ডের কাছে গিয়াছিলে ?" উত্তর—হাঁ। "কি বলিলেন ?"—আমি বলিলাম—"এমন কিছু নহে। পরে বলিব।"—চন্দ্রকুমার উচ্চহাসি হাসিয়া—"কি চালাক ছোকরা! তোর যে "নমিনেশন রোল" আসিয়াছে। তুই যে ডেপু

মাজিষ্ট্রেট হইলি।" আমি বিস্ময়ে বলিলাম—"হইয়াছি?" উত্তর—"আর হইবার বাকী কি? তুই নিশ্চয় পরীক্ষায় পাশ হইবি।" দুইজনে গলাগলি করিয়া উপরের ঘরে গেলাম। গৃহ তোলপাড়। আমি উঠিয়া আসিলেই নিয়োগপত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া এক আনন্দপূর্ণ পত্রসহ বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। আকাশ হইতে আমার জন্ত অকস্মাৎ ইন্দ্রের সিংহাসন নামিয়া আসিলে সহবাসিগণ অধিক বিস্মিত হইতেন না। চন্দ্রকুমারের আনন্দে পরীক্ষার নামে আশঙ্কা মিশ্রিত হইয়াছে। হরকুমার আনন্দে অধীর। চন্দ্রকুমার ইতিমধ্যে আমার 'বেলভেডিয়ার' উপাখ্যান বলিয়া দিয়াছেন। দাদা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আনন্দে বলিতেছেন—"এরূপ সাহস চাই। আমি ইহা আগেই জানিতাম। আমাদের কুলাচার্য্য আমাকে বলিয়াছিল তাহার কর্ম্মস্থানে চন্দ্র। তাহার কখনও দুঃখ হইবে না।" আর ইতর বংশ-জাত সেই দুইজন! তাহারা কি বিষম অবস্থায়ই পড়িয়াছে! এতদিন এত তীব্র মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ করিয়া আজ কেমন করিয়াই বা আনন্দ প্রকাশ করিবে! অথচ না করিলেও বড় ইতরতা হয়। তাহাদের ঠিক যেন 'হরিষে-বিষাদ' উপস্থিত হইয়াছে। মর্ম্মবেদনায় হৃদয় অস্থির, অথচ মুখে একটুকু কষ্ট হাসি হাসিয়া কখন একটুকু আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আবার তখনই বলিতেছে—"পরীক্ষায় পাশ হইলে ত? এরূপ পরীক্ষায় পাশ হওয়া বড় সহজ নহে। বি, এ পরীক্ষা হইতেও শক্ত।" আমারও আশঙ্কা তাহাই। নিয়োগ-পত্রে লেখা আছে সাহিত্যে, অঙ্কে, ইতিহাসে, পরীক্ষা হইবে। সাহিত্যের কোন্ পুস্তক, কি ইতিহাস, কোন্ দেশের ইতিহাস, তাহা পর্য্যন্ত লেখা নাই। তাহার পর আরও সর্ব্বনাশ—বিজ্ঞান! বিজ্ঞানের নামে হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইল। আমরা বিজ্ঞান ত কিছুই পড়ি নাই। তখন বিজ্ঞান স্কুল কলেজে পাঠ্য ছিল না। তাহাতে আবার

কি বিজ্ঞান, কোন বিজ্ঞানের পুস্তক, তাহা কিছু লেখা নাই। কি করিব? ত্রৈলোক্য দাদা বলিলেন—"Joyce's Scientific dialogue পড়"। কলেজ লাইব্রেরি হইতে বহি একখানি দিলেন। দেখিলাম এখানি বিজ্ঞানের শিশুপাঠ মাত্র।

সর্ব্বশেষ, পরীক্ষা কেবল সম্পূর্ণ নূতন এমন নহে, competition examination (প্রতিযোগী পরীক্ষা!) লেঃ গবর্ণর সার উলিয়ম গ্রে কিছু ধর্ম্ম-ভীরু লোক ছিলেন। তৈল এবং সুকতলার উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন। তখন ডেঃ মাজিষ্ট্রেট হইবার একমাত্র সোপান এই দুই মহা পদার্থ। অতএব তিনি ৩৪টি ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের পদাভিলাষীকে পরীক্ষার দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া ক্রমে ক্রমে, পরীক্ষার ফলানুসারে, নিয়োজিত করিতে স্থির করিয়াছিলেন। ৩৪ জনের মধ্যে ১৭ জন ইংরাজ, এবং ১৭ জন দেশীয় লোক নিয়োজিত হইবে। তজ্জন্য ৫১ জন ইংরাজ ও ৫১ জন দেশীয় লোক নির্ব্বাচিত হইয়া পরীক্ষা দিবার জন্য অনুমতি পাইবেন। কেবল শিক্ষিত এবং সদ্বংশীয়দিগকেই মনোনীত করা হইবে। এই ৫১ জনের মধ্যে পরীক্ষায় যে ১৭ জন প্রথম হইবেন, তাঁহারা পাশ হইবেন, এবং তাঁহাদের প্রথম ৯ জন তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম পাইবেন। বাকী ৮ জন ক্রমে ক্রমে নিয়োজিত হইবেন। আমার মুদ্রিত নিয়োগপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলী ছিল; তাহাতে এ সকল কথা লেখা ছিল। যদি প্রথম ১৭ জনের মধ্যে হইতে না পারি তাহা হইলে পাশের মধ্যে গণ্য হইব না; সকল আশা ফুরাইবে। অতএব আমার ভগ্ন দেহ ও ভগ্ন হৃদয় লইয়া যে এরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব সে আশা এক প্রকার ত্যাগ করিলাম।

পর দিন দৈনিক সংবাদপত্রে উক্ত নিয়মাবলী সহ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, এবং কলিকাতা সহরে, বিশেষতঃ কলেজে,

একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমি কলেজে গেলেই শত শত ছাত্র আমাকে ঘেরিয়া কিরূপে মনোনীত হইলাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা—"আরে এ বাঙ্গাল ত কম পাত্র নহে। ভিজে বিড়াল।" শত শত বালক পথে ঘাটে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমার দেখাদেখি চেষ্টা করিয়া আরও কয়েক জন 'বি এ' ও 'এম এ' নিয়োগপত্রের যোগাড় করিলেন। বলিয়াছি দরিদ্রের বন্ধু ষ্টান্সফিল্ডের কৃপায় আমার নাম রেজেষ্টরিতে প্রথম ছিল।

পরীক্ষার দিন আসিল। ১০২ জন 'টাউন হলে' পরীক্ষা দিতে বসিলেন। পরীক্ষক খ্যাতনামা কে, এম, বেনার্জ্জি ওরফে "কৃষ্ণ বন্দো" এবং প্রেসিডেন্সি কমিসনার চাপমেন সাহেব। দেখিলাম ১০২ জনের মধ্যে আমার মত নিরাশ্রয়, অল্পবয়স্ক, কেহ নাই। আমার মত কাহারও সর্ব্বস্ব এ পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিতেছে না। ভক্তিভাবে পিতাকে স্মরণ করিয়া পরীক্ষা দিতে বসিলাম। দুই দিন পরীক্ষা হইল। তৃতীয় দিবস রচনা,—পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গালা, অপরাহ্নে ইংরাজি। ইতিমধ্যে প্রশ্ন চুরি গিয়াছে বলিয়া কলিকাতায় গুজব উঠিয়াছিল। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অর্দ্ধ প্রাচীন লোক ছিলেন। লোকটি পাকা রসিক। সকলকে খুব হাসাইতেন। এ সকল বালকের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার কার্য্য নহে। তিনি প্রায়ই বসিয়া চারিদিক দেখিতেন ও ঠাট্টা তামাসা করিতেন। তিনি দেখিলেন হাইকোর্টের কোন জজের জামাতা তাঁহার পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিলেন। তিনি চুপে চুপে গিয়া চ্যাপমেন সাহেবকে খবর দিলেন। সাহেব আসিয়া ধরিলেন। দেখিলেন 'জামাই বাবু' বাড়ী হইতে রচনা রচিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া হইল। 'টাউন হলে' একটা গোল পড়িয়া গেল। চ্যাপমেন সাহেব ভ্রুকুটি করিয়া তাহা থামাইলেন।

পূর্ব্বাহ্নের পরীক্ষার পর গ্রেজুয়েট দল সকলে আমাকে বলিলেন—"তুমি পরীক্ষকদের কাছে বল যে আমরা অপরাহ্নে পরীক্ষা দিব না; কারণ যখন প্রশ্ন চুরি হইয়াছে, তখন যত বড় মানুষের এঁড়ে পাশ হইবে, আর আমাদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্ক হইবে।" আমি বলিলাম—"মন্দ নহে। বাঘের মুখে বাঙ্গালটাকেই দেও।" তাঁহারা কিছুতেই ছড়িলেন না। বলিলেন আমার মত তাঁহাদের সাহস নাই। আমি যেমন পরীক্ষকদের কক্ষে প্রবেশ করিলাম, চ্যাপমেন সাহেব বাঘের মত আমার উপর আসিয়া পড়িলেন। বাকি গ্রেজুয়েটারা আমার পশ্চাতে "সম্মানজনক ব্যবধানে" ত ছিলেনই। এখন আরও সরিয়া পড়িলেন। ইহাদের মধ্যে একজন রেজেষ্ট্রি বিভাগের ভবিষ্যৎ অথর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টার জেনেরেল মহাশয়ও ছিলেন। কলিকাতার লোকের বীরত্ব কেবল আমাদিগকে বাঙ্গাল ডাকিবার বেলায়! রামমাণিক্য যথার্থ বলিয়াছিল—"হালার বাই হালারা বাঙ্গাল বাঙ্গাল কইবার পারেন, ভাজা মটর দিবার পারেন না।" আমরা পরীক্ষা দিব না বলাতে সাহেব চটিয়া লাল। কারণ প্রশ্ন তাঁহার হেফাজত্‌ হইতে চুরি গিয়াছে। তাঁহার ঘোরতর কলঙ্কের কথা। তিনি প্রথম খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। আমার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র বাকযুদ্ধ হইয়া গেল। তখন শ্বেতশ্মশ্রু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া প্রকৃত পাদরির কার্য্য করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমাদের গ্রেজুয়েটদের ভয় নাই। আমরা উত্তর দেখিয়া কি গ্রেজুয়েট ও অগ্রেজুয়েটের উত্তরের তারতম্য বুঝিতে পারিব না?" আমরা অগত্যা অপরাহ্নের প্রশ্ন গ্রহণ করিলাম।

পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই টাউনহলে কি একটা মিটিঙ্গের ভিড় পড়িয়া গেল। আমি উত্তরের কাগজ কে, এম, বানার্জ্জির হাতে

কক্ষ হইতে বাহির হইতেছি, অমনি ডাক পড়িল—Look here boy! "এই দেখ, বালক!" ফিরিয়া দেখি চ্যাপমেন বাহাদুর ডাকিতেছেন। আমি ফিরিলে তিনি এক নোট বুক বাহির করিয়া তাঁহাতে আমার নাম ধাম লিখিয়া লইয়া গ্রীবা হেলাইয়া বলিলেন—"আমি ইচ্ছা করি তুমি পরীক্ষায় পাশ হও।" ইহার অর্থ কি? আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি বুঝিলাম ইনি আমার উপর চটিয়াছেন। আমাকে নিশ্চয় 'ফেল' করিবেন। টাউনহল আমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি পড়িতেছিলাম। একখানি টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইলাম। পরীক্ষার্থীরা আমাকে ঘিরিয়া বিষয়টি কি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম। নানা জনে নানা অর্থ করিতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম আর আমি নবকুমারের মত পরের জন্য কাঠ কাটিতে যাইব না। পর দিন প্রাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি পাগল। চ্যাপমেন সাহেব বরং তোমার আলাপ শুনিয়া ও সৎসাহস দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। তিনি নিশ্চয় তোমাকে তাঁহার ডিভিসনে রাখিবেন।" আমার তথাপি বিশ্বাস হইল না। আমি বলিলাম—"অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার কাগজগুলি দেখিবেন।" তিনি হাসিতে লাগিলেন।"শৃঙ্গীনাং দশ হস্তেন"—চাণক্য ঠাকুরের এই মহাবাক্য আমি কেন মাটি খাইয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলাম? কেন চ্যাপমেন সাহেবের দশ হস্তের মধ্যে গিয়াছিলাম? তজ্জন্য অনুতাপ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম।

আজ বেঙ্গল আফিসে (Bengal office) ১২ জন এসিস্টেণ্ট নিযুক্ত হইবে। বেতন ৪০৲। চন্দ্রকুমার Adventures of Dr. Livingstone বহিখানি কিনিয়াছিলেন। আমি তাহা হাতে করিয়া বেঙ্গল আফিসে গেলাম। এবং ডাক পড়িবার প্রতীক্ষায় বসিয়া পড়িতে

লাগিলাম। বেঙ্গল আফিস তখন গঙ্গার ধারে ছিল। সেক্রেটরি ডেম্পিয়ার সাহেব আফিসে আসিলেন। প্রথমেই আমার ডাক পড়িল। জোনস্ সাহেব স্বয়ং আমাকে ডাকিয়া লইলেন। তিনি পূর্ব্বে আমার ইতিহাস বলিয়াছেন, এবং ডেম্পিয়ার সাহেব চিনিয়াছেন আমি ষ্টান্সফিল্ড সাহেবের 'দরিদ্র বালক'। ডেম্পিয়ার সাহেব কি সুন্দর, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ছিলেন। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইংরাজ, এবং মুখে এমন মনমোহিনী হাসি যেন আমি আর দেখি নাই। তিনি বলিলেন—"আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।" আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচীব, আমি পথের কাঙ্গালকে কোথায় দেখিবেন!

প্র। তোমার বাড়ী কোথায়?

উ। চট্টগ্রাম।

প্র। তুমি ষ্টিমারে বাড়ী যাও?

উ। হাঁ।

প্র। শেষবার কবে গিয়াছিলে?

আমি উত্তর দিলে, তিনি বলিলেন সেই ষ্টিমারে তিনিও সমুদ্রের বায়ু সেবন করিতে গিয়াছিলেন। ষ্টিমারে আমাকে দেখিয়াছিলেন। আবার মনে হইল চন্দ্রকুমারের কথা বুঝি ঠিক। আমার মুখ খানিতে বুঝি কিছু আছে। তাহা কি? আমার পিতার পুণ্যালোক। তিনি আবার আদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার হাতে কি বহি?

উ। Adventures of Dr. Livingstone.

প্র। তুমি কত মূল্যে কিনিয়াছ?

উ। আমি কিনি নাই। আমার এক বন্ধু কিনিয়াছেন। মূল্যটা আমার এখন মনে নাই। তিনি শুনিয়া বলিলেন—তোমার

বন্ধু খুব সস্তা পাইয়াছেন। আমি তাহার দ্বিগুণ মূল্য দিয়াছি। তুমি বহিখানি পড়িয়াছ ?

উ। বন্ধু মোটে কাল কিনিয়াছেন। আমি এইমাত্র বাহিরে বসিয়া পড়িতেছিলাম।

তাহা শুনিয়া তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"জোন্স বলিতেছেন তুমি এখানে এসিষ্টেণ্টি পদের প্রার্থী। কেন ? তুমি ত ডেঃ মাজিষ্ট্রেটি পরীক্ষা দিয়াছ। না ?

উ। দিয়াছি। কিন্তু পরীক্ষার ফল অনিশ্চিত। তাহাতে আবার প্রতিযোগী পরীক্ষা। যদি প্রথম ১৭ জনের মধ্যে হইতে না পারি পাশ হইব না। আমার তাহা হইলে উপায়ান্তর থাকিবে না।

প্র। তুমি গ্রেজুয়েট,—না ?

উ। হাঁ। আমি এ বৎসর বি. এ. পাশ করিয়াছি।

প্র। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। অতএব কয়েক দিনের জন্য মাত্র তুমি কেন এ ক্ষুদ্র চাকরি গ্রহণ করিবে ?

আমি অধোমুখে ছল ছল নেত্রে ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কষ্টে বলিলাম—"আমি বড় দুঃখী, বড় বিপন্ন। জোনস্ সাহেব আমার সমুদায় অবস্থা শুনিয়া আমাকে এরূপ দয়া করিতেছেন। আমি যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হই; আমার মত কপালভাঙ্গা লোকের না হইবারই কথা, তবে আমার বিপদের সীমা থাকিবে না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে একটি এসিষ্টেণ্টের কর্ম্ম দিন।" তিনি সকরুণ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দরিদ্র বালক! তোমাকে কর্ম্ম দিতে আমার অনিচ্ছা নহে। আমি তোমাকে সন্তোষের সহিত চল্লিশ টাকার কর্ম্ম একখানি দিলাম। আমি ইহাও বলিতেছি যে তুমি যদি পরীক্ষায় পাশ না হও, আমি তোমাকে শীঘ্র আশি টাকার কর্ম্ম একখানি দিব।"

আনন্দে, আবেগে, আমার কপোল বহিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। আমি গলদশ্রুমুখে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতে শুনিলাম জোন্স সাহেব বলিতেছেন,—"কেমন দিব্বি ছেলে!—না?" ডেম্পিয়ার সাহেব—"আশ্চর্য্য ছেলে!" হায়! হায়! আবার জিজ্ঞাসা করি সে সকল দয়ার সাগর, দীনবন্ধু, দেবতুল্য ইংরাজ আজ কোথায়?

সেই দিন হইতে বেঙ্গল আফিসে কায করিতে লাগিলাম। সহ-কর্ম্মচারীরা আমাকে দেখিয়া, আমার ইতিহাস শুনিয়া, অবাক। হেড এসিষ্টেন্ট বলিলেন—"তুমি দুদিন পরে ডেঃ মাজিষ্ট্রেট হইবে। তোমার আর এখানে কায করিতে হইবে না। নিতান্ত ইচ্ছা হয় 'ডায়ারি' লেখ।" আধ ঘণ্টার কায। অবশিষ্ট কাল আমি গবাক্ষের কাছে বসিয়া ভাগিরথীর বক্ষ, তাহাতে ভাসমান অর্ণবযানসমূহ, তদূর্দ্ধে নির্ম্মল নৈদাঘ আকাশ, চাহিয়া চাহিয়া আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতাম, ও সময়ে সময়ে কবিতা লিখিতাম।

সাত দিন এরূপে গেল। আজ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কথা। নিজে তাহা জানিতে যাইব সাধ্য নাই। পা চলিতেছে না। অনিশ্চিত আশায় নিরাশায় হৃদয় কাঁপিতেছে। একখানি পত্র সহ হরকুমারকে কে, এম, বানার্জ্জির কাছে পাঠাইয়া বারান্দার রেলিঙ্গে বুক রাখিয়া অদৃষ্টের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আধ ঘণ্টা পরে হরকুমার হাসিভরা মুখে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া হৃদয়ে যেন আনন্দের তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইল। হরকুমার নীচে হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"তুমি পাশ হইয়াছ।" গৃহে কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই কোলাহলের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তর পড়িলাম—"তুমি পাশ হইয়াছ। তোমার স্থান কত হইয়াছে আমার স্মরণ নাই। কাগজপত্র চ্যাপমেন সাহেবের কাছে।

তবে তুমি এখনই কার্য্য পাইবে।” কোথায় কলিকাতার পথের কাঙ্গাল, আর কোথায় ডেঃ মাজিষ্ট্রেট! হা ভগবান! তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে?

সেদিন বেঙ্গল আফিসের গবাক্ষে বসিয়া লিখিলাম,—

“কিম্বা যদি নিরাশ্রয় দীন অসহায়,—
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে?
এই চিন্তা বিষধরী,
এই দুঃখ বিভাবরী,
কত দিন রবে আর? পোহাবে অচিরে,
দিবেন সুদিন যিনি দিলেন আমায়।”

আনন্দ পর্ব্ব।

"There is tide in the affairs of men
Which taken at the flood leads to fortune."

ছাত্রনিবাসের কোলাহল না থামিতেই যাদব আসিয়া উপস্থিত। আমার পরে যাদব প্রভৃতি কয়েক জন গ্রেজুয়েট আমার দেখাদেখি যোগাড় করিয়া নিয়োগ পত্র পাইয়াছিলেন। যাদব আমাকে তাহার গাড়িতে ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছে যাইয়া তাহার খবরটা লইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। একা যাইতে তাহার সাহস ও ভরসা হইল না। আমিও নিশ্চয় তত্ত্ব পাইবার জন্য তাহার সঙ্গে চলিলাম। যাদব আমার উপরের শ্রেণীতে পড়িত। তাহার অবস্থা বেশ ভাল। আমার সঙ্গে তখন বিশেষ পরিচয় ছিল না। পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি বিভ্রাটে গ্রেজুয়েট সম্প্রদায়ের মুখ-পাত্র হইবার সময়ে বিশেষ পরিচয় হয়। যাদব গাড়িতে বলিল—"আমার যাহা হউক, তুমি যে এ ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলে তাহাতে আমার আনন্দ শরীরে ধরিতেছে না।" যাদব বড় সহৃদয় লোক ছিল। আহা! আজ যাদব কোথায়? ডেম্পিয়ার সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সিঁড়ি বাহিয়া আসিতেছেন ওই মূর্ত্তি কে? সর্ব্বনাশ!—সেই চ্যাপমেন সাহেব! তিনি আমাকে দেখিয়া এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ভাল, বালক! তুমি কি জন্য আসিয়াছ?"

উ। ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করিতে চাহি!

প্র। কেন?

উ। আমাদের পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য।

প্র। তিনি তোমাদিগকে তাহা বলিবেন কেন? মনে কর তুমি পাশ হইয়াছ। তুমি প্রেসিডেন্সি বিভাগে থাকিতে চাহিবে। তোমার

বন্ধু মনে কর পাশ হইয়াছেন। তিনিও প্রেসিডেন্সি বিভাগে থাকিতে চাহিবেন। তবে উড়িষ্যায় ও চট্টগ্রামে যাইবে কে?"

উ। আমি সন্তুষ্টির সহিত চট্টগ্রাম যাইব।

প্র। কেন?

উ। চট্টগ্রাম আমার বাড়ী। আমি বড় বিপদস্থ। আমি পিতৃ-হীন হইয়া অবধি বাড়ী যাই নাই। আমার অনাথিনী মাতাকে দেখিতে আমার প্রাণ বড় আকুল।

তিনি আবার এক বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন—"অভাগ্য বালক! তবে তুমি বড় নিরাশ হইবে। যাহা হউক ডেম্পিয়ার সাহেব তোমাদের সঙ্গে দেখা করিবেন না। তোমরা চলিয়া যাও। কাল গেজেটে সকলই দেখিতে পাইবে।"

তিনি গিয়া তাঁহার বঘিতে উঠিলেন। আমরা তাঁহার কঠোর ভাব দেখিয়া ভয়ে গাড়িতে গিয়া উঠিতেছিলাম, তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি কাছে গেলে বলিলেন—"তুমি পাশ হইয়াছ।"

আমি। তাহা ত কে. এম. বানার্জ্জি বলিয়াছেন।

প্র। তবে তুমি আর কি জানিতে চাহ?

উ। আমি প্রথম ৯ জনের মধ্যে হইয়াছি কি না?

প্র। প্রথম ৯ জনের অর্থ কি?

উ। প্রথম ৯ জনের এখনই কর্ম্ম পাইবার কথা।

তিনি। আমি যতদূর জানি ৯ জনের বেশী এখনই নিযুক্ত হইবে। তুমি এখনই কর্ম্ম পাইবে। কিন্তু (ঈষৎ হাসিয়া) কোথায় যাইতে হইবে তাহা আমি বলিতেছি না।

আমি। আমার বন্ধু? তিনি পাশ হইয়াছেন ও এখনই কর্ম্ম পাইবেন, কি না?

তিনি। তাঁহার নাম কি?

আ। যাদবচন্দ্র গোস্বামী।

তিনি। তিনি পাশ হইয়াছেন আমার স্মরণ হয়। কিন্তু তিনি এখনই কর্ম্ম পাইবেন কি না বলিতে পারি না। (তার পর আবার চক্ষু ঘুরাইয়া কঠোর ভাবে বলিলেন)—"দেখ তুমি যদি ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা কর তবে তোমার ঘোরতর অমঙ্গল হইবে।"

তিনি গাড়ী খুলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু শেষ ধমকে আমার কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইল। যাদব তখন পাশে আসিয়া বলিল—"চল আর গণ্ডগোল করিয়া কাষ নাই, পাশ ত হইয়াছি। আমি চাকরি যখনই পাই, তুমি যে এখনই পাইবে তাহা নিশ্চয়। আর আমার বোধ হইতেছে এ ব্যাটা তোমাকে তাহার ডিভিসনে রাখিয়াছে। তোমার উপর তাহার চোক পড়িয়াছে।" কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এরূপ বলিয়াছিলেন। অতএব আমি নির্ভয়ে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—আকাশপটে যেন আমার পিতৃদেব অধিষ্ঠিত হইয়া আমার দিকে সুপ্রসন্ন মুখে চাহিয়া রহিয়াছেন—অন্যমনে যাদবের আনন্দোচ্ছ্বাসে যোগ দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। হৃদয়ে, কি এক অবর্ণনীয় আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে, কি এক গাম্ভীর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছিল। কেবল মনে হইতেছিল—"আজ আমার প্রেমময় পিতা কোথায়? আজ বিদ্যুৎ এ আনন্দ সংবাদ বহিয়া লইয়া যখন তাঁহার হস্তে দিত তখন তিনি কত আনন্দমিশ্রিত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন! এক দিন পিতার হৃদয়ে এ আনন্দ সঞ্চারিত করিব, একদিন তাঁহার চিন্তার মেঘের মধ্যে এ আনন্দ-তড়িৎ সঞ্চারিত করিতে পারিব, বলিয়াই কলিকাতা সহরে এত কষ্ট অম্লানমুখে সহিয়া পড়িতেছিলাম। বাবা আমার! তুমি যে আশালতা রোপণ করিয়াছ বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিতে, আজ তাহাতে তোমার বাঞ্ছিত ফল ফলিল, আর তুমি সে

ফল দেখিলে না। সে ফল তোমার চরণে নিবেদিত হইল না।" গৃহে ফিরিয়া আমার ভ্রাতৃপ্রতিম প্রিয়তম বন্ধু তিনটির গলায় পড়িয়া অবারিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। তাহারা আমার অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া কত সান্ত্বনার কথা বলিল। হীনবংশীয় সহপাঠী দুটি এত দিন আমার চোকে কখনও অশ্রু দেখেন নাই। আমার মুখে একটি দুঃখের কথাও শুনেন নাই। আজ এ আকাশ-কুসুমবৎ উচ্চ পদ পাইয়া আনন্দে অধীর না হইয়া, অহঙ্কারে পৃথিবী কম্পিত না করিয়া, কাঁদিতেছি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। এ রোদনের মধ্যে যে কি স্বর্গের আনন্দ, কি পবিত্রতা আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিবেন সাধ্য নাই। উচ্চ শিক্ষায়ও ধমনীর রক্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আজ তাঁহাদের ঘোর দুর্দ্দিন। ভগবানই জানেন এ কৃপাপাত্র দ্বয় সে দিন কি মর্ম্ম-পীড়াই পাইয়াছিল।

হৃদয়-বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে আমি আহার করিতে গিয়া দেখিলাম নীচের ঘর ও প্রাঙ্গণ পাড়ার বৃদ্ধা ও মধ্যম বয়স্কা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। আমি পাড়ায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম; অনেক বাড়ী যাইতাম। পাড়ার আবালবৃদ্ধ সকলেই আমাকে চিনিত ও আদর করিত। কারণ বাসার আর কেহ কখনও "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি।" পটুয়াটোলার বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি মধ্যে মধ্যে বাঁশি শিখিতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার শিশু পুত্রটি আমাকে এত ভালবাসিত যে আমার গলার কি শিসের শব্দ শুনিলে সে তাহার মাতার কাছে হইতেও ছুটিয়া আসিত। আমি যতক্ষণ বাসায় থাকিতাম সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আমি খাইতে বসিলে, রমণীরা সকলে আমাকে ঘেরিয়া বসিয়া আমার কত প্রশংসা করিতে লাগিল, কত আদরের কথা বলিতে লাগিল। আর সেই পাচিকা ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী, যিনি আমার জন্য

লুকাইয়া মাছ তরকারি ইত্যাদি রাখিতেন, আজ তাঁহার হাত নাড়া দেখে কে ? তিনি যে গর্ব্বে পরিবেশন করিতেছেন মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না। আমি মনের আবেগে কিছুই খাইতে পারিতেছি না। রমণী মহলের একজন মনস্তত্ত্ববিদ বলিলেন—"দেখেছিস্ না ! ছেলের এখনই কেমন লক্ষ্মীশ্রী হয়েছে, কিছু খেতে পাচ্ছে না !" একটি অজাত-শ্মশ্রু বাঙ্গালদেশী কাঙ্গাল ছেলে কাল যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে-ছিল, আজ একটা দিগ্‌গজ হাকিম হইয়া গেল—তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যাহারা অনভিজ্ঞা, ততোধিক অল্পবয়স্কা ও সরলা, পরিণত বয়স্কা চতুরা মুখরারা তাহাদিগকে 'হাকিম' পদার্থ টা কি বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

আহারের পর একবার বেঙ্গল আফিসে গেলাম। সেখানেও আমি একটা 'কেষ্ট বিষ্ণুতে' পরিণত হইলাম। ইয়ারগোছের কেরানিরা বলিতে লাগিলেন—"বাবা ! বাঙ্গাল কম পাত্র নয় ! 'ডায়ারিষ্ট' হইতে একেবারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট !" জোন্স সাহেবের বড় আনন্দ। হেড এসিস্‌টেণ্ট বাবুও খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—"তুমি সন্ধ্যার সময়ে আমার বাসায় আসিও। তখন গেজেটের প্রুফ দেখিতে পাইবে, সকল কথা জানিতে পারিবে।"

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অপরাহ্নে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি ও রাজকৃষ্ণ বাবু আনন্দে অধীর হইলেন। বলিলেন—"আমরা ব্রাহ্মণ দুটিকে খুব পেট ভরিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে হইবে।" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—"আমিই আপনাদের। আপ-নাদের চরণছায়া ধরিয়া এই বিপদসাগরে কূল পাইলাম। আমাকে চিরদিন চরণে স্থান দিবেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তীব্র তেজপূর্ণ নেত্রযুগল অশ্রুতে ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আমি

অনেককে বড় বড় চাকরি লইয়া দিয়াছি, কিন্তু এমন আনন্দ কখনও অনুভব করি নাই। কারণ তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া সুপারিস করিয়াছি, আর চাকরি পাইয়াছে। তোমার জন্য আমি ত কিছুই করি নাই। তুমি আপন উদ্যোগে যে এরূপ একটা উচ্চপদ লাভ করিলে, ইহাতেই আমার এত সুখ। আমি জানিতাম তোমাকে বনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেও তুমি আপন উদ্যোগে সেখানেও একটা দাঁড়াইবার স্থান করিতে পারিবে।" সেখান হইতে সন্ধ্যার সময়ে হেড এসিষ্টেণ্ট বাবুর বাসায় গেলাম। তিনি গেজেটের প্রুফ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"তুমি প্রেসিডেন্সি ডিভিসনে নিয়োজিত হইয়াছ।" আমি বসিয়া পড়িলাম। বড় নিরাশা প্রকাশ করিয়া বলিলাম আমাকে চট্টগ্রামে দিলে ভাল হইত। আমার একবার বাড়ী যাওয়া বড় দরকার। আমার মাকে একবার দেখা না দিলে তিনি কিছুতেই শান্ত হইবেন না। তিনি বলিলেন—"তুমি পাগল। আমার ভাগিনাকে প্রেসিডেন্সি বিভাগে রাখিতে আমি কত যত্ন করিলাম। কিন্তু চ্যাপমেন সাহেব তোমাকে কি যে পাইয়া বসিয়াছে, সে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও লইবে না। সে নিজে দরবার করিয়া তোমাকে বাছিয়া লইয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে আসিতে লোক কত চেষ্টা করে, আর তুমি তাহা পাইয়াও অসন্তুষ্ট। তুমি ত আশ্চর্য্য ছেলে।" তাহা ঠিক। কলিকাতা অঞ্চলবাসীদের পক্ষে প্রেসিডেন্সি বিভাগ বৈকুণ্ঠ। আমার কিন্তু ৩৬ বৎসর চাকরির পরও সেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কখনও মনে উদয় হয় নাই। আমার চক্ষে এখনও আমার সরিৎ-সাগর-শৈলাম্বরা মাতৃভূমিই একমাত্র বাঞ্ছনীয় স্থান। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে ফিরিয়া গিয়া এ সংবাদ দিলাম। তিনিও বলিলেন প্রেসিডেন্সি পাইয়াছ ভালই হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"আর কি এখন গেজেট বগলে করিয়া বাড়ী

যাও। দেখিবে এখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই আবার সদয় হইয়াছেন। সংসার এমনই!" শেষে পরামর্শ স্থির হইল কার্য্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাড়ী গিয়া বিবাহ-যোগ্যা ভগিনীটির বিবাহ দিতে হইবে। তিনি বলিলেন—"তুমি কাল চ্যাপমেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া এক মাসের ছুটী চাও। যদি কিছু গণ্ডগোল করেন, আমি নিজে গিয়া তাঁহাকে ও ডেম্পিয়ার সাহেবকে বলিব।"

আমি তাহাই করিলাম। চ্যাপমেন সাহেব আমাকে বড় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"তুমি কাল বলিতেছিলে তুমি বড় বিপদগ্রস্ত। বাড়ী যাওয়া বড় প্রয়োজন। তোমার কি বিপদ? তুমি কিরূপে চট্টগ্রামের বালক হইয়া এ পরীক্ষার নিয়োগ পত্র পাইলে?" আমি বলিলাম—"সে বড় দীর্ঘ কথা। শুনিতে আপনি ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন।" তিনি বলিলেন তিনি তাহা শুনিবেন। তখন আমি তাঁহাকে আমার সৌভাগ্য-সীতা উদ্ধারের জন্য বিপদসাগরের সেতুবন্ধন কাহিনী আদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনি গম্ভীর ভাবে নিবিষ্টমনে তাহা প্রায় এক ঘণ্টা কাল শুনিলেন। আমার কাহিনী শেষ হইলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তুমি একটি আশ্চর্য্য বালক। একটি বাঙ্গালি বালকের হৃদয়ে এরূপ সৎসাহস ও অদম্য উৎসাহ আছে আমি জানিতাম না। যাহা হউক তোমার সকল বিপদ এখন কাটিয়া গিয়াছে। তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও। তুমি যে উচ্চপদে জীবন আরম্ভ করিলে, তাহা একজন ইংরাজ পাইলেও অহঙ্কারী হইবে। তোমাকে যশোহর যাইতে হইবে। তুমি কাল ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও। তোমাকে একমাস ছুটী দিতে আমি বলিব। তুমি ছুটী পাইবে।"

পরদিন তদনুসারে ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার সুন্দর সুশীতল হাসি হাসিয়া বলিলেন

—"কেমন বালক ! আমি বলিয়াছিলাম না যে তুদিনের জন্য একটা ক্ষুদ্র চাকরি গ্রহণ করিও না ? তোমার সেই সাধের চাকরি এখন কি করিবে ?"

আমি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন।

তিনি। তাহা এস্তেফা দেও। চ্যাপমেন বলিতেছেন তুমি একমাস ছুটী চাও। আমি ছুটী দিলাম। কিন্তু যত শীঘ্র পার আসিও, কারণ যশোহরে কর্ম্মচারীর বড় অভাব। তোমার বড় গুরুতর প্রয়োজন বলিয়াই ছুটী দিলাম, নতুবা দিতাম না। (আমি ধন্যবাদ দিয়া আসিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন) "তোমার বেঙ্গল আফিসে চাকরি কত দিন হইয়াছে ?"

উত্তর। সাত দিন।

"তাহার বেতন চাই ?"—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ? আমি অধোমুখে রহিলাম। বলিলেন—"রাজেন্দ্র হইতে লইয়া যাইও।"

মধ্যাহ্নে আমার অদৃষ্ট-দেবতা আশ্রয়দাতা ষ্টান্সফিল্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার আনন্দের ও আদরের কথা আর কি কহিব ? গায়ের কাছে ডাকিয়া লইয়া কত ঠাট্টা, কত তামাসা করিলেন। আসিবার সময়ে বলিলেন—"তোমার দুঃখিনী মাকে আমার সাদর সম্ভাষণ বলিও।" হায় ! হায় ! ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজপুরুষদের এই দেবভাব কোথায় গেল ? দশ বৎসর পর তিনি আবার যখন প্রাইভেট সেক্রেটারি হন, আমি সাক্ষাৎ করিতে যাই। দেখিলাম আর সে ভাব নাই। আমার প্রতি আর সেই সহৃদয়তা নাই।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিদায় হইয়া আসিতে গেলাম। সে রাত্রির ষ্টিমারে বাড়ী যাইব। তিনি বাসায় ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি রুমালে বাঁধা

দুই শত টাকা আমাকে দিয়া বলিলেন—"আমি আর টাকার যোগাড় করিতে পারিলাম না। এ টাকাটা তোমার বড় দরকার বলিয়া কর্জ্জ করিয়া আনিলাম। তুমি বাড়ী গিয়া ভগিনীর বিবাহ দিবে, খরচের জন্য যদি আরও টাকার প্রয়োজন বুঝ, তবে আমাকে টেলিগ্রাফ করিও, আমি টাকা পাঠাইব।" ইনি কি মানুষ? এই দয়া, এই নিঃস্বার্থ দানশীলতা কি, মানবের? আমার কণ্ঠে একটি কথা সরিল না। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে কত উপদেশ দিলেন, কত রূপ সান্ত্বনার কথা বলিলেন। আমি গলদশ্রুনয়নে সেই গোধূলি গাম্ভীর্য্যে তাঁহার পদ-ধূলি লইয়া বাড়ী চলিলাম,—সংসারে প্রবেশ করিলাম।

ঈশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়,—শিব।

তাঁহার সৃষ্টিতে এত দুঃখ, এত দরিদ্রতা, এত বিপদ কেন? ইহা ভাবিয়া বড় বড় দার্শনিকগণও তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন হইয়াছেন। কেহ কেহ এতদূর বলিয়াছেন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি ঘোরতর নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, এবং ন্যায়পরায়ণতাহীন। হায়! হায়! মানুষ বুঝে না সোণা পোড়াইলে আরও নির্ম্মল হয়। পোড়ানই কেবল নির্ম্মল করিবার উপায়। মানুষে বুঝে না যে তদ্রূপ দুঃখও মানুষকে নির্ম্মল ও পবিত্র করে,—মানুষকে মানুষ করে। আমি দুঃখে না পড়িলে এই দেবতুল্য আদর্শ সকল দেখিতাম না। মানবের মহত্ত্ব কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, বুঝিতে পারিতাম না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, এবং আত্মজীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এই ঘোরতর বিপদের ফল। আজ বুঝিতে পারিতেছি আমার সেই বিপদের গর্ভে আমার কি মঙ্গল নিহিত ছিল,—সে অগ্নি পরীক্ষার দ্বারা ভগবান আমার কি উন্নতি, কি মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। আমি আজ যাহা,

সেই বিপদ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি আজ যাহা, সেই বিপদে না পড়িলে তাহা হইতাম না। আজ সেই বিপদের আলোচনা করিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘন ঘোর ঘটামণ্ডিত মুখছবি দেখিতে, মনে কি আনন্দ, কি গৌরব, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হইতেছে! তদ্ভিন্ন যে কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, সুখ কি তাহা সে বুঝিতে পারে না। সুখ দুঃখ কিছু নিত্য সনাতন পদার্থ নহে। আমি যে কুটীরে বাস করিয়া আপনাকে সুখী মনে করি, একজন কমলার বরপুত্র তাহাতে বাস করা ঘোরতর দুঃখ মনে করিবে। সুখ দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র। মানুষের অবস্থা ভেদে, প্রকৃতি ভেদে ইহার অনন্ত তারতম্য। স্তরের পর অনন্ত স্তর, সোপানের পর অনন্ত সোপান আছে। যে দুঃখ ভোগ করে নাই, সে সুখের পাশব ভাব ভিন্ন, তাহার উচ্চ মহান্ ভাব বুঝিতে পারে না। ভগবান সচ্চিদানন্দ. তিনি সর্ব্ব আনন্দের আধার। মানুষ যত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে ততই মানুষ হইবে, সুখী হইবে। সুখের দ্বিতীয় পথ নাই। মানুষ দুঃখে না পড়িলে তাঁহার দিকে চাহে, না। তাঁহার বিপদভঞ্জন মুখ কি মধুর!

"বিপদস্তভাঃ সর্ব্বা যত্র তত্র জগদে গুরো।
ভবতো দর্শনং যত্র ন পুনর্ভব দর্শনং।"

মহাভারত।

পতিতা।

"যেই জন পুণ্যবান, কে না তারে বাসে ভাল ?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ?
পাপীকে যে ভাল বাসে, আমি ভাল বাসি তারে ;
সেই জন দেবতা আমার।"

কুরুক্ষেত্র।

যাহারা পাপের নাম শুনিয়া, পাপীর নাম শুনিয়া, শতহস্ত দূরে যান, ঘৃণায় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে মহাশয় ব্যক্তি হইতে পারেন, মহাপুণ্যবান বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, এবং হইয়াও থাকেন, কিন্তু তাঁহারা আমার পূজনীয় নহেন। যাঁহারা পাপের মধ্যে থাকিয়া, পাপীকে প্রীতিপূর্ব্বক বুকে লইয়া, পাপকে পবিত্র করেন, পাপীর উদ্ধার সাধন করেন, সেই প্রেমাবতার আমার দেবতা। পঙ্কে পদ্ম থাকে, পাপেও পুণ্য থাকে। পঙ্কে উজ্জ্বল আলোক জন্মে, পাপীর হৃদয়েও পবিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোরতর পাপের মধ্যে আমি এই সময়ে একটি অতি পবিত্র ও হৃদয়গ্রাহী পবিত্রতার ছবি দেখিয়াছিলাম। সেই ছবিটি এখানে আঁকিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের জনৈক সহপাঠী অন্যত্র ফাষ্ট আর্ট দিয়া ও প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি লইয়া, কলিকাতায় আসিলেন এবং আমাদের সহবাসী ও সহপাঠী হইলেন। তাঁহাকে বাল্যাবস্থায় আমরা বড় দরিদ্র বলিয়া জানিতাম। তাঁহার পিতা অন্ধ হইয়াছিলেন, এবং উচ্চপদস্থ সাহেব দিগের আনুকূল্যে তাঁহাকে চট্টগ্রাম স্কুলে পড়াইতেন। তাঁহা একখানি মার্কিনের ধুতি ও চাদর মাত্র তখনকার পরিচ্ছদ। তাহা কালিতে চিত্রিত থাকিত। তিনি স্বভাবতঃই বড় 'নোঙ্গরা' ছিলেন কিন্তু কলিকাতায় আসিলে দেখিলাম তিনি একটি ঘোরতর 'বা

হইয়াছেন। তাঁহার এখন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ। তিনি এখন একটি নিয়মিত মদ্যপায়ী। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক সহপাঠী 'ইয়ার' আসিয়াছেন। উভয়েই সন্ধ্যার সময়ে একত্র বহির্গত হইয়া যান, এবং রাত্রি কিছুক্ষণ হইলে, বিকৃত অবস্থায় কখন বা একা বাসায় ফিরিয়া আইসেন, কখন বা তাঁহার সেই 'ইয়ারটি' তাঁহাকে রাখিয়া যান। তখন তাঁহার কোঁচা ও কাছা প্রায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকিত; চাদরখানি প্রায়ই হারাইয়া যাইত। বাসায় আসিয়া কোন দিন বা কাহারও সঙ্গে কিঞ্চিৎ সদালাপ করিতেন, প্রায়ই পড়িয়া নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে, কি রাত্রি জাগিয়া পড়া প্রায়ই তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। অতি প্রভাতে উঠিয়া পুস্তক বগলে করিয়া ছুটিয়া নীচের ঘরে যাইতেন, এবং সেইখানে অপূর্ব্ব আসন করিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে রেলগাড়ীর বেগে পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এত দ্রুত পড়িতেন যে তিনি কোন্ ভাষায় কি পড়িতেছেন কাহারও বুঝিবার সাধ্য হইত না। তথাপি স্মরণশক্তি এমনই প্রখরা ছিল যে যাহা একবার পড়িতেন বা শুনিতেন তাহা মুখস্থ হইত। কেবল স্মরণশক্তির বলে তিনি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিতেন। আমি তাঁহাকে এক দিন একটি কঠিন "কনিক সেকশনের" অঙ্ক বুঝাইয়া দিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"অঙ্ক বুঝা তোমার আমার কর্ম্ম নহে; সে চন্দ্রকুমারের কায। আমি কেবল মুখস্থ করিয়া থাকি। তুমিও তাই কর গে।" এখন শুনিতে পাইলাম যে তাঁহার পিতার বেশ টাকা আছে। অতএব তিনি বাবুয়ানা করিবার জন্য তাঁহার বৃত্তি ছাড়া বাড়ী হইতেও বেশ দশ টাকা পাইতেছেন। কিন্তু তিনি কুক্ষণে অন্যত্র কলেজে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে যে মদ্যপান শিখিয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। মাতৃভূমি এমন একটি রত্ন হারাইয়াছেন।

আমি বলিয়াছি, আমি অতি কষ্টে বি. এ. পড়িতেছিলাম। আমি পাঠ্যপুস্তকগুলি পর্য্যন্ত কিনিতে পারিয়াছিলাম না। ইহার, ও অধিকাংশ চন্দ্রকুমারের, বহি চাঁহিয়া পড়িতাম। তাঁহার এই আনুগত্য নিবন্ধন তিনি আমাকে এক দিন নিভৃতে লইয়া বলেন—"নবীন! তুমি যে ছেলেবেলা তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ, এবং সুরাপানে তোমার আপত্তি নাই, তাহা আমি জানি। তুমি সময়ে সময়ে আমার সঙ্গে গিয়া যদি একটুকু মদ খাও আমি বড় সুখী হইব। তাহাতে তোমার চিন্তাবসন্ন মনে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হইবে, এবং শরীরও ভাল হইবে। দেখ আমি তোমার চাইতে কত মোটা হইয়াছি। আর আমার বিশেষ উপকার এই হইবে যে আমার চাদর ও টাকা হারাইয়া যাইবে না। ইহাতে আমি বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি।" আমি তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুরাপান হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক কথা বলিলাম। তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অহো! তুমি প্যারীচরণী বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে যে! তুমি সঙ্গে যাইবে কি না বল।" আমি বলিলাম আমি গেলে আর ফল কি হইবে? তাঁহার সেই ইয়ারও ত সঙ্গে থাকে। তিনি বলিলেন সে বড় মাতাল। তিনি আর তাহাকে সঙ্গে লইবেন না। আমি বলিলাম যদি আমিও মাতাল হই। তিনি বলিলেন আমি মাতাল হইবার ছেলে নহি। তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করিলে আমি বলিলাম বিবেচনা করিয়া পরে বলিব। আমি চন্দ্রকুমারকে এ কথা বলিলাম। চন্দ্রকুমার একেবারে শিহরিয়া উঠিল, এবং ঘোরতর অমত প্রকাশ করিল। আমি তখন বলিলাম যদি চটিয়া আমাকে তাহার বহি না দেয়, তবে পড়িব কি প্রকারে। দুজনের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া চন্দ্রকুমার বলিল,—"তবে যাও। কিন্তু বড় সাবধান।" সন্ধ্যার সময়ে আমার উক্ত

সহপাঠী আসিয়া অনুনয় করিলে আমি যাইতে সম্মত হইলাম। তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। দুজনে চলিলাম। পথে 'ইয়ার' মহাশয় সঙ্গে জুটিলেন। তাঁহারা আমাকে বউবাজারের মোড়ের এক শৌণ্ডিকালয়ে লইয়া গেলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! শৌণ্ডিকরাজ এক আকণ্ঠ উচ্চ দীর্ঘ কাষ্ঠ-তক্তপোষের উপর অঙ্গদের মত সিংহাসনস্থ। সম্মুখে সারি সারি বোতলে নানা মূর্ত্তিতে "মা ভবানী" বিরাজ করিতেছেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে পতিতপাবনীকে বিকাইতেছেন। বৃহৎ সেঁৎসেঁতে কক্ষটির এক দিকে একখানি অর্দ্ধভগ্ন বেঞ্চ। তাহাতে কেহ কেহ বিচিত্র বেশে নির্ব্বাণের বিভিন্ন অবস্থা লাভ করিয়া কক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কক্ষের স্থানে স্থানে কেহ পান করিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ ঝগড়া করিতেছে, কেহ ঘুসাঘুসি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেহ পতিতপাবনীর কৃপায় নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। অন্য বিভৎস দৃশ্য সকল পবিত্র ভাষায় অবর্ণনীয়। বন্ধুদ্বয় অর্দ্ধ বোতল নিকৃষ্ট ব্রাণ্ডি রূপ বিষ কিনিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গেলেন। তাহার বাষ্পে আমার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইয়ার মহাশয় গিয়া সিদ্ধ জবাকুসুমসঙ্কাশ হংসডিম্ব ও অন্যরূপ 'চাট' কিনিয়া আনিলেন। আমি নাম মাত্র সে পানীয় ও আহারীয় কষ্টে গলাধঃকরণ করিলাম। তাঁহারা পরম প্রীতিসহকারে পান ও ভোজন শেষ করিয়া আনন্দে প্রকৃত প্রস্তাবে 'অধীর' হইলেন। ইয়ার মহাশয় টল টল অবস্থায় স্বধামে গমন করিলেন। আমি আমার সহবাসীকে লইয়া আসিলাম। তিনি নাসিকা ধ্বনি করিয়া রাত্রি কাটাইলেন। পর দিন আমি আর এরূপ স্থানে যাইব না বলিয়া তাঁহার কাছে কবুল জবাব দিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি আমাকে এক দিন বলিলেন যে, ঐরূপ স্থানে আমি যাইতে অস্বীকৃত বলিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের একটি বন্ধুর

বাসায় আড্ডা করিয়াছেন। আমাকে সেখানে যাইতে বড় অনুনয় করিলে আমি এক দিন চন্দ্রকুমারের অনুমতি লইয়া চলিলাম। কারণ সহবাসী মহাশয় ইতিমধ্যেই তাঁহার পাঠ্য-পুস্তক আমাকে বড় একটা ব্যবহার করিতে দিতেছিলেন না। সেই শৌণ্ডিকালয় হইতে এক বোতল মদ লইয়া, হাড়কাটার গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এ আর এক দৃশ্য! একটি চক মিলান একতালা বাড়ী। এখানে সেখানে স্ত্রীলোক দেখা যাইতেছে। ইহাদিগকে ত কলিকাতার খ্যাতনামা ঝি বলিয়া বোধ হইতেছে না। পুরুষ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহারাও ত ছাত্র বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাহার উপর কোনও কক্ষে সঙ্গীতের ধ্বনি বামাকণ্ঠসহ শুনা যাইতেছে। কোনও কক্ষে রমণীর উচ্চ হাসি, কোনও কক্ষে সুরাজড়িত কণ্ঠে রমণীর ও পুরুষের কদর্য্য রসিকতা শুনা যাইতেছে। আমি ভাবিলাম এ কিরূপ ছাত্র-নিবাস! কিন্তু ভাবিবার সময় বড় পাইলাম না। সহপাঠীদ্বয় আমাকে এক কক্ষে লইয়া দাখিল করিলেন। সেখানে অর্দ্ধ-বাঙ্গালি অর্দ্ধ-উড়ে আকৃতির একটি ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া যুবতী! অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্রের ন্যায় আমার হৃদয়ে তখন স্থানটি যে কি, সে সন্দেহ প্রবেশ করিল। হৃদয় বিষাদে ডুবিল। পাপের প্রথম সংস্পর্শে তাহাতে দারুণ ব্যথা সঞ্চারিত হইল। আমি যেন আমার হৃদয়ের প্রকম্পন শুনিতে পাইতেছিলাম। বুক যেন ধরাস্ ধরাস্ করিতেছিল। আমি কিছু খাইতে চাহিলাম না। তাঁহারা জোর করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ পান করাইলেন। আমি উঠিয়া যাইতে বারম্বার চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা জোর করিয়া বসাইয়া রাখিলেন। তাঁহাদের ইঙ্গিত মতে রমণী আমার অঙ্কে আসিয়া বসিয়া আমার সঙ্গে রসিকতা করিতে আরম্ভ করিল। আমি যেন ঠিক ফাঁসি-কাষ্ঠের মঞ্চে অবস্থিত।

যে জিহ্বার চোটে লোক অস্থির হইত, আমার সেই জিহ্বা শিলাবৎ স্থির। মুখে কথাটি নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াও কথা কহিতে পারিতেছি না। সহপাঠীরা আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রমণীকে বলিলেন,—আমি একজন কবি, সুরসিক ও সুগায়ক। সে তাহা বিশ্বাস করিল, এবং গান করিতে ও কথা কহিতে জিদ করিতে লাগিল। পানীয় ও আহার্য্য মুখের কাছে লইয়া সাধাসাধি করিতে লাগিল। অবশেষে আমি না গাইতেছি, না খাইতেছি, না কথা কহিতেছি, দেখিয়া বিষম চটিল। আমার অঙ্ক হইতে উঠিয়া গিয়া আমার উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। বলিল,—"ও ছি! তুমি এমন নবাব-পুত্র আসিয়াছ যে আমি মেয়ে মানুষ এত সাধাসাধি করিলাম, তুমি একটা কথা পর্য্যন্ত কহিলে না।" বন্ধুদ্বয়ও তখন বিরক্ত হইয়া আমাকে লইয়া উঠিয়া আসিলেন, এবং পথে আমার অবস্থা দেখিয়া অনেক ঠাট্টা করিলেন। কিন্তু আমি কিছুই বড় বুঝিতেছিলাম না, বড় বলিতেছিলাম না। আমার হৃদয়ে যেন কি এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আমি যেন কি এক জড় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাসায় পঁহুছিয়া চন্দ্রকুমারকে এ সংবাদ দিলাম। চন্দ্রকুমার মহা চটিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি আর আমাকে কখনও সেই সহবাসীর সঙ্গে যাইতে দিবেন না।

তাহার পর আমার পিতৃ-বিয়োগে ও ঘোরতর বিপদে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বি, এ, পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু আমার পাশ হইবার আশা মাত্র নাই। তথাপি ফলের প্রতীক্ষায় শঙ্কিতহৃদয়ে দিন কাটাইতেছি। এক দিন দ্বিপ্রহর সময়ে হঠাৎ কলেজ হইতে সেই সহপাঠী আসিয়া বলিলেন আমরা তিন জনেই পাশ হইয়াছি, এবং তিনি ও চন্দ্রকুমার অতি উচ্চস্থান পাইয়াছেন। সেই দিন চট্টগ্রামের কি

গৌরবের দিন। এমন দিন, শিক্ষা বিষয়ে এমন গৌরব, বুঝি জননীর আর হইবে না। আমার হৃদয়ের দাবাগ্নিতে যেন অমৃতধারা বর্ষিত হইল। গভীর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এত দিন পরে একটি আলোকের রেখা দেখা দিল। ঝটিকার মধ্যে যেন ঈষৎ শান্তির চিহ্ন দেখা দিল; সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেন একটি তৃণ পাইল। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর এই প্রথম আনন্দ অনুভব করিলাম। বাসা আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। এ আনন্দের মধ্যে সেই সহপাঠী বলিলেন,—"এখন তোমার ত সকল বিপদ কাটিয়া গেল। আজ চল একটু আমোদ করিয়া আসি।" এ আনন্দোৎসাহে আমি আত্মহারা হইয়া সম্মত হইলাম। চন্দ্রকুমারও বিপদাবসন্ন হৃদয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাইব বলিয়া বোধ হয় বড় আপত্তি করিলেন না। কেবল বলিলেন—"শীঘ্র ফিরিয়া আসিও।"

সহপাঠীর ইয়ারও পাশ হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াও জুটিলেন। আমি পূর্ব্ববর্ণিত স্থানে যাইতে অসম্মত হইলে, অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছিলেন বলিয়া অন্য এক পথে আমাকে আবার সেই স্থানে লইয়া গেলেন। বেলা তখন প্রায় ২টা। দিবালোকে সেই নরকপুরী আরও ঘৃণিত দেখাইতেছিল। একটা বারাণ্ডায় বসিয়া পান-কার্য্য আরম্ভ হইল। বন্ধুযুগল দুইটি জীবন্ত নন্দী ভৃঙ্গি। তাঁহাদের আকৃতি যাদৃশ, প্রকৃতিও তাদৃশ, রসিকতা ও সমাজিকতাও তদ্রূপানুরূপ। মদিরায় দুইটি রমণী অধীরা হইয়া আমাকে বড় জ্বালাতন করিতে লাগিল। তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। লজ্জার কথা দূরে থাকুক, তাহাদের বাহ্যজ্ঞানও ক্রমে তিরোহিত হইতে চলিল। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। এ দিকে রমণী দুটির এ ভাব। অন্য দিকে তাঁহাদিগকে রমণীরা তুচ্ছ করিতেছে বলিয়া বন্ধুরা আমার উপর মদিরা প্রভাবে হাড়ে হাড়ে চটিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ-উড়েণীটী কাঁদিতে লাগিল, এবং

তাঁহার কক্ষে তাহাকে রাখিয়া আসিতে বলিল। এই সমস্যার এটিই উত্তম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া আমি তাহাকে তাহার কক্ষে লইয়া গেলাম। সেখানে সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আসিয়া সহবাসীকে তাহার কাছে পাঠাইলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"চল!" সে তখন বড় কাতর স্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি কক্ষ-দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলাম সে নিতান্ত জঘন্য অবস্থায় শয্যায় গড়াগড়ি দিতেছে, এবং করুণ কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কি বলিতেছে। বেলা অপরাহ্ণ। প্রখর রৌদ্র তাপ। তাহার উপর বিষাধিক নিকৃষ্ট মদিরা, ও অতিরিক্ত পান। আমার বোধ হইল তাহার সন্ন্যাস-রোগ হইবে। সেও কেবল আমার নাম করিয়া—"আমি মরিতেছে, মরিতেছি" করিতেছে। আমার ভয় হইল বুঝি সে যথার্থই মরিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ছুটিয়া তাহার কাছে গেলাম। সে ভয়ানক বমন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিছানা ও কক্ষ নরক হইয়া গেল। কিন্তু আমার মনে ঘৃণার উদয় না হইয়া কি এক অপূর্ব্ব দয়া সঞ্চারিত হইল। আমি আত্মহারা হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে বন্ধুযুগল আসিয়া বাহির হইতে আমাকে আবার বলিলেন,—"সন্ধ্যা হইতেছে, তুমি যাইবে না? চল।" আমি বলিলাম—"তোমরা মানুষ, না পশু! ইহাকে তোমরা এতদিন ভালবাসিয়া এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া কি প্রকারে চলিয়া যাইবে?" সহবাসী বলিলেন—"সকল জায়গায় তোমার দর্শন শাস্ত্র। আমরা চলিলাম।" তাঁহারা সত্য সত্যই অম্লান-মুখে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। হতভাগিনী বারম্বার কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"তাহারা বুঝি চলিয়া গিয়াছে। তুমি কোন দেবতা।

আমি মরিলাম।” আমি বারম্বার তাহাকে ঘুমাইতে বলিতে লাগিলাম, এবং বাতাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু কক্ষটি এমনি দুর্গন্ধযুক্ত ‘গ্যাসে’ পূর্ণ হইয়া উঠিল যে আর বসিবার সাধ্য নাই। আমি দেখিয়াছিলাম একটি অতি কুৎসিতা অর্দ্ধপ্রাচীনাকে অভাগিনী মা বলিয়া ডাকিত। আমি কক্ষে কক্ষে তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় ৫টা। কক্ষবাসিনীগণ তখন বেশভূষা করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা আমার উপর অজস্র রসিকতা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেক অন্বেষণের পর একটি ক্ষুদ্র ময়লা কক্ষে সেই স্ত্রীলোককে পাইলাম। তাহাকে বলিলাম—“বাছা! হতভাগিনী মরিতেছে। তুমি একবার আইস।” সে যেন গুলির নেশায় ঝুকিতেছিল। এক বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—“যেমন দিনে বসিয়া মদ খাইয়াছে, তেমনি মরুক! আমি যাইব না। তাহার ইয়ার দুটি কোথায় গেল? তুমি কে? তোমাকে ত কখনও দেখি নাই।” শেষে অনেক অনুনয় করিলে সে আমার সঙ্গে অনিচ্ছাক্রমে কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র খাঁদা নাসিকা অঞ্চলে আবৃত করিয়া সানুনাসিক স্বরে বলিল—“ওমা! আমি এই বমি ফেলিতে পারিব না। মরুক!” আমি বলিলাম—“বাছা! এ ত তোমার মেয়ে। তোমার মনে কি একটুক দয়াও হইতেছে না।” সে তখন আমার উপর মহা চটিয়া বিকৃত ধ্বনি করিয়া বলিল—“আমার কিসের মেয়ে রে? ও মা। আমার আর মরিবার স্থান নাই যে আমার এমন মেয়ে হইবে!” তখন সে গড় গড় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীখানির মত চলিয়া গেল। অভাগিনী আমাকে কাতরস্বরে বলিল—“তুমি কাহাকে কি বলিতেছ? সে কি আমার প্রকৃত মা? আমার কি মা আছে? আমার কি পৃথিবীতে কেহ আছে?” সে কাঁদিতেছিল। আমারও নীরবে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া—আমি সেই দৃষ্টি, সেই কণ্ঠ, এখনও ভুলিতে পারি নাই,—বলিল—"তুমি কি আমাকে ফেলিয়া যাইবে?" আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—"না। তুমি নিদ্রা যাও, আমি বাতাস দিতেছি। তুমি যতক্ষণ ভাল না হইবে আমি কাছে থাকিব।" সে তখন বারম্বার বলিতে লাগিল—"তুমি দেবতা। তুমি কোন জন্মে বুঝি আমার ভাই ছিলে?" আমি দেখিলাম ক্রমে ক্রমে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস যেন অবরুদ্ধ হইতেছে। আমি বড় ভীত হইলাম। সেই পিশাচিনীর কাছে আবার গিয়া বলিলাম—"বাছা! তুমি ঘর পরিষ্কার করিও না। আমি তোমাকে একটি টাকা দিব, তুমি যদি তাহাকে কূয়ার কাছে লইয়া তাহার মাথায় দুই এক কলসী জল ঢালিয়া দেও। নচেৎ সে বাঁচিবে না।" সে আবার, আমি কেন ইহার জন্য এরূপ করিতেছি, বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সম্মত হইল। সহবাসীর একটি টাকা আমার কাছে ছিল। সে টাকাটা আমি তাহাকে দিলাম। সে তখন অভাগিনীকে গালি দিতে দিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু বমনবিজড়িত হইয়া অভাগিনীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল যে এই পেতিনী পর্য্যন্ত তাহাকে পাতকূয়ার কাছে লইতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাহাকে দুহাতে তুলিয়া লইয়া গেলাম। সে তখন সম্পূর্ণ অচেতন। অতি কষ্টে থাকিয়া থাকিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্বাস ফেলিতেছে মাত্র। তাহার মাথায় জল ঢালিতে পিশাচিনীকে বলিলাম। সে বলিল সে পাতকূয়া হইতে জল তুলিয়া মরিতে যাইবে না। আমি বলিলাম—"তুমি তবে ইহাকে ধর।" সে ধরিল। আমি সেই পাতাল প্রদেশ হইতে জল তুলিয়া তাহার মাথায় ঢালিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য এই কার্য্যে আমি এই প্রথম ব্রতী। তথাপি কোথা হইতে আমার বাহুতে এই অপরিমিত বল আসিল বলিতে পারি না। আমি দ্রুতহস্তে কলসীর

পর কলসী জল ঢালিতে লাগিলাম। সে তখন সম্পূর্ণরূপে অচেতন ও বিবসনা। কূয়াটি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে। চারিদিকের কক্ষবাসিনীগণ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

প্রথমা—"এ ছেলেটি কে? ইহাকে ত কখনও দেখি নাই? এ কেন ইহার জন্য এত করিতেছে?"

দ্বিতীয়া—"আহা! কেমন ভাল ছেলেটি! উপপতি হয় ত যেন এমন উপপতি হয়। এ না থাকিলে এ আজ নিশ্চয় মরিত।"

তৃতীয়া—"উপপতি! দেখিতেছিস না ইহার আকারে ব্যবহারে কি সেরূপ লোকের কোনও লক্ষণ আছে? এ ত মানুষ নহে, দেবতা। ইহাকে বাঁচাইবার জন্য যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহার সেই সোণার চাঁদ উপপতি দুজন অক্লেশে চলিয়া গিয়াছে। হায়! হায়! আমাদের এমনই দশা!"

প্রায় বিশ ত্রিশ কলসী জল ঢালিলে সে চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিল। একবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তখন আরও ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক কলসী জল ঢালিয়া, তাহার বসনাগ্র দ্বারা তাহার গা মুছাইয়া দিয়া, আবার তুলিয়া লইয়া তাহার কক্ষে লইয়া গেলাম। সৎকার্য্যও সংক্রামক। আমার এরূপ ব্যবহার দেখিয়াই হউক, কি রজত মুদ্রার মাহাত্ম্যেই হউক, পিশাচিনীর মন দ্রব হইল। সে বিছানার চাদরটি উঠাইয়া লইল, এবং অজস্র গালি দিতে দিতে কক্ষটি পরিষ্কার করিয়া দিল। এ সময়ে অভাগিনী আর একবার চক্ষু মেলিয়া অতি কাতর ও পবিত্র ভাবে আমার দিকে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি মরিব?" আমি বলিলাম—"না। তুমি এখন নিদ্রা যাও। তাহা হইলে বেশ সারিয়া উঠিবে।" তাহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। বলিল—"তুমি আমাকে বাঁচাইলে।

তুমি কোন জন্মে আমার ভাই ছিলে। তুমি কি আমাকে ফেলিয়া যাইবে? তাহা হইলে আমি মরিব। আমাকে এমন করিয়া কে দেখিবে?” আমি বলিলাম—“আমি যে পর্য্যন্ত না দেখিব তুমি বেশ ঘুমাইতেছ, আমি যাইব না। তোমার কোনও ভয় নাই। আমি বাতাস দিতেছি। তুমি ঘুমাও।” সে তখন নয়ন মুদ্রিত করিল। তাহার নিমীলিত নয়ন হইতেও কিছুক্ষণ অশ্রুধারা বহিল। সে নীরব কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয়ে কি আনন্দই উথলিতেছিল। আমি নীরবে পার্শ্বে বসিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া এই হতভাগিনীদের হতভাগ্যের চিন্তা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম—“ভগবান মানুষের কপালে এরূপ দুঃখ লেখেন কেন? মানুষ এরূপ হতভাগিনীদের দয়া না করিয়া ঘৃণা করে কেন? ইহার কথায় বোধ হইতেছে, ইহার মাতাও এইরূপ হতভাগিনী ছিল। অতএব এই পাপ-পথ ইহার ললাট-লিপি। এরূপ অবস্থায় জন্মিয়া কে পুণ্যবতী হইতে পারে? এ পাপ-পথ ভিন্ন ইহার আর এ জগতে গত্যন্তর কি ছিল?” তখন রাত্রি ৮টা। দেখিলাম সে বেশ শান্তভাবে সহজে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সেই দাসীটিকে তাহার কাছে বসিতে বলিয়া আমি নিঃশব্দ পাদক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, চারিদিকের কক্ষে আমার প্রশংসাধ্বনি শুনিতে শুনিতে বাসায় চলিলাম। সেই পাপ-গৃহে সেই সন্ধ্যাকালে এ কথা ভিন্ন যেন অন্য কোন কথা হইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি স্ত্রী পুরুষ আমাকে কক্ষদ্বারে আসিয়া নীরবে দেখিয়া গিয়াছিল। বাসায় সহবাসী মহাশয় গিয়া নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি চন্দ্রকুমারকে বলিয়াছেন যে তিনি আমার কোন খবর রাখেন না। আমি কোথায় চলিয়া গিয়াছি। চন্দ্রকুমার অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে এই পাপ-পুণ্যভরা উপাখ্যান আমি আদ্যোপান্ত বলিলাম। দেখিলাম তাঁহারও চক্ষু

ভিজিয়া উঠিল। তিনি নিদ্রিত সহবাসীর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। যদিও আমার প্রশংসা করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এরূপ লোকের সঙ্গে এরূপ স্থানে যাইতে নিষেধ করিলেন।

তাহার কিছু দিন পরে আমি বিপদ-সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি লাভ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিদায় হইবার জন্য যাইতেছি, সেই সহবাসী বলিলেন, তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহেন। আমার সঙ্গে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া বলিলেন—"তুমি টাকা আনিতে যাইতেছ। আজ আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। সেই 'অভাগী' একটিবার তোমাকে দেখিতে পাগলের মত হইয়াছে। কাল আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিয়াছে, আজ এক মিনিটের জন্য হইলেও তোমাকে যেন একবার লইয়া যাই।" আমি বলিলাম—"সে ঘটনার পর তাহাকে একবার দেখিতে আমারও বড় ইচ্ছা। কিন্তু সময় কই? আজ রাত্রিতে আমাকে ষ্টিমারে উঠিতে হইবে।" তিনি বার বার কাতরতার সহিত জিদ করিয়া এক মিনিটের জন্য হইলেও যাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম যদি চন্দ্রকুমার কোন আপত্তি না করে, তবে বাসায় ফিরিয়া আমি যাইব। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রকুমার বলিলেন হতভাগিনী আমার সঙ্গে এখন কিরূপ ব্যবহার করে তাহা তাঁহারও জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রিতে জাহাজে উঠিতে হইবে অতএব শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন।

যে পাপীকে দয়া না করিয়া ঘৃণা কর, আজ একবার আমার সঙ্গে চল। পাপের অন্ধকারে পুণ্যের কেমন উজ্জ্বল ছবি ফলিতে পারে এক-বার দেখিয়া যাও। একবার দেখিয়া যাও, পাপী কেমন সহৃদয় হইতে

পারে, পাষাণের মধ্যেও কেমন নির্ম্মল সরসী থাকে। একবার শিখিয়া যাও, পাপীর উদ্ধারের উপায় প্রেম,—ঘৃণা নহে। পাপীকে ঘৃণা করা পুণ্য নহে, প্রেম করাই পুণ্য। মানুষকে অনেক সময়ে পাপপথে লইয়া যায় স্বেচ্ছাচারিতায় নহে,—অনিবার্য্য অবস্থায়। আমি অভাগিনীর কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র সে আমার চরণে পড়িয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিল। তাহার আর সেই কদর্য্য ভাব নাই। সেই চঞ্চলতা নাই। তাহার মূর্ত্তিখানি এখন স্থিরা, ধীরা, শান্তভাবাপন্না। সে সলজ্জ ভাবে ভগিনীটির মত আমাকে স্নেহভরে জড়াইয়া আমার কাছে বসিল। যাহার স্পর্শে আমার শরীর প্রথম দর্শনের দিনে অপবিত্রতায় রোমাঞ্চিত হইয়াছিল, আজ যেন পবিত্র হইল। আমিও তাহাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিলাম। সে ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমাকে কত কৃতজ্ঞতার কথা বলিল। আজ সে আমাকে আর পান করিতে বলিতেছিল না। সে উৎকৃষ্ট জলখাবার আমার হাতে তুলিয়া দিতেছিল, কত আদরের সহিত খাইতে বলিতেছিল, আমি পরমানন্দে খাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কক্ষখানি তাহার সহবাসিনীগণের দ্বারা পূর্ণ হইল। তাহাদেরও আজ সে ভাব নাই। তাহারা আমাকে কত ভক্তি করিতে লাগিল, এবং আমার উচ্চপদ লাভে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল, কত আশীর্ব্বাদ করিতেছিল। সকলে বলিল, তাহারা সেই দিনই বুঝিয়াছিল আমি একটি সামান্য বালক নহি। একটি সামান্য বেশ্যার প্রতি কে এমন দয়া দেখাইয়া থাকে? আমি না থাকিলে হতভাগিনীর সেই দিন অপমৃত্যু ঘটিত। কেহ কেহ কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা! তুমি না কি মানুষকে বেত মারিতে পারিবে, মেয়াদ দিতে পারিবে?" যে কক্ষ আমি একদিন নরকের একটি অংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আজ আমার চক্ষে তাহার কি পরিবর্ত্তনই বোধ হইতেছিল! আত্মপ্রসাদে

আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। আমি অর্দ্ধঘণ্টা কাল এরূপ আনন্দ অনুভব করিয়া উঠিলে, অভাগিনী আমাকে সেরূপ ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সকরুণ কাতর-কণ্ঠে বলিল—"আমার একটি ভিক্ষা। তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ। তুমি যখন কলিকাতায় আইস, দয়া করিয়া আমাকে একবার দেখা দিয়া যাইও। আমি দুঃখিনী পাপিনী তোমাকে চিরদিন দেবতার মত পূজা করিব। তুমি কোন জন্মে আমার ভাই ছিলে।" সে কাঁদিতেছিল। আমিও উচ্ছ্বাসে কাঁদিলাম, এবং প্রতি-শ্রুত হইয়া চলিয়া আসিলাম। তাহার সহবাসিনীগণও সজল নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছিল। আমি যাইতে যাইতে অনন্ত নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া অনন্তরূপী ভগবানকে ভক্তিভরে ডাকিয়া বলিলাম—"দয়াময়! তুমিই এই অভাগিনীদের এ পাপ জীবন অপরিহার্য্য করিয়াছ। ইহাদের অন্য জীবনোপায় আর নাই, সমাজে ইহাদের স্থান নাই। অতএব তুমি ইহাদিগকে দয়া করিও। মানুষের মনে ইহাদের প্রতি ঘৃণার পরিবর্ত্তে দয়ার সঞ্চার করিও। হে পতিতপাবন! তুমি জন্মান্তরে এ পতিতাদের উদ্ধার করিও।" এ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি কলিকাতায় আসিলে প্রতিশ্রুতিমতে তাহাকে দেখিতে গিয়া-ছিলাম। শুনিলাম সে আর নাই। বুঝিলাম পতিতপাবন আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন, এ পতিতাকে উদ্ধার করিয়াছেন। হরি! হরি! মানুষ যখন এ হতভাগিনীদেরে ঘৃণা করে, একবারও কি মনে ভাবে না ইহাদের অবস্থায় পড়িয়া কয় জন পুণ্য পথে যাইতে পারিত? উচ্চ বংশে জন্মিয়া, ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে বিরাজিত থাকিয়া, এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও, কয় জন পুণ্য পথে যাইয়া থাকে? সমাজের পাপ পুণ্য ও প্রেমনীতি কি রহস্য পূর্ণ! স্মরণ হয় আমি ক্লিওপেট্রার মুখপত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"ঐ তৃণটি সমুদ্র-স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে পারিতেছে না

বলিয়া যদি পাপী না হয়, মানুষ অবস্থার খরস্রোতের প্রতিকূলে যাইতে না পারিলে পাপী হইবে কেন?" কই, এই দীর্ঘকাল পরেও ত তাহার কোন সদুত্তর পাইলাম না। তবে এতাদৃশ পাপীর একটি সান্ত্বনার কথা আছে—মানুষ কর্ম্ম দেখে, ভগবান অবস্থা দেখেন। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন——

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।"

গীতা।

সমুদ্রে ঝড়। (Cyclone)

"Mariners, all lost! To prayers, to prayers! all lost!"
Shakespeare.

বাড়ী চলিলাম। প্রাতে ষ্টিমার খুলিল। আকাশ পরিষ্কার। মধ্য-নিদাঘে যেমন পরিষ্কার থাকে তেমন পরিষ্কার। হৃদয়াকাশও তদ্রূপ। পিতার শোকানলে সন্তপ্ত, কিন্তু পরিষ্কার। ঘোর ঝটিকার পর যেমন আকাশ পরিষ্কার নীল শান্ত শোভাময় হয়, হৃদয়াকাশও বিপদ-ঝটিকার পর শান্ত শোভাময়। ঝুরু ঝুরু নবীন আশার দক্ষিণানিল বহিতেছে। অপরাহ্নে আকাশ কিঞ্চিৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। যত জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল, যত ভাগীরথী বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল, তত ঘন-ঘটা ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নাবিক সাহেবদের মুখ গম্ভীর হইতে লাগিল। শুনিলাম বায়ুমান যন্ত্রে "সাইক্লোন" বা ঘূর্ণ ঝটিকা দেখাইতেছে। ক্রমে অল্প অল্প ঝড় বহিতে লাগিল, ক্রমে সাহেবদিগের মুখ গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ও চিন্তাকুল দেখা যাইতে লাগিল। আমরা অপরাহ্ণ শেষে গঙ্গাসাগরে পড়িয়াছি। সিন্ধু নৃত্য করিতেছেন, জাহাজ-খানি তৃণের মত নাচিতেছে। আমাদের মাথা তুলিবার সাধ্য নাই। বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে। চারি দিকে সমুদ্র গর্জ্জন, ঝটিকার ঝঙ্কার, ও জাহাজে ঘোর উদ্গারণের ঘোরনাদ, ও হাহাকার। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে পবনদেব বলবৃদ্ধি করিয়া ঘোরতর 'সাইক্লোন' মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন প্রাকৃতিক মহা নাটকের কি এক ভীষণ অঙ্কই অভিনীত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডল, অর্ণবমণ্ডল, ও অর্ণবযান অস্ত্রভেদ্য অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ও অলক্ষ্য। তখন প্রকৃতিদেবী মহা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোর নৃত্য করিতেছেন ও অট্টট্ট হাসিতেছেন। জাহাজের দীপাবলী

প্রায় ভাঙ্গিয়া ও নিবিয়া গিয়াছে। দুই একটি আলোক যাহা আছে, তাহাতে অন্ধকারের গাঢ়ত্ব আরও বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। রহিয়া রহিয়া বিপুল বেগে ঝটিকা তরঙ্গের পর ঝটিকা তরঙ্গ পর্ব্বতবৎ সমুদ্র তরঙ্গ ঠেলিয়া লইয়া আসিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ক্ষুদ্র জাহাজে আঘাত করিতেছে। জাহাজ প্রত্যেক আঘাতে যেন চূর্ণ হইয়া পাতালে যাইতেছে। পর্ব্বতবৎ জলরাশি তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমাদের জিনিসপত্র ভাসিয়া যাইতেছে। যাত্রীরা জাহাজের দড়ী ও কাষ্ঠ ইত্যাদি প্রাণভয়ে অবলম্বন করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের মুখে আর শব্দ নাই। জাহাজে যে মানুষ আছে বোধ হইতেছে না, কেবল মধ্যে মধ্যে চট্টগ্রামের নির্ভীক খালাসিগণ উঠিয়া পড়িয়া ছুটাছুটি করিতেছে, এবং তাহাদের তীব্র বাঁশির শব্দ ও হাহাকার থাকিয়া থাকিয়া ঝটিকাপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিতেছে মাত্র। এরূপে ডুবিয়া ভাসিয়া দুঃখের দীর্ঘরাত্রি অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়া গেল। প্রভাতে দেখিলাম এঞ্জিন বন্ধ, জাহাজ চলিতেছে না। গঙ্গাসাগর গর্ভে লঙ্গরে ষ্টিমার একবার এ পাশ, একবার ও পাশ, উলট পালট খাইতেছে। একবার ডুবিতেছে, একবার ভাসিতেছে। মুহূর্ত্ত মাত্র মাথা তুলিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া পড়িয়া গেলাম। প্রাতেও ঝড় সমানভাবে বহিতেছে। মধ্যাহ্নে এত বৃদ্ধি হইল যে লঙ্গরের শৃঙ্খল ছিন্ন হইবার গতিক দেখিয়া, জাহাজ যেন ঝটিকাতে আরও মুক্তভাবে ভাসিতে পারে, সমুদায় শৃঙ্খল ছাড়িয়া দিয়া, স্বয়ং 'কমেণ্ডার' কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"We have done our best. To God we leave the rest." "আমাদের যাহা করিবার করিলাম। অবশিষ্ট ঈশ্বরের হস্তে।" আমি যেখানে ডেকে মৃতবৎ পড়িয়া আছি, এই আশঙ্কার বাক্য আমার কর্ণে মৃত্যুর কণ্ঠধ্বনি স্বরূপ প্রবেশ করিল। বুঝিলাম সকলই শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বড় বিলম্ব নাই।

দুই দিন এরূপে কাটিয়া গেল। এবার বলিয়া নহে, এ ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র জীবনে অনেকবার ধারণা হইয়াছে, আমার স্বর্গীয় পিতা আসিয়া আমাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। থিওসফিষ্টেরা বলেন আমাদের স্বর্গীয় আত্মীয়গণেরা সংসারের স্নেহসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন যাবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, এবং তাহার পরও, তাঁহাদের পুণ্য প্রকৃতি হইলে, আপনাদের স্নেহাস্পদগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন, এবং পুণ্যপথে প্রণোদিত করেন। আমিও তাহা বিশ্বাস করি। প্রেম আত্মার ধর্ম্ম, শরীরের নহে। আত্মার অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা প্রেম শ্রেষ্ঠ ও প্রবল, এবং কার্য্যকারী। অতএব শরীরের সঙ্গে তাহার শেষ হইবে কেন? যতদিন আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ না করেন, ততদিন ত পার্থিব প্রেমে আকৃষ্ট হইবারই কথা। পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলেও যাঁহারা পুণ্যবান তাঁহারা পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইয়োরোপ কি আমেরিকা হইতে পুণ্যবানেরা তাঁহাদের কার্য্যাবলী ও গ্রন্থাদির দ্বারা জড়সূত্রে আমাদের হৃদয়ের উপর কার্য্য করিতেছেন দেখিতেছি, তখন ঐ সকল পুণ্যলোক হইতে, শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভ করিয়া, আধ্যাত্মিক সূত্রে তাঁহারা আমাদের হৃদয় ও অদৃষ্টের উপর কার্য্য করিতে পারিবেন না কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—তাঁহারা করেন। আত্মায় আত্মায় এই প্রেম-সূত্র দৃঢ় রাখিবার জন্য আমাদের স্বর্গীয় পুণ্যবান আত্মীয়দিগকে সর্ব্বদা প্রেমও স্মরণ করা উচিত। অন্ততঃ বৎসরে যেন দুই একবারও তাহা করা হয়, এ জন্য শাস্ত্রকারেরা শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া যাইতেছি, এমন সময়ে অশ্বের পদস্খলিত হইয়া, কি রাস্তার অদৃশ্য গর্ত্তে পড়িয়া, অশ্ব অশ্বারোহী উভয়ই পড়িয়া গিয়াছি। একবার ঘোড়া অদম্য হইয়া এক উচ্চগিরি পার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্য দিয়া নক্ষত্র-বেগে উঠিয়া আমাকে পর্ব্বতের

সানুদেশে ফেলিয়া দিয়াছিল। পড়িবার সময়ে আমার মনে হইয়াছিল আমার সমস্ত অস্থি ও মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কিছুই আঘাত পাইলাম না। আমার তৎক্ষণাৎ মনে হইল যেন আমার পিতা আসিয়া আমাকে অঙ্কে লইয়াছিলেন। অথচ সে দিন কি তাহার বহুদিন পূর্ব্বেও আমি তাঁহাকে স্মরণ করি নাই। বিগত বিপদের সময়েও আমার পদে পদে এরূপ ধারণা হইয়াছিল, যেন প্রেমময় পিতা আসিয়া আমাকে করধৃত পুতুলের মত চালাইতেছেন। না হয় ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ক বালকের হৃদয়ে এতাদৃশ বিপদে এত সাহস, এত ভরসা, কোথা হইতে আসিবে, এবং সেই অকূল সাগরের এরূপ আশাতীত সুখ সৌভাগ্যপূর্ণ কূল সে কোথা হইতে পাইবে?

এবারও তাহা হইল। দুই দিন এরূপে কাটিয়া গেল। দুই দিন তুমুল ঘূর্ণ বাতাসে (Cyclone) জাহাজখানি তৃণবৎ ডুবিল ও ভাসিল। আমি 'ডেকে' পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবিলাম, ভাসিলাম। গঙ্গা-সাগরের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দুই দিন মৃতবৎ দেহের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আহার নাই, নিদ্রা নাই। একরূপ অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছি। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে ও কি ললিত ভৈরবকণ্ঠ কর্ণে প্রবেশ করিল? কণ্ঠ ইংরাজি ভাষায় ইংরেজের গভীর কণ্ঠে বলিতেছে—"তুমি কেন পড়িয়া আছ? উঠ!" আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম। আমারই মত একজন তরুণ বয়স্ক গৌরাঙ্গ যুবক। মূর্ত্তিখানি বড় ভদ্র, মুখখানি সুন্দর ও প্রীতিমাখা। দেখিয়া হৃদয়ে যেন হঠাৎ কি একটা আনন্দ সঞ্চার হইল। আমি একটুক ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"উঠিবার শক্তি থাকে ত উঠিব?" যুবা হাসিয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"আমার হাত ধরিয়া উঠ!" সে আমাকে টানিয়া তুলিয়া বসাইল। বলিল—"তোমার মুখখানি শুকাইয়া

গিয়াছে। তুমি যে আধমারা হইয়াছ। তুমি কিছু খাইয়াছ কি?" উত্তর—"দুই দিন মাথা তুলিতে পারি নাই, খাইব কেমন করিয়া? খাইবই বা কি? যাহা কিছু খাবার আনিয়াছিলাম তাহা বরুণদেব উদরস্থ করিয়াছেন।" সে বলিল—"Poor man! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। কিছু খাও, তাহা হইলে সুস্থ হইবে।" সে আমাকে ধরিয়া দাঁড় করাইল, এবং ভাইটির মত জড়াইয়া ধরিয়া,—আমার সেই লবণাক্ত কদর্য্য মূর্ত্তি এবং সিক্ত বাস!—তাহার কক্ষে লইয়া গেল, এবং জোর করিয়া তাহার দুগ্ধফেণনিভ শয্যার উপর বসাইয়া শুইতে বলিয়া চলিয়া গেল। তখন ঝড় অনেক থামিয়াছে। ডেকের উপর আর বড় জল উঠিতেছে না। কেবল চারিদিকে বিশাল লহরীমালা বিকট নৃত্য করিতেছে, এবং তরঙ্গাহত হইয়া অমল ধবল ফেণরাশির মধ্যে জাহাজখানিও নাচিতেছে। আমি শুইলাম না। সংর্ক হইয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম ক্ষুদ্র কক্ষটি কি সুন্দররূপ সজ্জিত হইয়াছে। তাহাতে মূল্যবান্ কিছুই নাই। তথাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলি স্থানে স্থানে কেমন সুচারুরূপে রাখা হইয়াছে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতায় এবং গৃহ-শয্যায় পাশ্চাত্য জাতীয়েরা মন্ত্রসিদ্ধ। এই দুই বিষয়ে আমরা তাহাদের কাছে বাস্তবিকই অসভ্য। আমার মতে আমাদের বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগকে এই দুইটি শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেকে বলেন তাহা অর্থ সাপেক্ষ। আমি তাহা মানি না। আমাদের অবস্থাপন্ন এক জন ইংরাজের আবাস স্থানটি দেখ, এবং আমাদের আবাস স্থান দেখ। দেখিবে স্বর্গ ও নরক। আমি এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে একজন ভৃত্যের হস্তে আহার্য্য সহ যুবকটি ফিরিয়া আসিলেন। আমি খাইতে আরম্ভ করিলাম। কার্য্যটা অবশ্য কলুটোলার হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত হইয়াছিল না, একে সমুদ্র-যাত্রা, তাহাতে আবার উদর-যজ্ঞ! যুবক পার্শ্বে

একটি বিচিত্র টুলে বসিয়া কত গল্পই করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আরও দুই চারিটি শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আসিয়া জুটিলেন। সকলে আমাকে বড় যত্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের অভ্যর্থনা—"জল খাওয়া।" ইহাদের অভ্যর্থনা বিশেষরূপ "জল পান।" অতএব তাঁহাদের কার্য্যটা অধিক ব্যাকরণসঙ্গত বলিতে হইবে। আমার পকেটে কিছু টাকা ছিল। আমি তাহার দ্বারা তাঁহাদের 'জলপানের' ব্যবস্থা করিলাম। সুগোল বোতলবিহারিণী উগ্রা জলদেবী আবির্ভূতা হইলেন। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে কক্ষটি দেখিতে দেখিতে আনন্দপূর্ণ হইল। কত গল্প, কত ঠাট্টা, কত হাসি! এমন সময়ে কক্ষের সম্মুখ দিয়া একটি শান্ত গম্ভীর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি মুহূর্ত্তেক আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ম্মচারীরা বলিল "কেপটেন।" কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে যেন একটা কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বালকটি কে?" কর্ম্মচারীরা সংক্ষেপে আমার বিপদাপন্ন অবস্থার কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিতেছেন, আর কাপ্তান আমাকে স্থির নেত্রে আপাদ মস্তক দর্শন করিতেছেন। কথা শুনিয়া বলিলেন—"তোমরা ইহাকে কিছু খাইতে দিয়াছ?" তাঁহারা দিয়াছেন বলিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন সুস্থ হইয়াছ?" আমি সেই কর্ম্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া বলিলাম—"ইনি একপ্রকার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমি এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি।" কাপ্তান বলিলেন—"তবে তুমি আমার সঙ্গে আইস।" আমি ভাবিলাম ব্যাপারখানি কি? সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আমাকে একেবারে 'কোয়াটার ডেকের' উপর লইয়া গেলেন। সেখানে প্রায় কেহ নাই। প্রথম শ্রেণীর 'কেবিন' যাত্রীরা প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী। দুই একজন একবার টলিতে টলিতে উপরে আসেন। মুখের ভঙ্গি বিকট। বিকট চীৎকার

করিয়া উদ্গীরণ করেন। আর অমনি সমুদ্রের ও ঝড়ের প্রতি নানারূপ সাধুসম্ভাষণ করিয়া নীচে চলিয়া যান। ইঁহাদের আহারেরও বিরাম নাই, উদ্গীরণেরও বিরাম নাই। কাপ্তান আমাকে রেল ধরিয়া দাঁড়াইতে, এবং খুব দূর সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে বলিলেন। কি দৃশ্য! তরঙ্গের পর তরঙ্গ,—উত্তাল, অনন্ত দীর্ঘায়ত, ফেণিল,—ছুটিয়া ছুটিয়া কি ভীষণ নৃত্য ও গর্জ্জন করিতেছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে আসিয়া অন্য প্রান্ত গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। আঘাতে ও প্রতিঘাতে, আকাশ পর্য্যন্ত যেন কম্পিত হইতেছে। তরঙ্গ-ভঙ্গের জল বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হইতেছে। সমুদ্রের বক্ষে যেন অনন্ত চঞ্চল পর্ব্বতরাশি নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কি সাধ্য স্থির হইয়া দাঁড়াইব। আমি বসিয়া পড়িলাম। সাহেব নীচে গিয়া এক গ্লাশ সরবত আনিলেন। বলিলেন—"খাও দেখি, তোমার আর গা বমি বমি করিবে না, মাথা ঘুরিবে না। আমি তোমাকে একটি (Sailor boy) করিব।" আমি খাইলাম। তিনি আমার কাছে বসিয়া আমার বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। আমি সংক্ষেপে কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস, পিতার মৃত্যুতে বিপদ, সেই বিপদ উদ্ধার, সকল কথা সংক্ষেপে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি একটি আশ্চর্য্য বালক!" তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়িনী ব্যবস্থার কৃপায় কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ জানি ও তাহাদের নাবিক যন্ত্রাদির ব্যাবহার বুঝি, দেখিয়া তিনি আরও বিস্মিত হইলেন। আমাকে বড়ই আদর করিতে লাগিলেন। তিলার্দ্ধ আমাকে ছাড়েন না। পূর্ব্বপরিচিত কর্ম্মচারীরা আড়চোকে চাহিয়া চলিয়া যান। আমার সঙ্গে একটি কথা কহিবারও ফাঁক পান না। কাপ্তান একখানি পাল গুটাইয়া আমার জন্য তাঁহার কেবিনের সম্মুখে ডেকের মঞ্চের উপর এক বিচিত্র শিবির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এত আহার যোগাইতে লাগিলেন যে

আমার খাইয়া শেষ করা অসাধ্য হইল। কখন বা আমাকে ডাকিয়া কোয়াটার ডেকে, কখন বা তাঁহার কেবিনে, কখন বা তিনি নিজে আমার শিবিরের সম্মুখে বসিয়া, গল্প করিতে লাগিলেন। এই আলাপে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, কিছুই বাদ যাইত না। সাহেব একটু খৃষ্টান। কর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে দাঁড়াইয়া আমাদের আলাপ শুনিত, এবং তাহাদের কাছে যে ছেলেটি এত হাসি তামাসা করিতেছিল সে গম্ভীরভাবে কাপ্তানের সঙ্গে এত উচ্চ বিষয়ে আলাপ করিতেছে শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইতেছিল। কাপ্তান অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমার শিবিরের দুয়ারে বসিয়া আমার সঙ্গে এরূপ গল্প করিয়া আমাকে নিদ্রা যাইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ফাঁক পাইয়া আমার প্রথম পরিচিত বন্ধুটি আসিলেন। তিনি যখন একটু ফাঁক পাইতেন তখনই আসিতেন। তাঁহার আলাপ, ব্যবহার, আকার ও চরিত্র অন্য কর্ম্মচারীগণ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি যেন তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ বংশজ ও শিক্ষিত। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি এ সকল বিষয় কোথায় শিখিলাম? রাত্রি বড় বেশী হইলে, আমার আর কিছু চাই কি না বিশেষরূপে তত্ত্ব লইয়া তিনিও চলিয়া গেলেন। আমি পরম সুখে নিদ্রা গেলাম। ঝড় তখনও আছে, তখনও জাহাজ টলিতেছে ও এক আধটুক জল উঠিতেছে; কিন্তু আমার মঞ্চ পর্য্যন্ত নহে।

রাত্রি প্রভাত হইল। ঝড় আরও কমিয়াছে। জাহাজ এখনও লঙ্গরে আছে। তখন আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়াতে দেখা গেল আমাদের ষ্টিমারের মত আরও অনেক ষ্টিমার গঙ্গাসাগরে লঙ্গরে নাচিতেছে। এই একখানি তরঙ্গশীর্ষে আমাদের মাথার উপর উঠিল, আবার মুহূর্ত্ত পরে তরঙ্গ সরিয়া গেলে একেবারে যেন পাতালে পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার আমরা তরঙ্গশীর্ষে তাহার মস্তকের উপর উঠিলাম। বেলা

৯টা পর্য্যন্ত এই অভিনয় হইল। তখন ঝড় প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। দুই একখানি জাহাজ ছাড়িল। আমি কাপ্তানকে বলিলাম—"আমাদের জাহাজ এখন ছাড় না কেন?" তিনি বলিলেন—"ঐ সকল জাহাজ তাঁহার কোম্পানির জাহাজ নহে। "করিঙ্গা, তাঁহাদের। কিছুক্ষণ পরে 'করিঙ্গা'ও ছাড়িল। তখন সাহেব বলিলেন—"তবে আমি না ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু 'করিঙ্গা' ভাল করে নাই। বায়ুযন্ত্রের ইঙ্গিত এখনও ভাল নহে! এখনও সম্মুখে 'সাইক্লোন' আছে।" তাঁহার কথা ঠিক হইল। আমাদের জাহাজ কিছুদূর মাত্র গিয়াছে। আমি 'কোয়াটার' ডেকে দাঁড়াইয়া। এমন সময়ে পরিচালকের উচ্চ স্থান হইতে কে গৌরাঙ্গের ঘর্ঘর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—"সাবধান! সাবধান!" কাপ্তান সে দিকে ছুটিলেন। একটি বিশাল পর্ব্বতাকার তরঙ্গ সম্মুখে আসিয়া জাহাজকে বজ্রাহত করিয়া আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমি একগাছি দড়ী ধরিয়াছিলাম। তথাপি তাহার উপর পড়িয়া মাথায় বিষম ব্যথা পাইলাম। জাহাজ জলাকীর্ণ। ডেক যাত্রীরা সমুদ্রে পড়িয়াছে মনে করিয়া ডেকে সাঁতার খেলিয়া বেড়াইতেছে। আমার প্রথম পরিচিত বন্ধুটি পেণ্ট্‌লুন জানু পর্য্যন্ত গুটাইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাকে টানিয়া তুলিয়া বলিলেন— "মজা দেখ!" কিন্তু পরের মজা কি দেখিব, আপনার মজা লইয়াই অস্থির। তরঙ্গের পর ঐরূপ তরঙ্গ আসিতেছে। প্রত্যেকটির আঘাতে আমার বোধ হইল যেন ষ্টিমারখানি চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তরঙ্গ থামিল; সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। ঝড় তিন দিন পরে আমাদের কাছে বিদায় হইয়া গেলেন। জল নামিয়া গেলে সন্তরণকারী যাত্রীগণ টিপ টিপ করিয়া ডেকে পড়িতে লাগিলেন। সাহেবটি হাসিয়া অস্থির। আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। একটি মুসলমান সদাগর আমাকে আসিয়া বলিল—"বাবু! আমি পঞ্চাশ

টাকার একখানি নোট রুমালে বাঁধিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। রুমাল শুদ্ধ ভাসিয়া গিয়াছে।" সাহেব মহা হাসিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম—"কি করিবে ভাই! প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও।" এমন সময়ে কাপ্তান আসিয়া বলিলেন—"কেমন আমি বলিয়াছিলাম না, 'করিঙ্গা' ভুল করিয়াছিল। যাহা হউক আমরা রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু 'করিঙ্গা' আমাদের অপেক্ষা ছোট জাহাজ। আমি তাহার চিহ্নও দেখিতেছি না। বোধ হয় 'সাইক্লোনে' পড়িয়া পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আমারাও কিঞ্চিৎ সরিয়া পড়িয়াছি।" বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'করিঙ্গা' এক প্রকার ভগ্ন (wreck) হইয়া গিয়াছিল।

এই দিন ও পরের দিন উপরোক্ত ভাবে সাহেবদের আদরে ও আলাপে আমার ক্ষুদ্র পাল-কুটীরে পরম সুখে কাটাইয়া তৃতীয় দিবস চট্টগ্রামে পঁহুছিলাম। পরম আত্মীয়ের মত সাহেবদের কাছে বিদায় লইলাম। যে আত্মীয়গণ আমাকে জাহাজ হইতে লইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে চট্টগ্রামে তারে ঝড়ের খবর আসিয়াছে। জাহাজের তিন দিন বিলম্ব দেখিয়া সকলেই তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দুঃখিনী মাতা তিন দিন যাবৎ নিরাহারে হাহাকার করিয়াছেন, এবং দিনের মধ্যে সহরে বারম্বার লোক পাঠাইয়াছেন। অদৃষ্টের বাতাস ফিরিয়াছে। যে সকল আত্মীয় ও বন্ধুগণ এ বিপদের সময়ে আমার খবরমাত্র লন নাই, আজ সকলে সশরীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য 'জেটিতে' উপস্থিত! হায় রে সংসার!

পিতৃ-শ্মশান।

"Deserted is my own good hall,
My hearth desolate;
Wild weeds are growing on the wall,
My dog howls at the gate."

দুই এক দিন সহরে রহিলাম। জগতের মানুষ মৌমাছিগুলাকে অন্ধকারে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু দুঃখের তামসী নিশি প্রভাত হইয়া, সৌভাগ্যের সূর্য্য উদিত হইলে, তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তোমার গুণের গুণ গুণ ধ্বনিতে তোমার কাণ ঝালা পালা করিয়া তুলিবে। ইহারা কৃপাপাত্র। ইহার অপেক্ষা কৃপাপাত্র যাহারা পরশ্রীকাতর,—পরের দুঃখ দেখিলে যাহারা সুখী হয়, পরের সুখ দেখিলে দুঃখী হয়। ইহারা পিতার দানশীলতায় ও দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে মর্ম্মাহত হইত। তাঁহার পুত্র পরিবারের দুর্গতিতে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের আনন্দ তাহারা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। লোকের দুঃখ দেখিয়া প্রকাশ্যে সুখ প্রকাশ করিলে বড় নীচতা প্রতিপন্ন হয়, তাই তাহারা একটুক দুঃখ প্রকাশ করিয়া অমনি আবার বলিত—"কিন্তু এরূপ না হইবে কেন? যেমন কর্ম্ম তেমন ফল। তিনি এত অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। কেবল দান, কেবল বাবুগিরি, কেবল বাহাদুরি। আর এখন পরিবারবর্গ অকূল সাগরে ভাসিতেছে। ভিটায় দুর্ব্বাটি পর্য্যন্ত নাই। আর অমুকে (সেই অমুকের মধ্যে বক্তা নিজেও এক জন)—দেখ দেখি অল্প অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কেমন সুন্দর সম্পত্তি করিয়াছে!" আজ ইহাদের দুঃখ দেখে কে? আমাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া যাইতে লাগিল। আমি অভিবাদন করিলেও একটা কষ্টের হাসি হাসিয়া, একটুক সদাচার দেখাইয়া বেগে চলিয়া

যাইতে লাগিল। ইহারা প্রায়ই আমার পিতার সেই নিন্দনীয় দান ও পরহিতৈষিতার দ্বারা উপকৃত ব্যক্তি, শত্রু নহে। পিতার শত্রু কেহই ছিল না। তিনি কখনও জ্ঞাতসারে কাহারও অনিষ্ট করিয়াছিলেন না। ইহারা নিজে তাঁহার হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিত। তবে এরূপ কৃপাপাত্রের সংখ্যা জগতে অল্প। ইহাই এক সান্ত্বনা। অধিকাংশ লোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু বিরাট বোমের শব্দের মত দেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সকলে বুঝিয়াছিল এই তাঁহার পরিবারবর্গের ভাগ্য শতধা বিদীর্ণ করিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাহারা স্বপ্নেও মনে করে নাই যে এ পরিবার আবার মাথা তুলিতে পারিবে। অতএব আজ আমি একটা উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত শুনিয়া তাহারা প্রথম বিস্মিত, পরে আনন্দিত হইল। আর যাঁহারা আমার পিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের শোকপূর্ণ আনন্দ অবর্ণনীয়, অপার্থিব। একটা দৃষ্টান্ত দিব।

৺গোলক পেস্‌কারকে পিতা আপনার পেস্‌কারি পদে নিয়োজিত করাইয়াছিলেন, এবং পরে তিনি চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে উকিল করিয়াছিলেন। গোলক পেস্‌কার পিতাকে আপনার পিতা, গুরু, ও দেবতার মত পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃতই পিতার পুত্র, শিষ্য, এবং চরিত্রের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ছিলেন। তাঁহার মত সরল অমায়িক, দয়াশীল, পরোপকারক, কোমলহৃদয় ব্যক্তি আমি পিতার পর আর দেখি নাই। লোকে তাঁহাকে মাটির মানুষ বলিত। এখানেই কেবল পিতা পুত্রে ও গুরু শিষ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল। পিতা তেজস্বী ও তীব্র অভিমানী। গোলক পেসকার প্রকৃতই মাটির মানুষ, অভিমান-হীন। তাহার একটি কারণও ছিল। তিনি কায়স্থ; উচ্চবংশীয়ও নহেন। তথাপি তাঁহাকে নমস্কার করিতে পিতা আমাকে বলিয়া

দিয়াছিলেন। আমি নিজেও তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতাম। পিতৃবন্ধুর মধ্যে এমন আর কাহাকেও করিতাম না। আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলে, তিনি একেবারে মাটিতে পড়িয়া আমার নমস্কার লইতেন। কত আশীর্ব্বাদ করিতেন, কত স্নেহের কথা বলিতেন। কায়স্থকে নমস্কার করিতেছি দেখিয়া পাছে লোকে কিছু মনে করে, তিনি অমনি বলিতেন—"বাবু! আমিও গোপী বাবুর পুত্র। আমি তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।" বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইত। পিতা উপস্থিত থাকিলে ছল ছল চক্ষুতে ঈষৎ হাসিতেন।

আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন পূজায়। বলিয়াছি তিনি পিতার শিষ্য। পিতার মত সমস্ত দিন রাত্রি প্রায় পূজায় কাটাইতেন। এই একই কারণে দুই জনের প্রথম শ্রেণীর ওকালতি ব্যবসা নষ্ট হইয়াছিল। উকিল মহাশয়দের ঈশ্বর রজত-মুদ্রা, পুষ্পচন্দন ধূর্ত্ততা ও মিথ্যা কথা, বলি মক্কেল। তাহা না হইলে ওকালতিতে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। তান্ত্রীকের পূজার স্থানে কেহ যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন। পরিধান পট্টবস্ত্র, গায়ে নামাবলী, কণ্ঠে প্রকোষ্ঠে বাহুতে রুদ্রাক্ষমালা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, হস্তে গোমুখী, জীবন্ত শিবমূর্ত্তি। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে স্ত্রীলোকের মত রোদন করিতে লাগিলেন। আমি প্রণত অবস্থায় থাকিতেই আমাকে সজোরে টানিয়া তাঁহার বুকে লইলেন। আমি সেই স্বর্গপ্রতিম বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার অশ্রুজলে আমার মস্তক ভিজিতে লাগিল। দুইজনে অনাথ পিতৃহীন শিশুর মত কাঁদিলাম। পিতৃবিয়োগের পর আমার এই প্রথম প্রাণ ভরিয়া রোদন। সেই রোদনে কি শোক, সেই শোকে কি স্বর্গ, সেই স্বর্গে কি শান্তি! তিনি একটি মাত্র কথা বলিলেন—"আজ তোমার

পিতা, আমার পিতা, কোথায়? আজ আমার গোপী বাবু কোথায়?" শোক কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিলেন—"তোমার পিতার অনন্ত অব্যর্থ পুণ্য। আমি জানিতাম তোমরা কখনও দুঃখ পাইবে না। আজ সেই পুণ্যফলের এই গৌরব কাহাকে দেখাইব? তিনি যে বড় সুখের সময়ে চলিয়া গিয়াছেন! তোমার এ গৌরব যদি একদিনের জন্যও দেখিয়া যাইতেন!" আবার দর দর বেগে তাঁহার অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি পুষ্পপাত্র হইতে একটি ফুল তুলিয়া লইয়া গলদশ্রুকণ্ঠে বলিলেন—"আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতেছি তিনি আমার গোপী বাবুর পুণ্যে তোমাকে দীর্ঘজীবী করিবেন। তুমি তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে।" ফুলটি আমার মাথায় দিলেন। আমার সর্ব্বশরীরে যেন কি অপূর্ব্ব পবিত্রতা সঞ্চারিত হইল। হায়! মা বঙ্গভূমি! এ সকল দেব-চরিত্র তোমার কোন্ পাপে তোমার বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল! তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, তাঁহার বাসাস্থ কাহারও চক্ষু শুষ্ক নাই। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পথ আসিল। সকলেরই মুখে এক কথা—"আজ আমাদের গোপী বাবু কোথায়?" পথ দিয়া চলিয়া যাইতেও অনেকে বলিতেছিল—"আজ আমাদের গোপী বাবু কোথায়?" কেহ কেহ বুকে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—"আজ আমাদের গোপী বাবু কোথায়?"

সহরে এক দিন মাত্র থাকিয়া বাড়ী গেলাম। অপরাহ্ন সময়ে বাড়ী পহুঁছিলাম। বাড়ী,—না মহাশ্মশান? নৌকায় উঠিয়া অবধি আমার হৃদয়ে মেঘ সঞ্চার হইয়া কাল বৈশাখীর মত ক্রমে ঘনীভূত হইতেছিল। দূর হইতে বাড়ীর শ্রীহীন ভাব দেখিয়া ঝড়বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল। বাড়ীতে যেন জন মানব কেহই নাই। কোনও ঘর ভিত্তি-মধ্যেই হেলিয়াছে, কোনওখান বা পড়িয়া গিয়াছে। বাড়িখানি যেন

নীরবে দীনহীনভাবে রোদন করিতেছে। কি এক মর্ম্মস্পর্শী নিরাশ্রয়তা প্রকাশ করিতেছে, বাড়ীর পশ্চাতের খালে নৌকা লাগিয়াছে। নৌকায় বুক রাখিয়া বড় কাঁদিলাম। এরূপে হৃদয়ের কাল বৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, বুক পাথরের ধৈর্য্যে চাপা দিয়া, সেই শ্মশানে প্রবেশ করিলাম। শ্মশানে ভস্মমাত্র থাকে, এরূপ জীবন্ত ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি থাকে না। নৌকা হইতে উঠিলেই ছোট ভাই ও ভগ্নীরা আসিয়া, চারিদিকে ঘেরিয়া, কেহ বা কোলে উঠিয়া, অমনি তাহাদের সেই সরল আধ আধ ভাষায় পিতার মৃত্যু-দৃশ্য চিত্র করিতে লাগিল। আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু পাথরে চাপা। আর দু চার পা অগ্রসর হইলে বিবাহযোগ্যা ভগিনী তারা আসিয়া পাগলিনীর মত গলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। এ সময় রোদন অমঙ্গল বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া, নীরবে রোরুদ্যমানা পিতৃব্য-পত্নী,—আমি তাঁহাকে 'যাদু' বলি,—তাহাকে সরাইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কে? আমার অভাগিনী মাতা। এই আট নয় মাসে তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দরী দেবী মূর্ত্তিতে এরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে, আমি পুত্রের সাধ্য নাই যে তাঁহাকে চিনিব। কে বলে ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে। পুণ্যভূমি ভারতভূমি হইতে তাহা কে উঠাইতে পারে? হিন্দুস্থানে সতীস্থান। সতীদাহ যে দিন উঠিয়া যাইবে সে দিন হিন্দুস্থান আর হিন্দুস্থান থাকিবে না। আমি মাতাকে দেখিয়াই বুঝিলাম মাতাও পিতৃ-শ্মশানে ভস্মীভূতা হইয়াছেন। আমি হতভাগ্য পুত্রের মুখ দেখিবার জন্যই যেন মাতার কেবল ছায়াটা মাত্র আছে। পিতাকে ত হারাইয়াছি; বুঝিলাম,—দেখিয়াই বুঝিলাম,—মাতার এ ছায়াও আর অধিক দিন এ শ্মশানে বিরাজ করিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ছায়া ছয় মাসের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। সকলেই নীরবে, কি গলা ছাড়িয়া, কাঁদিতেছিল।

কাঁদিতেছিলেন না কেবল—মাতা। সকলেই শোকের, কি সান্ত্বনার, কথা কহিতেছিল। কথা কহিতেছিলেন না কেবল—মাতা। তাঁহার চক্ষু কোঠরস্থ, নিস্তেজ, শুষ্ক। তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ নীরব। তাঁহার হৃদয়ে যে শোক, সে শোকের আজ যে পূর্ণাবস্থা। তাহার অশ্রু নাই, উচ্ছ্বাস নাই, ভাষা নাই। নদীতে যতক্ষণ জোয়ার অপূর্ণ থাকে ততক্ষণ তাহার স্রোত থাকে, স্রোতে বেগ থাকে, কল্লোল থাকে। জোয়ার পূর্ণ হইলে তাহার কিছুই থাকে না। নদী তখন স্থির, ধীর, গভীর। মাতার শোক স্রোতস্বতীর অবস্থাও আজ সেইরূপ। মাতার চরণাম্বুজে প্রণত হইয়া অশ্রুজলে চরণ সিক্ত করিলে, মাতা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, মাথায় আশীর্ব্বাদ দিয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, বুকে লইয়া কেবল একটি কথা ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আজ তিনি কোথায় ?" আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম! এবার মাতাও কাঁদিলেন। 'যাদু' তাঁহাকে অমঙ্গল করিতেছেন বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া আমাকে সরাইয়া লইলেন। সকলে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া কাঁদিলাম। দেখিতে দেখিতে পিতৃব্যগণ, পিতৃব্য পত্নীগণ, পুরোহিতগণ ও প্রজাগণ আসিতে লাগিল। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সকলে আমাকে ও মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এরূপে এ শ্মশানে আমার দিন কাটিতে লাগিল। অপরাহ্নে পিতৃদেবের নদীতীরস্থ শশ্মানে গিয়া বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতাম, প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় খুলিয়া, কাঁদিতাম। তাহাতে মনে বড় শান্তি পাইতাম। সেখানে বসিয়া ভাবিতাম—

"তরল না হতো যদি নয়নের নীর,
ছুঁইত আকাশ তব সমাধি মন্দির।"

পিতৃহীন যুবক।

বলিয়াছি পিতা এক পাপিষ্ঠের নিকট কিছু টাকা ঋণ করেন। সুদে আসলে তাহার দ্বিগুণ, কি ত্রিগুণ, উশুল করিয়া বাকী টাকার জন্য সে

পিতার চিতানল না নিবিতেই আমার সমস্ত সম্পত্তি, ভদ্রাসন বাটীসহ, সামান্য মূল্যে বিক্রয় করায়। মূল্য কম হইবার কারণ—পিতার জমীদারির অংশ সেই ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ পিতৃব্যদের কাছে বন্ধক ছিল। অন্য এক পিতৃব্য সেই বন্ধকসহ সম্যক সম্পত্তি ক্রয় করেন। মাতার নিজের ও তাঁহার পুত্রবধূর অলঙ্কারাদি পিতৃব্যগণ বন্ধক লইয়া সে মূল্যের এক অংশে দিয়াছিলেন। এখন পিতৃব্যগণ মাতাকে বুঝাইলেন এমন অমূল্য সম্পত্তি ভূভারতে মিলিবে না; অতএব ভগ্নীর বিবাহের জন্য আমি যে দুই শত টাকা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা উক্ত পিতৃব্যদের দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একটা বায়নানামা করা উচিত। আমি দেখিলাম বায়নার মেয়াদ ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা দিয়া এ সম্পত্তি উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব অলঙ্কারগুলির মত এই দুই শত টাকাও এ কৌশলে হারাইব। কিন্তু সরলা মাতাকে সে কৌশল বুঝান অসাধ্য। আমি বুঝিলাম এই দুই শত টাকা দিয়া বায়নানামা না করিলে মাতা বাঁচিবেন না। এক দিকে দুই শত টাকা, অন্য দিকে মাতা। কাযেই আমি বায়নানামা করিলাম। ইহজীবনের মত মাতার হৃদয়ে যেন একটুক শান্তি, মুখে একটুক আশার হাসি দেখিলাম। তাহার প্রতিযোগিতা কোনও অর্থে করিতে পারে না। আমিও সেই শান্তি, মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার মত মাতার সেই হাসি, দেখিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হৃদয়ে কলিকাতায় ফিরিলাম। আর আমার মাতাকে, আমার সেই সরলা স্নেহময়ী মাতাকে, দেখিলাম না। আর কি দেখিব না? দেখিব, পিতা মাতা উভয়কে দেখিব। সেই এক আশায় ভর করিয়াই ত এই জীবনপথ বাহিয়া চলিয়াছি। মিলন নিকট।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।